কালের সাক্ষী

ঢাকা

ড. এ এইচ দানী
প্রফেসর এমিরিটাস

আবু জাফর অনূদিত

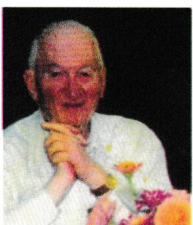

লেখক পরিচিতি

ড. আহমদ হাসান দানী, প্রফেসর এমিরিটাস। উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও গবেষক। জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন, পাকিস্তানে। ১৯৯৭ সাল থেকে তিনি কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটির (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান) তক্ষশিলা (Taxila) ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান সিভিলাইজেশনস-এর অনারারি ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ড. দানী ১৯৫০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ওই একই সময়কালে তিনি ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সালে তিনি পাকিস্তান সরকারের তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইনচার্জ ছিলেন। এর আগে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি ভারত ও পাকিস্তান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর, ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও সোস্যাল সাইন্সেস ফ্যাকাল্টির ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালেই তিনি কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটির (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান) প্রফেসর এমিরিটাস নিযুক্ত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় ড. দানী ১৯৫২ সালে 'ঢাকা ঃ এ রেকর্ড অব চেঞ্জিং ফরচুনস' নামে ইংরেজিতে একখানি গ্রন্থ লেখেন এবং ১৯৫৬ সালে তা প্রকাশিত হয়। তাঁর লিখিত 'বিবলিওগ্রাফি অব দি মুসলিম ইনসক্রিপশনস অব বেঙ্গল', 'মুসলিম আর্কিটেকচার অব বেঙ্গল' সুধীমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। এছাড়া ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সভ্যতা বিষয়ক তাঁর একাধিক মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থ রয়েছে।

ড. দানী তাঁর গবেষণামূলক কাজের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (ভারত) থেকে তিনি গোল্ড মেডেল, পাকিস্তান সরকার থেকে সিতারা-ই ইমতিয়াজ, ইজাজ-এ কামাল ও হিলাল-ই ইমতিয়াজ খেতাব, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ থেকে গোল্ড মেডেল, ফরাসী সরকার থেকে Palmes Academiques, ইটালী সরকার থেকে Knight Commander, জার্মান সরকার থেকে Order of the Merit, ইউনেস্কো থেকে Aristotle Silver Medal লাভ করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, জার্মান আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, করাচির ওয়েস্টার্ন ও সেন্ট্রাল এশিয়া, রোমের ISMEO ও লন্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি ফেলো। এছাড়া তিনি লন্ডন ইউনিভার্সিটির স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ রিসার্চ ফেলো, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ক্যানবেরা) এশিয়ান ফেলো, ইউনিভার্সিটি অব পেনসেলভানিয়ার (ফিলাডেলফিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ভিজিটিং স্কলার ও উইসকনসিন ইউনিভার্সিটিতে (মেডিসন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অনুবাদক পরিচিতি

আবু জাফর (জন্ম ১৯৪৮ যশোর)। যশোর এম এম কলেজ থেকে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি ১৯৭০ সালে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। তাঁর রচিত মওলানা আকরম খাঁ - এ ভারসেটাইল জিনিয়াস, মুসলিম ফেস্টিভ্যালস ইন বাংলাদেশ, রসূল মুহাম্মদ (স), মোগল যুগের বিচার এবং অনূদিত গ্রন্থ মহানবীর শাশ্বত পয়গাম, বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স), মহানবীর জীবন আলো, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, নাহজুল বালাগা, বীর ও বীরবন্দনা, ট্রেন টু পাকিস্তান, বাঙলা ভাগ হ'ল পাঠকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত।

কালের সাক্ষী
ঢাকা

ড. আহমদ হাসান দানী
প্রফেসর এমিরিটাস

অনুবাদ
আবু জাফর

খোশরোজ কিতাব মহল
১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন ঃ ৭১১৭০৮৪, ৭১১৭৭১০

কালের সাক্ষী ঃ ঢাকা

মূল ঃ ড. আহমদ হাসান দানী

অনুবাদক ঃ আবু জাফর

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশক
মহীউদ্দীন আহমদ
খোশরোজ কিতাব মহল
১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

কপিরাইট ঃ অনুবাদক

মূল্য ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা

সংশোধনী ঃ খন্দকার মোশতাক ও আলমগীর কবির

প্রচ্ছদ ঃ আসাদুল্যাহ মিলটন

কম্পোজ ঃ নাজমা আহমেদ

ISBN 984 - 438 - 019 - 7

মুদ্রণ ঃ পেপার প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা - ১১০০

উৎসর্গ

আদরের নাতনী
আর্শিয়া শামায়লাকে

— আবু জাফর

ভূমিকা

বাংলা সংস্করণ

আমার লেখা 'ঢাকা' গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার উদ্যোগে আমি খুশী হয়েছে। গ্রন্থখানি অনেক পূর্বে লেখা হয় যখন ঢাকা ছিল একটা প্রাদেশিক রাজধানী। কিন্তু বর্তমানে এ শহরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং ঢাকা হয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী। নতুন এই রাজধানী শহরের ওপর একটা নতুন বই লেখার এখনই উপযুক্ত সময়। এতে শহরের লোকেরাই শুধু এ শহরকে জানার সুযোগ পাবে না, যারা বাইরে থেকে এ শহরে আসবেন তাঁরাও এ শহরকে জানার সুযোগ পাবেন।

মোগল যুগে বিশেষ করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ঢাকা হয় একটি প্রদেশের রাজধানী, এখন তা একটা স্বাধীন দেশের রাজধানী। আমি আশা করি, এ শহর আরো উন্নত হবে এবং নতুন এই শহরকে দেখার জন্য সারা বিশ্বের লোক আকর্ষিত হবে, তাঁরা ঢাকার গুরুত্ব অনুধাবন করবেন। আমি আরও আশা করি যে, উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে ঢাকা শহরকে আকর্ষণীয় হিসেবে গড়ে তুলতে শহরের লোকজনই অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

ঢাকায় পুনরায় সফর করার ইচ্ছা আমার আছে। এ শহরের গৌরব তুলে ধরার ক্ষেত্রে সামান্য হলেও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। ঢাকার জনগণকে আমি অভিনন্দন জানাই এ শহরের ঐতিহাসিক গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য – ঐতিহাসিক এ গৌরব তাদেরই।

ড. এ এইচ দানী
প্রফেসর এমিরিটাস

দানী হাউজ
ইসলামাবাদ, পাকিস্তান
৫ নভেম্বর, ২০০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

ইংরেজী সংস্করণ

আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে ঢাকার ওপর একটি গ্রন্থ লিখতে বলেন। উদ্দেশ্য, ওই গ্রন্থ থেকে ঢাকা শহরের ইতিহাস ও অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং বিদেশ থেকে যাঁরা প্রতিদিন ঢাকা শহরে আসছেন তাঁদের জন্য গাইড-বুক হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া। বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় ঢাকার ওপর বেশ কিছু বই আছে। তদুপরি এস এম তাইফুরের 'গ্লিম্পসেস অব ওল্ড ঢাকা' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর এ কাজে আমি কিছুটা ইতস্তত করি। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ঢাকায় তৃতীয় 'পাকিস্তান ইতিহাস সম্মেলন' অনুষ্ঠানের আগে ডেলিগেটদের কাছে ঢাকার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ছোট আকারে একটা বই তুলে দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান ড. এ হালিম আমাকে ওই বিষয়ে লেখার অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধে আমি সম্মত হই এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দেই লেখার কাজ শেষ করি। কিন্তু নানা কারণে তা ছাপার জন্য প্রেসে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় আবার 'পাকিস্তান হিস্ট্রি কনফারেন্স' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সুযোগে আমি পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের ব্যবস্থা করি। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে লেখা পাণ্ডুলিপির বিশেষ কোনো পরিবর্তন করা হয়নি – শহরের বিশেষ কয়েকটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ অবশ্য সংযুক্ত করা হয়।

এ বিষয়ে আমার লেখার দৃষ্টিকোণ ছিল একজন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদের দৃষ্টিভঙ্গী। রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনার প্রয়াস থেকে আমি যতদূর সম্ভব বিরত থেকেছি ; কারণ এ বিষয়ে স্যার যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' (খণ্ড-২) গ্রন্থে তা লিখিত হয়েছে। আমার বিষয় সীমাবদ্ধ রাখি ঢাকা শহরের ভাগ্য পরিবর্তনের ঘটনার বিবরণের মধ্যে এবং এজন্য আমি এ শহরের সাথে সব সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা করি। সাম্প্রতিককালের বিবরণ আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করি। প্রাচীন লেখকদের লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে কাহিনীর বর্ণনা করার ফলে উদ্ধৃতির সংখ্যা বেশি হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভগুলোর বর্ণনা আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এসব প্রাথমিক বর্ণনার বেশ কয়েকটি অংশ আমি আমার শিক্ষক স্যার আর. ই. এম হুইলার (Sir R. E. M Wheeler)-কে দেই ; তিনি এসব তথ্য তাঁর Five Thousand Years of Pakistan গ্রন্থে ব্যবহার করেন। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে আমি ঢাকার ঐতিহাসিক বিল্ডিংগুলোর ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা ও অধ্যায়ন করি; সব নতুন তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ঢাকায় আমি একজন আগন্তুক। ঢাকার সবকিছু আমাকে জানতে হয়েছে বই পড়ে অথবা বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ; তাঁরা আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন কোনো রকম বিরক্তি প্রকাশ না করেই। তাঁদের সবার কাছে আমি ঋণী। বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ জানাই এস এম তাইফুরকে, তাঁর কাছ থেকে আমি ঢাকা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। তাঁর নামেই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করার সুযোগ আমি গ্রহণ করলাম ; নিঃসন্দেহে ঢাকার প্রাচীন নিদর্শনাদি সম্পর্কে জীবিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জে এস টার্নার পুরো পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখেন, আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই – আমাকে সহযোগিতা করার ও উৎসাহ দেয়ার জন্য। আমি ড. এ হালিম ও ইতিহাস বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে আমি সওগাত প্রেসের এম নাসিরুদ্দীনকে ধন্যবাদ জানাই – এ গ্রন্থখানি মুদ্রণে তিনি বিশেষ যত্ন নেন।

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এ গ্রন্থে কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেছে, এজন্য আমি পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। গ্রন্থখানি মূলত সাধারণ পাঠকদের জন্য রচিত, এ কারণে বৈশিষ্ট্যসূচক কোনো চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি।

'বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট' – এ প্রকাশিত ড. এন. কে ভট্টাশালীর প্রবন্ধ থেকে এক নম্বর মানচিত্রটি নেয়া হয়েছে ; এস সি হিল-এর (S. C. Hill) 'থ্রি ফ্রেন্সমেন ইন বেঙ্গল' থেকে নেওয়া হয়েছে দু' নম্বর মানচিত্রটি। তিন নম্বর মানচিত্রটি হলো, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ঢাকার রাস্তার – এটা তৈরি করে সার্ভে অব পাকিস্তান। এ গ্রন্থে ওইসব মানচিত্র প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি তাঁদের সবার কাছে ঋণী। পুরনো যেসব ছবি এ গ্রন্থে ছাপা হয়েছে তা চার্লস ডি'ওলি-র 'এ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা' গ্রন্থের নকশা থেকে নেয়া ; অন্যসব ছবির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

আহমদ হাসান দানী

ঢাকা মিউজিয়াম
রমনা, ঢাকা
১৮ অক্টোবর, ১৯৫৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের ভূমিকা

উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও পাকিস্তানের কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর ড. আহমদ হাসান দানী ১৯৫৬ সালে 'ঢাকা : এ রেকর্ড অব চেঞ্জিং ফরচুনস' শিরোনামে ইংরেজি ভাষায় একখানি গ্রন্থ লেখেন। ড. দানী ১৯৫০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা এবং একই সাথে ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ওই গ্রন্থখানি একটি মূল্যবান দলিল।

ড. দানীর গ্রন্থখানি ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল। ২০০০ সালের শেষ দিকে বিশেষ এক প্রয়োজনে গ্রন্থখানির প্রয়োজন দেখা দেয়। নতুন করে গ্রন্থখানি পড়ে মনে হয়, বাংলা ভাষায় বইখানির অনুবাদ হওয়া দরকার। বইখানির ইংরেজি সংস্করণ এখন দুষ্প্রাপ্য – নতুন করে ওই গ্রন্থখানি কেউ প্রকাশ করবেন কিনা জানা নেই। এমনই এক সময়ে দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র রিপোর্টার ও বিশিষ্ট কলাম লেখক জনাব আমীর খসরুর সাথে ওই গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। জনাব খসরু আমার আগ্রহের কথা শুনে খুবই উৎসাহিত হন এবং বলেন যে, সম্প্রতি ইসলামাবাদে (পাকিস্তান) এক অনুষ্ঠানে তাঁর সাথে ড. দানীর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি ওই গ্রন্থখানি বাংলায় অনুবাদ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। জনাব খসরু আমাকে জানান যে, তাঁর পক্ষে ওই কাজ সম্পাদন করা আপাততঃ সম্ভব হচ্ছে না, কবে নাগাদ তিনি ওই কাজ করতে পারবেন তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। তিনি আমাকে ওই অনুবাদের কাজটি সম্পাদনের অনুরোধ করেন এবং ড. দানীর কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার জন্য পত্র লিখতে বলেন। জনাব খসরুর পরামর্শ অনুযায়ী আমি ড. দানীকে একটা পত্র লিখি – ওই পত্রে আমি বইখানির অনুবাদের বিষয়ে জনাব খসরুর সাথে তাঁর আলোচনার বিষয়টি উল্লেখ করি। ড. দানী অনতিবিলম্বে আমার পত্রের জবাব দেন এবং তাঁর বইখানি বাংলায় অনুবাদ করার জন্য আমাকে অনুমতি দেন। পরে তিনি তাঁর গ্রন্থের বাংলা সংস্করণের জন্য একটা ভূমিকাও লিখে দেন।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ওপর লিখিত গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ করতে পেরে আমি খুশি হয়েছি। গ্রন্থখানি অনেকের জানার আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। মূলগ্রন্থে প্রাচীন কীর্তির যেসব ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তা পরিস্ফুটনের জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই তথ্য অধিদফতরের চিফ ফটোগ্রাফার জনাব এ কে এম ইকবাল চৌধুরী ও ফটোগ্রাফার মোঃ ইসমাইলকে। ইংরেজিতে গ্রন্থখানির নাম 'ঢাকা এ রেকর্ড অব চেঞ্জিং ফরচুনস', বাংলায় নামকরণ করা হল 'কালের সাক্ষী : ঢাকা' বন্ধুবর জনাব বদিউদ্দিন নাজির-এর প্রস্তাব অনুযায়ী। 'মাসিক এশিয়া ডাইজেস্ট' পত্রিকায় গ্রন্থখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য পত্রিকার সম্পাদক জনাব বেলায়েত হোসেন উদ্যোগ নেন। উভয়ের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আবু জাফর

২ এইচ ইস্টার্ন হাউজিং এপার্টমেন্ট
৩৭ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা।
তারিখ ১০ জুলাই, ২০০৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

অধ্যায়-এক

ঢাকার ভৌগোলিক বিবরণ, ঢাকার অবস্থান, ঢাকার সীমানা, অভ্যন্তরীণ নৌপথ, বুড়িগঙ্গা, প্রধান প্রধান বাজার, ঢাকার জনসংখ্যা। ১-৬

অধ্যায়-দুই

ক. ঢাকার ইতিহাস, ঢাকা নামের উৎপত্তি। ৮-১০

খ. মোগল-পূর্ব ইতিহাস, মুসলিম-পূর্ব যুগ, বাংলায় সুলতানদের অধীন ঢাকা, বিনত বিবি মসজিদের খোদাই পাথর, নসওয়াল্লা গলি মসজিদের খোদাই পাথর, বেঙ্গলা শহর, বিভিন্ন পুস্তকে ঢাকা নামের উল্লেখ, পুরনো ঢাকার অবস্থান। ১১-১৫

গ. ঢাকা মোগলদের প্রাদেশিক রাজধানী, ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের যৌক্তিকতা, রাজধানী স্থাপনের তারিখ, রাজধানীর স্থিতিকাল, প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ঢাকা, সামাজিক পরিবর্তন, শহরের বিস্তৃতি, শহরের প্রতিরক্ষা, ঢাকায় দুর্গ নির্মাণ, ঢাকায় শাহজাহান, তৎকালীন ঢাকার বিস্তৃতি, ঢাকায় ইরানী দূতাবাস, ইসলাম খানের জাঁকজমক, মীর্জা নাথনের উৎসব অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক অবস্থা, ঢাকায় প্রথম খ্রিস্টান মিশন, ঢাকায় একটি মগ আক্রমণের বিবরণ, শাহ সুজার শাসনামলে ঢাকা, মানরিক-এর বিবরণ অনুযায়ী ঢাকা শহরের বিস্তৃতি, মানরিকের বর্ণনায় বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি, শহরে খ্রিস্টধর্মের অবস্থা, বিদেশী বাণিজ্য, ঢাকা সম্পর্কে মানুকির বিবরণ, ঢাকা সম্পর্কে টেভারনিয়ারের বিবরণ, টমাস বাউরের বিবরণ, ঢাকায় পর্তুগীজদের আগমন, ওলন্দাজদের ঢাকায় আগমন, ঢাকায় ফরাসিদের আগমন, ঢাকায় আর্মেনীয়দের আগমন, ঢাকায় গ্রিকদের আগমন, ঢাকায় ইংরেজদের আগমন, ঢাকায় কাপড় সংগ্রহ, শায়েস্তা খানের দ্বিতীয় মেয়াদের কার্যকাল, শায়েস্তা খানের উত্তরাধিকারীগণ, ঢাকায় নিজামতের শেষ অধ্যায়।

ঘ. নায়েব নাজিমদের অধীনে ঢাকা, ঢাকার মর্যাদার নিম্নতম অবস্থা, কর্মকর্তাদের মধ্যে অবাধে ঘুষ আদান-প্রদান, ঢাকায় পণ্যসামগ্রীর প্রচলিত মূল্য, মারাঠা আক্রমণের প্রভাব, মুসলমানদের হাত থেকে ব্রিটিশদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, ঢাকা সম্পর্কে রেনেলের বিবরণ। ১৬-৩৮

ঙ. ব্রিটিশদের অধীনে ঢাকা, জেসারত খানকে পুনরায় নায়েব নাজিম নিয়োগ, নায়েব নাজিমের নতুন বাসভবন, পরিবর্তনের সময় বিশৃঙ্খলা, ঢাকায় নতুন পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা, ঢাকায় ব্যাপ্টিস্ট মিশন, ঢাকা সম্পর্কে বিশপ হেবারের বিবরণ, মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে বিশপ হেবারের বর্ণনা, নায়েব নাজিম নবাব শামস-উদ-দৌলা, হেবারের বর্ণনায় নিমতলী কুঠি, ঢাকা সম্পর্কে টেলরের বিবরণ, তৎকালীন ঢাকার জনসংখ্যা, ধর্মীয় রীতি ও অনুষ্ঠান, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ব্রাহ্মণদের অবস্থা, মহিলাদের অবস্থা, মহিলা ও পুরুষদের পোশাক, ১৮৫৭ খিস্টাব্দের বিদ্রোহ, শহরের উন্নয়ন, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি, ঢাকার বর্তমান নবাবের পরিবার, শহরে শিক্ষার উন্নয়ন, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, শহরের বিস্তৃতি। ৪৪-৬০

চ. ঢাকা : পূর্ববাংলা ও আসামের রাজধানী, বাংলা ভাগের প্রেক্ষাপট, বাংলা ভাগের রাজনৈতিক ফলাফল, ঢাকা নতুন রাজধানী, বাংলা ভাগ রদ। ৬০-৬৪

ছ. ঢাকা ব্রিটিশদের অধীন বাংলা ভাগ রদের বিকল্প ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ, ঢাকায় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল, শহরের বিস্তৃতি। ৬৫-৬৮

জ. আধুনিক ঢাকা, পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপট, ঢাকা পুনরায় রাজধানী, শহরে সূচিত পরিবর্তন, ঢাকার বিস্তৃতি, নতুন প্রত্যাশা। ৬৯-৭৬

অধ্যায়-তিন

ঢাকার স্মৃতিস্তম্ভ, ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ, তারিখ ও নমুনা, স্থাপত্য শিল্পের স্টাইল, ৭৭-৮১

ক. বাঙলো টাইপ স্থতিস্তম্ভ, চুড়িহাট্টা মসজিদ, নবরায় লেনের (ইসলামপুর) মসজিদ, শাহ মোহাম্মদ জামালের সমাধি, আগামসিহ লেনের মসজিদ, হজরত চিশতী বেহেশতির সমাধি, আরমানিটোলার মসজিদ। ৮২-৮৪

খ. লালবাগ স্টাইলের স্মৃতিস্তম্ভ, আওরঙ্গবাদ দুর্গ, ট্যাঙ্ক ও অডিয়েন্স হল, লালবাগ মসজিদ, বিবি পরীর সমাধি, ফররুখ সিয়রের মসজিদ, খান মোহাম্মদ মির্ধার মসজিদ। ৮৪-৮৯

গ. চকে নির্মিত ও সমজাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ, চক মসজিদ, করতলব খানের মসজিদ, হোসাইনী দালান, বড় কাটরা, ছোট কাটরা, বিবি চম্পার সমাধি, নবাব শায়েস্তা খানের মসজিদ, আমীর উদ্দিনের সমাধি ও মসজিদ, ইসলাম খানের মসজিদ। ৯০-৯৮

ঘ. পুরনো শহরের স্মৃতিস্তম্ভ, বিনত বিবির মসজিদ, নারিন্দা ব্রিজ, হায়াত ব্যাপারীর মসজিদ, গোলাম মোহাম্মদের তোরণ, বিবি মেহারের মসজিদ, গুরু তেগ বাহাদুরের সঙ্গত, সিঙ্গটোলায় সিতারা বেগমের মসজিদ, লক্ষ্মীবাজারে রাজা বাবুর গৃহ ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, জয়কালী মন্দির, পাগলা পুল। ৯৮-১০৩

ঙ. রমনা ধারার বৈশিষ্ট্যের স্মৃতিস্তম্ভ, হাজী খাজা শাহবাজের সমাধি ও মসজিদ, মূসা খানের মসজিদ, রমনা কালী বাড়ি, সুজাতপুরের শিখ মন্দির, ঢাকেশ্বরী মন্দির। ১০৪-১০৯

চ. সাতমসজিদ যাওয়ার পথে, বাঙালি কুঁড়েঘর ধরনের নির্মাণ কাঠামো, প্রধান ঈদগাহ, শিখের মন্দির ও গুরু নানকের কূপ, দারা বেগমের সমাধি, কাটাজুর-এ আলাকুরীর মসজিদ, সাতগম্বুজ মসজিদ। ১১০-১১৪

ছ. তেজগাঁও যাওয়ার পথে, খাজা আম্বরের ব্রিজ, খাজা আম্বরের মসজিদ, তেজগাঁও গীর্জা, টঙ্গী ব্রিজ। ১১৫-১১৭

জ. আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বিল্ডিং, ঢাকা মিউজিয়াম, বলধা মিউজিয়াম ও উদ্যান, আহসান মনজিল, নর্থব্রুক হল, কার্জন হল, হাইকোর্ট বিল্ডিং, ফজলুল হক মুসলিম হল, ঢাকা হল, ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ঢাকায় ব্যাপ্টিস্ট মিশন, আর্মেনিয়ান চার্চ, এ্যাংগলিক্যান চার্চ, ভিক্টোরিয়া পার্ক, সদরঘাটে রক্ষিত কামান। **ঝ. ঢাকার আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থান,** বিক্রমপুর, বাবা আদম শহীদের মসজিদ, সোনারগাঁও, নবীগঞ্জে কদম রসূল, মুন্সিগঞ্জে ইদ্রাকপুর দুর্গ, বন্দরে সোনাকান্দা দুর্গ, বন্দরে হাজী বাবা সালিহ-এর সমাধি ও মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ, মুয়াজ্জমপুর, মিরপুরে হজরত শাহ আলী সাহেবের দরগাহ, সাভার। ১৩১-১৪১

গ্রন্থ তালিকা ১৪২-১৪৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় - এক

ঢাকার ভৌগোলিক বিবরণ

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা।[১] গঙ্গা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের নিম্নাঞ্চল এবং অন্যান্য নদ-নদী ও সমতল ভূমি নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ। পদ্মা নদীর পশ্চিম তীর থেকে (গঙ্গা নদীর পূর্বাংশকে বলা হয় পদ্মা) পূর্বদিকে চট্টগ্রাম ও জৈয়ন্তিয়া পাহাড় শ্রেণী। উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদদেশে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এর সীমানা বিস্তৃত। এর মধ্যে আছে বিস্তৃত সমভূমি এলাকা, নিম্নাঞ্চল ও উর্বর ভূমি; পূর্বাঞ্চলের অনেক বড় বড় নদীবিধৌত এলাকার ওইসব নদী ও তাদের অনেক শাখা-প্রশাখা মিলিতভাবে সাগরে গিয়ে পড়েছে। প্রকৃতির উদারতার জন্য এখানে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, মাইলের পর মাইল ধরে এখানে সুবিন্যস্ত ও পরিশোভিত ধানক্ষেত দেখা যায়; নদ-নদী ও তার শাখা-প্রশাখার অসংখ্য পানি প্রবাহ ওইসব ধানক্ষেতকে যেন আলিঙ্গন করে আছে। সবুজের নিখুঁত মনোরম সৌন্দর্য – দীপ্তিময় রৌপ্য পাত্রে রাখা যেন পান্নার মতো।

ঢাকার অবস্থান : বিভিন্ন নদীর শাখা-প্রশাখা ও সমভূমি এলাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান ঢাকার। এর সাথে ছোট-বড় বিভিন্ন নদীর নৌপথের যোগাযোগ সুদৃঢ়। মূল এই এলাকার মধ্যে মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা এবং ধলেশ্বরী নদী (গঙ্গা নদীর প্রাচীন জলপথ) পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে। এসব নদ-নদী বহু রাজধানীর উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছে – এসব রাজধানীর মধ্যে আছে সাভার, বিক্রমপুর, সোনারগাঁও, জাহাঙ্গীরনগর এবং ঢাকা। এ শহরগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক দিক থেকে ঢাকার অবস্থান খুবই সুদৃঢ়। বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর পার্শ্বে উত্তর অক্ষাংশ ২৩.৪৩ এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ৯০.২৪ ডিগ্রিতে ঢাকার অবস্থান। মুসলিম ঐতিহাসিকরা এ নদীকে 'দুলাই' নদী হিসেবে আখ্যায়িত করেন – ধলেশ্বরী নদীর প্রায় ৮ মাইল উজানে এ নদীর অবস্থান। এ নদীর পানির গভীরতা অনেক এবং বড় বড় নৌকা চলাচলের উপযোগী। বর্ষা মৌসুমে এর প্রশস্ততা অনেক বেড়ে যায় এবং আশপাশের এলাকা পানিতে নিমজ্জিত হয়। ঢাকা শহরের উঁচু উঁচু মিনার ও দালান-কোঠাকে মনে হয় যেন পানির ওপর ভেসে আছে, প্রাচ্যের ভেনিস শহরের মতো।

ঢাকার সীমানা : বর্ষাকালে কেউ নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকার দিকে আসলে তিনি দেখতে পাবেন জলাভূমির ওপর মাটি দিয়ে উঁচু করা রাস্তা – ওই রাস্তার ওপর পাকা ইট বিছানো। দু'পাশে বিস্তৃত নিচুভূমি, অনেক স্থানে পানি। পানির ওপর দেখা যায় ধানের শীষ; বাতাসে দোল খাচ্ছে, যেন সদা হাস্যময়। ঢাকা শহরের পূর্ব দিকের শহরতলীতে দেখা যায় ধূসর রঙের দালান-কোঠা – এ যেন সবুজ শ্যামল চিত্রের ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বিপরীত। সমতল নিম্নাঞ্চল থেকে আকস্মিকভাবে সুউচ্চ আবাসিক এলাকার শুরু। মাঝে মাঝে দেখা যায় উঁচু উপদ্বীপের মতো – যেখানে আছে ঘরবাড়ি, চারপাশে ধানক্ষেত। বোঝা যায়, বসবাসের জন্য মানুষ কিছুটা স্থান মাটি ফেলে উঁচু করে নিয়েছে – এ ধরনের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উঁচু স্থান নজরে পড়ার মতো। এখানকার মাটির প্রকৃতি এমনই যে, ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জের দিকে শহর প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। (বর্তমানে অবশ্য ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে প্রায় কোনো বিভেদ নেই – প্রায় একই শহরে পরিণত হয়েছে। অনুবাদক)। অতীতে এ এলাকায় নদী ও শাখা নদীর অস্তিত্ব ছিল – এর মধ্যে বুড়িগঙ্গা নদী একটি। আগে বুড়িগঙ্গার স্রোতধারা গিয়ে পতিত হতো লক্ষ্যা নদীতে, এখন তা মিশে গেছে ধলেশ্বরীতে। শহরের সীমানা এখন বিস্তৃত রেল লাইন পর্যন্ত, ওই রেললাইন বিস্তৃত হয়েছে বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত পাটের অফিস পর্যন্ত। নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রাস্তা শেষ হওয়ার পর অন্য একটা পাকা রাস্তা প্রথমে উত্তর এবং পরে উত্তর-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে রমনার দিকে গেছে। নদীর পূর্ব এলাকায় শ্যামপুর, রাজাবাড়ী এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেল লাইনের উত্তর পাশে জুরাইন, মুরাদপুর ও দয়াগঞ্জ গ্রামগুলোর অবস্থান। এ এলাকায় শহরের প্রথম মহল্লা পোস্তাগোলা অবস্থিত।

বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীর বরাবর লম্বালম্বি ঢাকা শহর বিস্তৃত – দক্ষিণ দিকে এই নদীই এর শেষ সীমানা। অতীতে নৌ-যোগাযোগের সুবিধার জন্য নদীর আশপাশের এলাকার জমির চাহিদা ছিল অনেক বেশি। এর ফলে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে শহরের বিস্তৃতি প্রসারিত হয় এবং নদীর তীর বরাবর সুদৃশ্য অট্টালিকার মনোরম দৃশ্য নদীর দিক থেকে দেখতে ছিল মুগ্ধকর। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে পশ্চিম দিকের এলাকা ক্রমাগতভাবে উঁচু ছিল – শহরের বর্তমান সীমানার বাইরেও উঁচু এলাকা ছিল; কিন্তু তখন ওইসব এলাকায় শহরের বিস্তৃতি ঘটেনি।[২] শুধুমাত্র উঁচু অঞ্চলই ঢাকায় মোগলদের সীমানা হিসেবে চিহ্নিত ছিল।

১৯৫০ সাল নাগাদ পশ্চিম দিকে বাড়িঘর ও রাস্তার বিস্তৃতি ছিল হাজারীবাগ, মনেশ্বর ও পিলখানা পর্যন্ত। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে রায়ের বাজার, জাফরাবাদ ও সাত মসজিদ এলাকায় পুরনো দালান-কোঠার অস্তিত্ব ছিল। এখন ওইসব এলাকায় নতুন রাস্তা নির্মিত হয়েছে এবং ধানমন্ডি এলাকায় নতুন নতুন দালান নির্মিত হচ্ছে।[৩] বর্তমানে শহরের ব্যাপ্তি প্রায় ৫ মাইল লম্বা।[৪] উত্তর দিকে শহরের সীমানা নির্ধারণ করা বেশ কষ্টকর। কারণ, প্রায় প্রতিদিনই উন্নয়নের নতুন নতুন এলাকা নির্ধারিত হচ্ছে এবং ঢাকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন নতুন দালান-কোঠা নির্মিত হচ্ছে। গত শতাব্দীর[৫] শেষ দিকে উত্তর দিকের রেল লাইনকে শহরের সীমানা হিসেবে গণ্য করা হতো। এরপর বিক্ষিপ্তভাবে শহরের বিস্তৃতি ঘটে। এক সময় রমনা রেসকোর্সের পাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে ময়মনসিংহ রোড বরাবর কুর্মিটোলা পর্যন্ত এবং তেজগাঁও থেকে টঙ্গী পর্যন্ত শহরের বিস্তৃতি ঘটে – বুড়িগঙ্গা নদী থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৫ মাইল। এ সময় তেজগাঁও শিল্প এলাকার দিকে শহরের বিস্তৃতি ঘটে, নতুন দালান-কোঠা নির্মিত হতে থাকে। শহর বিস্তৃতির ক্ষেত্রে শান্তিনগর এলাকা পিছিয়ে পড়ে; ঢাকার ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিলে তখনো দালান-কোঠা নির্মাণ শুরু হয়নি। শহরের এই সীমানা ছিল সাময়িক, কারণ এ এলাকার উঁচু স্থানে শহর বিস্তৃতির যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে। শিল্প এলাকার উন্নয়ন এবং ওই এলাকায় রেল লাইন স্থানান্তরিত করা হলে উত্তর দিক শহরের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে নিঃসন্দেহে।

অভ্যন্তরীণ নৌপথ উপমহাদেশের অনেক পুরনো শহরের মতো ঢাকার রাস্তা আঁকাবাঁকা, ঘোরানো এবং এসব রাস্তার সাথে সংযুক্ত অনেক গলিপথ। এসব রাস্তা বা গলিপথ শেষ হয়েছে বিভিন্ন মহল্লায় এবং এসব মহল্লা আবার বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন বাজার, গঞ্জ, নগর, টুলি, টোলা, টালি ইত্যাদি। এর মধ্যে অনেক মহল্লা শহর পরিচিতির ম্যাপে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে শহরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। পুরনো শহরের মধ্যদিয়ে একাধিক খাল প্রবাহিত, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ধোলাইখাল। বাবু বাজারের কাছে এর উৎপত্তি। অতঃপর জিন্দাবাজার ও গোয়ালনগরের উত্তর দিক পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে, নবাবপুর রোড ও নারিন্দা রোড বিভক্ত করে, জালুয়ানগর ও হাল শারাফতগঞ্জ ঘুরে লোহার পুলের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তা পুনরায় বুড়িগঙ্গায় গিয়ে পতিত হয়েছে। ড. এন কে ভট্টশালীর মতে, ঢাকার প্রথম মোগল গভর্নর ইসলাম খান ধোলাইখাল খনন করান।[৩] (ধোলাই খালের ওপর নির্মিত লোহার পুলটি ২০০০ সালের আগস্ট মাসে ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং খাল ভরাট করে রাস্তা তৈরি করা হয়। অনুবাদক)। মোগল-পূর্ব যুগের এই শহরকে রক্ষা করা এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথে যোগাযোগ রক্ষা করাই ছিল ওই খাল খননের উদ্দেশ্য। শহরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এই খালকে প্রয়োজনীয় হিসেবে রেখে দেয়া হয় – প্রস্তাব করা হয়, দেশীয় নৌকার চলাচলের উপযোগী করে এ খালকে অভ্যন্তরীণ নৌ-যোগাযোগের কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হবে, খালের দু'পাশে পাথরের স্ল্যাব স্থাপন করে পায়ে হাঁটা পথ নির্মাণ করা হবে এবং প্রতি কোয়ার্টার মাইল অন্তর অন্তর ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। মোগল যুগের অনেক ব্রিজে পানি-প্রবাহের জন্য বাঁকা পথের ব্যবস্থা করা আছে স্প্যান বসিয়ে। এ পথ দিয়ে শহরের ময়লা-আবর্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে; এ ব্যবস্থায় অবশ্য মশা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। তবে ময়লা-আবর্জনার এসব নিষ্কাশন পথ পরিষ্কার করা হলে এবং খাল পথকে দেশীয় নৌকা চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তোলা হলে ঢাকা শহর জনগণ ও পর্যটকদের কাছে নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় স্থান হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়িগঙ্গা : বর্তমানে ঢাকায় নৌপথে ভ্রমণের সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো বুড়িগঙ্গা নদী। মোগল যুগে নবাব শায়েস্তা খান বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে লালবাগ পর্যন্ত নদীর তীরে একটা বাঁধ নির্মাণ করেন। মিটফোর্ড হাসপাতালের কাছেই নওয়াব শায়েস্তা খানের প্রাসাদ ছিল। মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে লালবাগ পর্যন্ত এলাকাকে বলা হতো পোস্তা। ওই বাঁধ এখন আর নেই। তবে লালবাগের দক্ষিণে পানি শোধনাগারের কাছে পোস্তা নামের মহল্লাটি এখনো আছে। এর আশপাশের এলাকাগুলোর নাম হলো – রহমতগঞ্জ, কাশেরহাট (প্রকৃত উচ্চারণ কস্‌রাহাট; কসর অর্থ প্রাসাদ), উর্দু বাজার, নুরাফাত, লালবাগের পূর্বপাশে বখশীবাজার এবং পশ্চিম পাশে অতীশখানা, শেখ সাহেব বাজার, চৌধুরী বাজার, কাসিমনগর, নবাবগঞ্জ (কাজীরবাগ ও হাজারীবাগসহ)। ঐতিহাসিক দিক থেকে এসব এলাকার গুরুত্ব আছে; এসব এলাকাতেই মোগল কর্মকর্তারা বসবাস করতেন। প্রাচীনকালে চাঁদনীঘাট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। নদী সংলগ্ন আরো কয়েকটি ঘাট ছিল। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো – দেবীদাসঘাট, সোয়ারীঘাট, বাদামতলীঘাট, ওয়াইজঘাট এবং জগন্নাথঘাট। এসব ঘাট এলাকায় প্রতিদিন বাজার বসতো; দেশীয় নৌকায় করে গ্রাম থেকে বিভিন্ন রকম ফল, শাক-সবজি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এখানে আনা হতো। এসব জিনিস বেশ সস্তায় পাওয়া যেতো। সরাসরি বাদামতলীঘাট পর্যন্ত স্টিমার যেতে পারতো। এখানে স্টিমার থেকে মাল খালাস ও স্টিমারে মাল বোঝাই করার জন্য আধুনিক একটা বাঁধ তৈরি করা হয় – এর নাম বাকল্যান্ড বাঁধ। আহসান মঞ্জিল ও নর্থব্রুক হলের সামনে জগন্নাথঘাট থেকে ওই বাঁধ বিস্তৃত ছিল বাদামতলীঘাট পর্যন্ত। সম্প্রতি বুড়িগঙ্গার গতিপথ সাত মসজিদের কাছে পরিবর্তিত হয়েছে এবং প্রায় এক মাইল পশ্চিম দিক থেকে তা প্রবাহিত হচ্ছে। সাত মসজিদ এলাকা পরিণত হয়েছে জলাভূমিতে এবং শুষ্ক মৌসুমে তা একেবারে শুকিয়ে যায়।

প্রধান প্রধান বাজার : ঢাকায় বাণিজ্য প্রসারে বুড়িগঙ্গা নদীর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্র নদীর কাছাকাছি এলাকায় গড়ে উঠবে। ঢাকার সবচেয়ে বড় বাজার এলাকা হলো চক, বড় কাটরার পাশে। সোয়ারী ঘাট থেকে চকবাজার যাওয়া যায়। চকবাজার খুবই ব্যস্ত এলাকা। এখানকার পাইকারি বিক্রেতাদের গুদাম ঘরগুলো নদীর তীরে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। পোস্তা ও রহমতগঞ্জ হলো খাদ্যশস্য ও চামড়ার বাজার; মিটফোর্ড রাস্তার দু'পাশে তৈজসপত্র, ফ্যাশন দ্রব্যাদি, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও কাপড়ের পাইকারি দোকান দেখা যায়। বাবুবাজার ব্রিজ পেরিয়ে ইসলামপুর রোড বরাবর দেখা যায় বিভিন্ন দ্রব্যের খুচরা বিক্রেতার দোকান। এরপর পাটুয়াটুলী, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগে এখানে ছিল হিন্দুদের সোনা-রূপার দোকান। কিন্তু পরে ব্যাপ্টিস্ট মিশনের রাস্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোড় পর্যন্ত সব ধরনের জিনিসের খুচরা বিক্রির দোকান গড়ে ওঠে। রাস্তার মোড়ের পর জেনারেল পোস্ট অফিস ও বইয়ের দোকান। আরো সামনের দিকে এগিয়ে গেলে দেখা যায় হিন্দু এলাকা, এখানে কাঁসা ও পিতলের দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়। এরপর বাংলাবাজার রোড, এখানে আছে আসবাবপত্রের দোকান। তবে ঢাকার প্রধান কেনাবেচার কেন্দ্র হলো নবাবপুর রোড। এখানে রুচিবান কোনো লোক তাঁর প্রয়োজনীয় সব জিনিসই কিনতে পারেন। সম্প্রতি ধানমন্ডি এলাকায় নিউ মার্কেট এবং গুলিস্তান এলাকায় নতুন শপিং সেন্টার গড়ে উঠেছে।[১]

ঢাকার জনসংখ্যা : ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির আওতায় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ২ লাখ ৭৩ হাজার ৪৫৯ জন।[২] তেজগাঁও এবং অন্যান্য নবগঠিত এলাকার জনসংখ্যা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি – ওইসব এলাকা অবশ্য বৃহত্তর ঢাকার অন্তর্ভুক্ত, তবে সাময়িকভাবে মিউনিসিপ্যাল সীমানার বাইরে। তেজগাঁও থানার জনসংখ্যা ১ লাখ ৫৯ হাজার ৩৯৪ জন।

সংক্ষেপে ঢাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা যায় এভাবে – ঢাকা শহরের প্রশস্ত এলাকার সতেজ চিত্র যেন বাংলার চিরাচরিত সবুজ চিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। শহরের চারপাশে মাইলের পর মাইল নিম্নাঞ্চল বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। ঢাকা শহরের পুরনো 'সাক্ষী' হলো বুড়িগঙ্গা নদী – এ নদী তার উত্তর পাশে ঢাকা শহরকে শুধু ধারণ করেই রাখেনি, এর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ নদীর পানিতে প্রতিবিম্বিত হয় ঢাকার অতীত ইতিহাস। গম্বুজ, মিনার, কাটরা, মসজিদ, উঁচু অট্টালিকা ও দুর্গ – সবকিছুই নদীর শান্ত স্রোতের ওপর গভীর ছায়া ফেলে। পুরনো শহর তার মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য, আঁকাবাঁকা রাস্তা ও প্রাচীন বাজার নিয়ে টিকে আছে, যেন তার উৎপত্তির গোপন ইতিহাস আঁকড়ে ধরে আছে। আবাসিক বাড়ি-ঘরের আশপাশ দিয়ে প্রবাহিত নালা দেখে অনুধাবন করা যায় যে, এসব এলাকায় আগে অনেক খাল-নালা ছিল। পুরনো শহরে বেশ কয়েকটা বড় রাস্তার মোড় আছে। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তন হলো নতুন শহরের সংযোজন – এতে আধুনিক রুচির সাথে শহরের জীবনধারার আমূল পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঢাকার এখন পুনর্জন্ম ঘটেছে – পুরনো থেকে নতুন বিশ্বে।

সূত্র :

১. গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। এ সময় ঢাকা ছিল পূর্ববাংলার রাজধানী, প্রাদেশিক রাজধানী। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ববাংলা তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করে। প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা পরিবর্তিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকার ইংরেজি বানান তিনি লেখেন Dacca। তবে এর সঠিক বানান Dhaka বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

২. বর্তমানে (২০০৪) সালে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু উঁচু এলাকাতেই শহরের বিস্তৃতি ঘটেনি, অনেক নিচু এলাকায় মাটি ভরাট করে সুদৃশ্য অট্টালিকা গড়ে উঠেছে।

৩. ১৯৫৬ সালের দিকে।

৪. ঐ

৫. উনবিংশ শতাব্দী।

৬. দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন।

৭. ঢাকায় এখন অসংখ্য শপিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে অনেকগুলো বহুতলবিশিষ্ট ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

৮. ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জনসংখ্যা ২০০১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী ৯৯,১২,৯০৮ জন।

EUROPEAN SETTLEMENT IN OLD DACCA

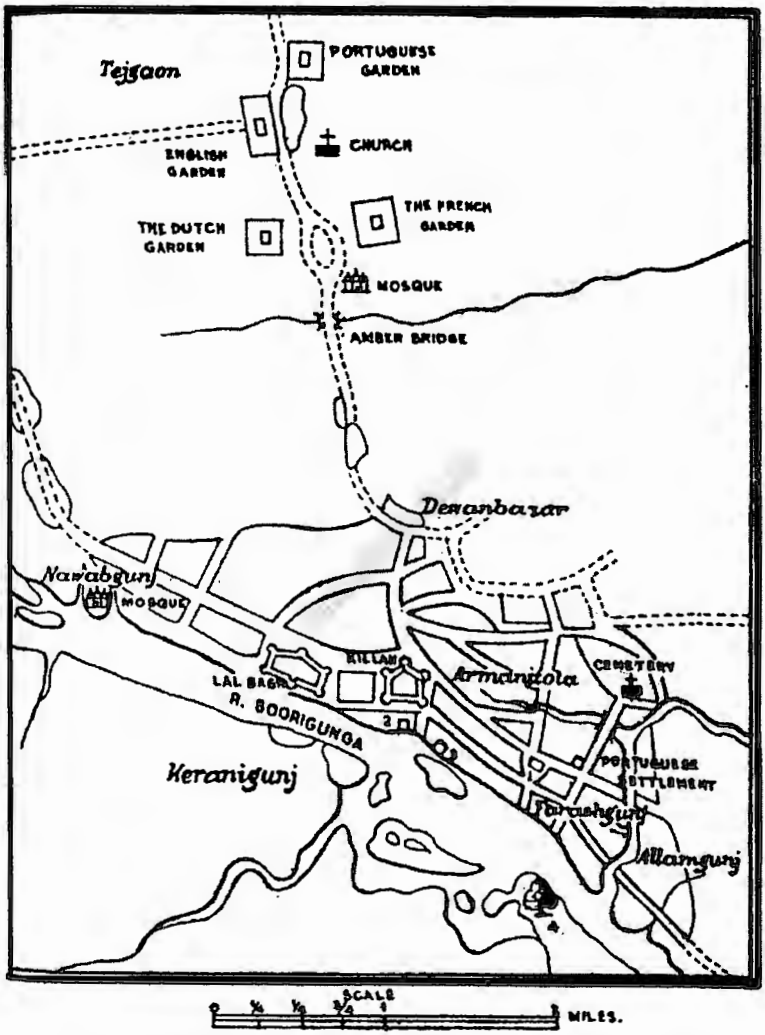

1. ENGLISH FACTORY. 2. DUTCH FACTORY. 3. FRENCH FACTORY. 4. THE GREAT TREE.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় - দুই

ক. ঢাকার ইতিহাস

ঢাকার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। এর উৎপত্তি নিয়ে আছে অনেক কল্পকাহিনী; এর অগ্রগতির বিবরণ নিয়েও অনেক মতপার্থক্য আছে। তবে হিন্দু ও বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে ঢাকার অগ্রগতি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। এ আমলেই ঢাকার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির প্রথম আভাস পাওয়া যায়। তবে ঢাকা প্রথম বিশেষভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে মোগলদের অধীনে। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মোগলরা ঢাকায় প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করে। ঢাকা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র এবং এসব কাজে মোগলরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী একশ' বছর ধরে এসব কর্মকাণ্ড সারা বাংলাকে প্রভাবিত করে। অনেক বিদেশী পর্যটক এ সময় ঢাকা সফর করেন এবং তাঁরা ঢাকার সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এরপর ঢাকার অবস্থার অবনতি ঘটে। মোগল সম্রাটের ভাইসরয় আজিম-উশ-শান ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ত্যাগ করেন। তাঁর বিদায়ের সাথে সাথে ঢাকায় মোগলদের প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসান হয়। সরকারের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় মুর্শিদাবাদে। ঢাকার ভবিষ্যত শাসনকর্তা নায়েব নাজিম বা তাঁদের প্রতিনিধিরা বাহ্যিকভাবে মোগল আভিজাত্য ও চাকচিক্য বজায় রাখার জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ যোগাড় করতে শুরু করেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের সাথে সাথে একটা পরিবর্তন আসে, তবে নায়েব নিজামতের পুরনো ধারা টিকে থাকে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এটা ছিল একটা পরিবর্তনের যুগ। পুরনো মোগল জীবনধারা আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তার স্থান দখল করে নেয় ইউরোপীয় জীবনধারা ও ফ্যাশন। ইউরোপের কারখানায় তৈরি দ্রব্য-সামগ্রী ঢাকার বাজার দখল করে, স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের পতন ঘটে। জনসংখ্যা কমে আসে, শহরের পরিধিও সঙ্কুচিত হয়।

ঢাকার রাস্তা প্রশস্ত করা হয়। শহরের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করা হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঢাকায় শুরু হয় আধুনিক জীবন। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির একটা মফস্বল শহর হিসেবেই ঢাকা গড়ে ওঠে। এরপর আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে, প্রথম বঙ্গভঙ্গের পর। এ সময় ঢাকা হয় নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী। শহরে শুরু হয় এক নতুন জীবনধারা– রমনা এলাকার বড় বড় অট্টালিকাগুলো ক্রমে সবার দৃষ্টিতে নিবদ্ধ হয়। ঢাকার নতুন অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। বঙ্গভঙ্গ বাতিল করা হয় এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল ঢাকা পুনরায় তার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় আসেন এবং ঢাকায় একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সময় থেকে এ এলাকায় বিশেষ করে শহর এলাকায় শিক্ষার বিস্তার ঘটে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ঢাকা আবার পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয়; ঢাকায় শুরু হয় নতুন ও স্বাধীন জীবনধারা। পাকিস্তানের পূর্বাংশের রাজধানী শহর হিসেবে ঢাকার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

ঢাকা শহরের অগ্রগতির কাহিনী পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে বিস্তারিতভাবে।

ঢাকা নামের উৎপত্তি : ঢাকা নামের উৎপত্তি নিয়ে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা অস্পষ্ট। এ সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত আছে। অত্যন্ত জনপ্রিয় মত হলো – ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়েছে 'ঢাক' নামক এক ধরনের গাছ থেকে। 'ঢাক' বা Butea Frondosa নামের ওই গাছ এখানে প্রচুর পাওয়া যায়।[২] ড. টেলর অন্য একটা ঘটনার কথাও বলেন, "এখানকার সব শ্রেণীর হিন্দু বিশ্বাস করে যে, বল্লাল সেন হলেন 'বেরহাম-পুটের' (ব্রহ্মপুত্র) পুত্র এবং তিনি আছেন একজন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে – তিনি হলেন আদীশূর-এর যে কোনো একজন স্ত্রীর পুত্র। তিনি জন্মগ্রহণ করেন বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তরে এক জঙ্গলের মধ্যে এবং সেখানেই তিনি লালিত-পালিত হন। ওই জঙ্গলেই তার মাকে আদীশূর নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আরো বলা হয় যে, এ অবস্থায় তিনি দুর্গার আশ্রয় পান এবং কৃতজ্ঞতাবশত তিনি আদীশূর নামে একটা মন্দির তৈরি করেন। দুর্গা দেবীর মূর্তিটি পরে মানসিংহ খুঁজে পান ওই জঙ্গলে। গুপ্ত থাকা এ স্থানকে ঢাকা বলা হয় (অর্থাৎ Dhaka-র বাংলা অর্থ গুপ্ত বা ঢাকা); গুপ্ত ওই স্থানকে অভিহিত করা হয় 'দেহাকা ইসওয়ারী' অর্থাৎ ঢাকেশ্বরী। পরে ওই জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় এবং সেখানে একটা শহর গড়ে ওঠে। ওই শহরই 'দেহাকা' বা ঢাকা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।"[৩] তৃতীয় একটা মতের কথা উল্লেখ করেছেন সাইয়ীদ আউলাদ হাসান। তিনি বলেন, জনশ্রুতি আছে যে, 'ঢাক' শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে 'ঢাকা' নামের উৎপত্তি হয়েছে। বাংলায় 'ঢাক' বলতে বুঝায় বড় ঢোল বা মৃদঙ্গ। কথিত আছে যে, পূর্বাঞ্চল থেকে আফগান ও মগদের ক্রমাগত আক্রমণের প্রেক্ষিতে রাজমহল থেকে নিজামতের পূর্বাঞ্চলের কোনো এক সুবিধাজনক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রদেশের মোগল গভর্নর শেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খান ভবিষ্যত রাজধানীর স্থান অনুসন্ধানে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে রাজকীয় বজরায় বেরিয়ে পড়েন; তাঁর সাথে ছিল বিরাট নৌবহর। শহরের বর্তমান অবস্থান স্থলের বিপরীত দিকে উপস্থিত হওয়ার পর গভর্নর স্থানটিকে কৌশলগত দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তিনি এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানটিকেই প্রদেশের ভবিষ্যত রাজধানীর স্থান হিসেবে পছন্দ করেন। নৌকাগুলো নদীর তীরে নিয়ে এসে নোঙ্গর করা হয়। ইসলাম খান বজরা থেকে অবতরণ করেন এবং স্থানটি পরিদর্শন করেন। যে স্থানে তিনি অবতরণ করেন সেই স্থানটি এখনো তাঁর নামানুসারে ইসলামপুর নামে পরিচিত। স্থানটি শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। বজরায় ফেরার পথে ইসলাম খান হিন্দু সম্প্রদায়ের একদল লোককে ঢাক ও অন্যান্য বাদ্য বাজিয়ে পূজা করতে দেখেন। তাঁর মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে যায়। তিনি সব ঢোলককে একসাথে ডাকেন, তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াতে বলেন। এরপর তিনি তাঁর তিনজন লোককে এককভাবে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে প্রেরণ করেন। প্রত্যেকের কাছে একটা করে পতাকাসহ পতাকাদণ্ড দেয়া হয়। তাদেরকে বলে দেয়া হয়, যে স্থান পর্যন্ত ঢোলের শব্দ শোনা যায় সেই স্থানে ওই পতাকাদণ্ড মাটিতে পুঁততে হবে। এদিকে ঢোলকদের যতো জোরে সম্ভব ঢোল বাজাতে বলা হয়। এভাবে সীমানা চিহ্নিত হওয়ার পর তিনি ওই স্থানের নামকরণ করেন ঢাকা। অর্থাৎ 'ঢাক' (ঢোল) থেকে নামকরণ করা হয় ঢাকার। অতঃপর পতাকাদণ্ড স্থাপন বরাবর তিনি সীমানা দেয়াল নির্মাণের নির্দেশ দেন। এভাবেই পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে শহরের সীমানা নির্ধারিত হয় – দক্ষিণে ছিল প্রাকৃতিক সীমানা বুড়িগঙ্গা নদী। এখানেই তিনি রাজধানী স্থাপনের স্থান মনোনীত করেন।[৪]

জনশ্রুত এ কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রায় নেই। ড. এন কে ভট্টাশালী বেশ স্পষ্টভাবেই বলেন, 'ঢাক-এর কাল্পনিক কাহিনী বা মানসিংহ কর্তৃক বল্লাল সেনের হারিয়ে যাওয়া দেবী (ঢাকা-ঈশ্বরী) উদ্ধারের কাহিনী আমি বিশ্বাস করি না। ঢাকেশ্বরীর মূর্তি সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে যে কেউ বলতে পারেন যে, ওই মূর্তি বল্লাল সেনের সময়কার নয়।'[৫]

তাছাড়া একথা সবাই জানেন যে, ইসলাম খান শহরের নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। শহরের প্রাচীন নাম ঢাকা এবং ইসলাম খান ও মানসিংহের এখানে অবস্থানের পূর্বেও এ শহরের অস্তিত্ব ছিল।

ড. ডি সি সরকার মত প্রকাশ করেন যে, ঢাকা সম্ভবত 'ঢাক্কা' শব্দের সমার্থক – কালহানের 'রজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে দেখা যায়, 'ঢাক্কা' শব্দের অর্থ 'পাহারাকেন্দ্র'।[৬] এ কারণে তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যে, শহরটি উঁচু স্থানে অবস্থিত এবং পার্শ্ববর্তী বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও হিন্দু রাজাদের রাজধানীর 'পাহারাকেন্দ্র' হিসেবে এলাকাটি ব্যবহৃত হতে পারে। পরে 'ঢাক্কা' শব্দটি 'ঢাকা' শব্দে স্থায়ীভাবে রূপান্তরিত হয়। প্রাকৃত ভাষার স্থানীয় বাচনভঙ্গি 'ঢাক্কা', এই দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, ঢাকার আশপাশের লোকরা এ ধরনের ভাষায় কথা বলতো। অনেক পূর্বে 'ঢাক্‌কিয়া' প্রাকৃত সম্পর্কে উল্লেখ করেন যতীন্দ্র মোহন রায়।[৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. মোগল-পূর্ব ইতিহাস

(১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

মুসলিম-পূর্ব যুগ : ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় গুপ্ত যুগের স্বর্ণমুদ্রায় অঙ্কিত ছাপ থেকে – এ তথ্য সপ্তম শতাব্দীর প্রায় কাছাকাছি সময়ের। এ ধরনের মুদ্রা পাওয়া যায় স্থানীয় পিলখানার সামান্য পশ্চিমে 'নবাব রশিদ খান কা বাগিচা'য়, বর্তমানে ওই এলাকা আবাদি জমিতে পরিণত হয়েছে।[৮] এসব মুদ্রা থেকে ঢাকা শহরের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঢাকার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। জে এফ ফ্লীট-এর সাথে একমত হয়ে স্টেপলটন বলেন যে, এলাহাবাদে সমুদ্র গুপ্তের (চতুর্থ শতাব্দী) শিলালিপিতে 'দেবকা'[৯] শব্দ দেখতে পাওয়া যায়; ওই সময় ঢাকার[১০] অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু ড. এন কে ভট্টশালী 'দেবকা' শব্দকে আসামের নাওগঙ্গ জেলার আধুনিক 'দাভোক' বা 'ডাভোক' বলে গণ্য করেন।[১১] শহরের উত্তর দিকে তেজগাঁও এলাকায় একটা পুরনো জলাশয়ে হরিশংকরার একটা মূর্তি (অর্ধেক হরি এবং অর্ধেক শংকরা) পাওয়া যায়। 'প্রায় ত্রিশ ইঞ্চি উঁচু কালো ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত মূর্তিটি দেখতে খুবই সুন্দর, এটা সেন রাজত্বকালে (১১-১২ শতাব্দী) নির্মিত বলে মনে করা হয়। তেজগাঁও রেল স্টেশনের দু'ফার্লং উত্তরে রেললাইনের ওপর নির্মিত পাকা ওভার ব্রিজের কাছে ওই মূর্তিটা পাওয়া যায়।[১২] খণ্ড খণ্ড এসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম-পূর্ব যুগেও এ এলাকায় ঢাকার অস্তিত্ব ছিল।

বাংলায় সুলতানদের অধীন ঢাকা : পাথরে খোদাই করা দু'টি বিবরণ থেকে বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের ইতিহাস সম্পর্কে বেশকিছু তথ্য পাওয়া যায় – খোদাই করা ওই পাথর দু'টি আবিষ্কৃত হয় ঢাকা শহরেই। সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ (প্রথম)-এর রাজত্বকালে (১৪৩৫-১৪৫৯) ওই পাথর দু'টি খোদাই করা হয়।

বিনত্ বিবি মসজিদের খোদাই পাথর নারিন্দা এলাকায় বিনত্ বিবি মসজিদের দরজার ওপরে ক্ষুদ্র একটা চ্যাপ্টা পাথরে খোদাই করা লেখা দেখতে পাওয়া যায়।[১৩] ওই লেখাটি হলো – 'বিসমিল্লাহ, কলেমা, সকাল ও রাতে মঙ্গলের পথে আসার আহবান বিনীত এই ব্যক্তির মসজিদে। মোসাম্মাৎ বখত বিনত্, মারহামাতের কন্যা। ৮৬১ (১৪৫৭) সাল।'[১৪]

এইচ. ই. স্টাপলটন উল্লেখ করেন : 'খোদাই-এর ভাষা ফার্সি, কিছুটা কৌতূহলকর – এ লেখায় সমসাময়িক শাসনকর্তার নামের উল্লেখ নেই'।[১৫] বখত বিনত্-এর পরিচয় জানা যায়নি। তবে নাম থেকে মনে হয়, ওই মহিলা সমাজের উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নসওয়াল্লা গলি মসজিদের খোদাই পাথর : খোদাই করা ওই পাথরটি এখন ঢাকা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। প্রথম খোদাই করা পাথরের সময়ের দু'বছর পর এ পাথরটি খোদাই করা হয়। নসওয়াল্লা গলির একটা পুরাতন মসজিদ থেকে খোদাই করা এ পাথরখানি সংগ্রহ করা হয়। নসওয়াল্লা গলি হলো ঢাকার 'গির্দ-ই-কিলা' নামে পরিচিত এলাকার একটা রাস্তার নাম। এই মসজিদ সম্পর্কে আউলাদ হাসান বলেন, 'মসজিদটি খুবই প্রাচীন এবং এর নির্মাণ কাঠামো অত্যন্ত দৃঢ়; পাগলা গারদের ঠিক পশ্চিম দিকে এর অবস্থান। এর ছাদ একটা গম্বুজ দিয়ে ঘেরা। কয়েক বছর পূর্বে বজ্রাঘাতে গম্বুজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পেও মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় এক বছর আগে গম্বুজটি ধসে পড়ে। মসজিদের দেয়ালগুলো এখনো খাড়া আছে – প্রায় চার ফুট চওড়া এর দেয়াল। মসজিদের অভ্যন্তরের মাপ হলো ২৭ ফুটXসাড়ে ১৬ ফুট।'[১৬] প্রাচীন ওই মসজিদের স্থানে এখন নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। পুরাতন মসজিদে প্রাপ্ত খোদাই করা পাথরে লেখা ছিল – 'বলুন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান; নিশ্চয়ই মসজিদ আল্লাহর। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেন না। এই দরজা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নির্মিত এবং তা নির্মাণ করা হয়েছে আল্লাহর খলিফা বাদশাহ নাসির উদ-দুনিয়া, ওয়াদ-দীন, আবু আল-মুজাফফর, মাহমুদ শাহ-এর শাসনামলে। তিনি খাজা জাহান উপাধিপ্রাপ্ত। মানুষ আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। আল্লাহ তাঁর শাসনামলকে স্থায়ী করুন। দয়াময় আল্লাহ তাঁকে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করুন। মুবারকবাদ-এর সীমান্ত অঞ্চল শেষ বিচার দিন পর্যন্ত আল্লাহ রক্ষা করুন। আজ ২০ শাবান, ৮৬৩ (১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ) হিজরি সাল। আল্লাহ নবীর ওপর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন'।[১৭]

পাথরে খোদাই করা লেখায় মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হয়নি – বলা হয়েছে মসজিদে প্রবেশের গেট বা দরজা নির্মাণের কথা। আউলাদ হাসান ওই খোদাই করা পাথর খণ্ডটি মসজিদে দেখতে পান; সুতরাং বলা যায় – পাথর খণ্ডটি স্থানান্তর করা হয়েছে।

খোদাই করা পাথরে মোবারকবাদ অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। এইচ. ই. স্ট্যাপলটন মোবারকবাদ অঞ্চলের সাথে পূর্ববাংলার স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ)-এর সম্পর্ক থাকার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, 'সীমান্ত অঞ্চল' বলতে অন্তর্ভুক্ত আছে 'প্রাচীন বিক্রমপুরের সব অঞ্চল' অর্থাৎ ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার বর্তমান এলাকা এবং ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ অঞ্চল (যার মধ্যে আছে গঙ্গা নদীর পুরাতন গতিপথ ও পূর্বদিকের মেঘনা নদীর গতিপথের মধ্যকার এলাকা)। আইন-ই (আইন-ই-আকবর)-তে সরকার বাজুহার পরগনা মোবারক উজায়ল (Mubarak Ujayl)-এর কথা বলা হয়েছে (খণ্ড-২, জ্যারেটের অনুবাদ, পৃ. ১৩৮)। এ অঞ্চল তখনো ঢাকা জেলার একটা বড় পরগনা হিসেবে আছে – ওই এলাকার মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম এলাকা অর্থাৎ দক্ষিণে পদ্মা ও উত্তরে ধলেশ্বরী নদীর মধ্যবর্তী এলাকা।[১৮]

বেঙ্গলা শহর ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ঢাকার সমৃদ্ধি সম্পর্কে ড. টেলর যে সিদ্ধান্ত দেন তার ভিত্তি ছিল ইউরোপীয় পর্যটকগণ, তারা গোটা ঢাকা শহরকেই ওই নামে (বেঙ্গলা) অভিহিত করে। সম্ভবত, ওই বাজার এলাকায় মূলত বিদেশীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। ঢাকা ও বেঙ্গলার পরিচিতি এক। একথা একজন পর্যটক উল্লেখ করেন এবং সে কারণে অনেকে ধারণা করেন যে, ঢাকা ও বেঙ্গলা একই শহর।[১৯] প্রাচীন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ড. ডি সি গাঙ্গুলী মন্তব্য করেন : 'বেঙ্গলা নামে কোনো শহর ছিল না'।[২০]

বিভিন্ন পুস্তকে ঢাকা নামের উল্লেখ আকবরনামা ও বাহারিস্তান-ই-গায়েবী পুস্তকে ঢাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; এতে প্রমাণিত হয় যে, ঢাকা শহরের অস্তিত্ব ছিল। আকবরনামায়[২১] ঢাকার কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই আকবরনামার ধারাবাহিকতায় এনায়েতুল্লা বর্ণনা করেন মোগল গভর্নরদের বিভিন্ন যুদ্ধ, শাহবাজ খান (১৫৮৩-১৫৮৫) ও মানসিংহের (১৫৯৪-১৬০৬) ইতিহাস। এসব ইতিহাসেও ঢাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। সৈয়দ হোসেনের 'থানাদার অব ঢাকা' গ্রন্থখানি আমরা পড়েছি। পূর্ববাংলার বার ভূঁইয়াদের প্রধান ঈশা খাঁ (খ্রি. ১৫৯৯) ওই সৈয়দ হোসেনকে বন্দী করেন।

পুরনো ঢাকার অবস্থান : মোগল-পূর্ব যুগে ঢাকা শহরের বিভিন্ন তথ্য বাহারিস্তান-ই-গায়েবী পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে; ওইসব তথ্য গ্রথিত করেন ড. এন কে ভট্টশালী।[২২] তিনি লেখেন – 'মীর্জা নাথনের পুস্তক (বাহারিস্তান-ই-গায়েবী) থেকে আমরা প্রাচীন ঢাকার এবং শহরের প্রবেশের অনেক নদীপথের বর্ণনা পাই বিস্তারিতভাবে। সাধারণ হিসাবে ইসলাম খানের সাথে প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য আসে; তাঁর শিবিরে যেসব লোক ছিল এবং মাঝিদের সংখ্যা নিয়ে তাঁর সাথে আসা লোকের সংখ্যা ৫০ হাজারের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। প্রায় একলাখ লোকের আকস্মিক আগমনে মোগলদের এই সাধারণ ঘাঁটি গুরুত্বপূর্ণ এক শহরে পরিণত হয়; নবাগতদের বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য মোগলদের জন্য গড়ে ওঠে এক নতুন ঢাকা...। ১৬১০-১৬১১ খ্রিস্টাব্দের দিকে পুরনো ঢাকা ও নতুন ঢাকার মধ্যেকার পার্থক্য স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। ঢাকায় আগমনের পর নাথন ও তাঁর পিতা ইহতিমাম খানকে সাদর অভ্যর্থনা জানান ইসলাম খান স্বয়ং। তাঁদের আগমনের দু'দিন আগে ইসলাম খান ঢাকায় আসেন স্থলপথে। তাঁরা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ঢাকার দুর্গের দিকে যাত্রা করেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, ঢাকায় পৌঁছার আগেই ধুলাই (Dulai) নদী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে – এর একটা শাখা ডেমরার কাছে লক্ষ্যা নদীতে গিয়ে মিশে গেছে এবং অপর শাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশেছে খিজিরপুরের কাছে লক্ষ্যা নদীতে। ঢাকার বর্তমান অবস্থান বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে – ওই বর্ণনায় বুড়িগঙ্গা নদীর নামের উল্লেখ নেই। এ নদীর প্রাচীন নাম ধুলাই। বুড়িগঙ্গা বর্তমানে ফতুল্লার (প্রাচীন ধাপা) দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে সামান্য বাঁক বা মোড় নিয়েছে (সেখান থেকে খিজিরপুরের দিকে মোড় নিয়েছে) এবং ধলেশ্বরীতে মিলিত হয়েছে। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা এই নৌপথ ইসলাম খানের ঢাকা আগমন ও ঢাকা দখলের সময় ছিল না। ঢাকা বর্তমানে যে নদীর (বুড়িগঙ্গা) তীরে অবস্থিত তা আগে মিশে গিয়েছিল লক্ষ্যা নদীর দুই ধারার সাথে – একটা ধারা পতিত হয় বর্তমান নারায়ণগঞ্জের উত্তরে খিজিরপুরে এবং অপর ধারাটি পতিত হয় প্রায় চার মাইল উজানে – ডেমরায়।

'যে স্থানে ধুলাই বিভক্ত হয়ে যায়, সেখান থেকে ডেমরার দিকে প্রবাহিত ধারার যে কোনো একপাশে বেগ মুরাদের দু'টো দুর্গ ছিল। ইসলাম খান এ দু'টো দুর্গের একটি ইহতিমাম খান এবং অপরটি নাথনের ওপর তত্ত্বাবধানের ভার দেন। পশ্চিম পাশে অবস্থিত দুর্গের কাছে নাথন তাঁর বাসগৃহ নির্মাণ করেন। ধুলাই নদীর এ শাখাটি এখনো ঢাকা শহরের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ শাখাকে এখন বলা হয় ধুলাই খাল এবং তার উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বালু নদীর সাথে মিশেছে। অতঃপর পুনরায় ডেমরার কাছে লক্ষ্যা নদীতে গিয়ে মিশেছে... ইসলাম খানের বাসগৃহে যাওয়ার পথের নাথন যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন তা থেকে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের ঢাকার একটি চিত্র পাওয়া যায়। ধুলাই খালের মুখে নিজ বাসগৃহ থেকে নাথন যাত্রা শুরু করেন এবং আস্তে আস্তে একটা প্রাচীন 'পাকুড়' গাছের নিকটবর্তী হন। নাথন বলেন যে, 'ওই 'পাকুড়' গাছটি পুরনো ও নতুন ঢাকার সীমানায় অবস্থিত ছিল; ওই স্থানটি ছিল তাঁর এবং ইসলাম খানের বাসগৃহের মধ্যবর্তী এলাকায়। ওই স্থানের ওপর 'পাকুড়তলী' নামে একটি মহল্লা ছিল। ধারণা করা যায় যে, নাথন ধুলাই খালের মুখ থেকে দুর্গের অভ্যন্তরে ইসলাম খানের বাসগৃহের দিকে যাচ্ছিলেন। ওই স্থানে এখন আছে মিটফোর্ড হাসপাতাল ও মেডিকেল স্কুল... একথা ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে, মীর্জা নাথন যে বড় গাছের কথা উল্লেখ করেন সেই গাছের নাম থেকে 'মহল্লা পাকুড়তলী' নামের উৎপত্তি; ওই স্থানটি আসলে প্রাচীন দুর্গ ও ধুলাই খালের মুখের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

'ঢাকার সংযুক্ত মানচিত্র (মানচিত্র-১) থেকে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে, পাকুড়তলীর ঠিক পূর্বপাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদী থেকে একটা কৃত্রিম খাল শুরু হয়ে ধুলাই নদীতে মিলিত হয়েছে – এই ধুলাই নদী শহরকে মালিটোলা-তাঁতীবাজারের কোণায় দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। এই খাল নিঃসন্দেহে কৃত্রিম এবং ইসলাম খানই তা খনন করান বলে প্রতীয়মান হয়। নতুন বসতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাপত্তার জন্য ওই দুর্গপরিখা খনন করা হয়। শহরের ওই অংশ ছিল ওই দুর্গপরিখা দ্বারা বেষ্টিত – ধুলাই নদীর দু'টো শাখা ও বুড়িগঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় গড়ে ওঠে পুরনো শহর। তাঁতী ও শাঁখারী (যে ব্যক্তি শঙ্খ কাটে) জনগণ ঢাকার প্রাচীন বাসিন্দা বলে সর্বসম্মতভাবে বিশ্বাস করা হয় এবং তারা এখন ওই এলাকার কেন্দ্রস্থলে বসবাস করে। এ এলাকার আশপাশে আছে হিন্দু নাম ও হিন্দু নামের হস্তশিল্প এলাকা, যেমন লক্ষ্মীবাজার, বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, জালুয়ানগর, বানিয়ানগর, গোয়ালনগর, তাঁতীবাজার, শাঁখারীবাজার, সূত্রানগর, কামারনগর, পাটুয়াটুলি ও কুমারটুলি। অপরদিকে, প্রধান প্রধান প্রাচীন মোগল নির্দশনগুলো দেখা যায় খালের পশ্চিম দিকে অবস্থিত, যেমন প্রাচীন দুর্গ, লালবাগ দুর্গ, শায়েস্তা খানের প্রাসাদ, চকবাজারে তাঁর নির্মিত মসজিদ ও পাকুড়তলী মসজিদ, শাহ সুজার বড়কাটরা ও শায়েস্তা খানের ছোটকাটরা। এসব এলাকার অধিকাংশ নাম মুসলিম নামে পরিচিত। শহরের দু'টো 'মোগলটুলি' নামের অস্তিত্ব বেশ চমকপ্রদ সন্দেহ নেই। ধুলাই নদীর যে শাখার পূর্বাংশ শহরের যে স্থানে প্রবেশ করেছে সেই স্থানকে বলা হয় পুরনো, অর্থাৎ পুরনো মোগলটুলি। ঢাকা যখন মোগলদের শুধু একটা ঘাঁটি ছিল, তখন সম্ভবত তাঁরা এখানে বাস করতেন। ইসলাম খান যখন নতুন ঢাকার পত্তন করেন তখন মোগলরা এই এলাকায় তাঁদের বাসস্থান পরিবর্তন করেন এবং নতুন মোগলটুলি গড়ে তোলেন।'

হাকিম হাবীবুর রহমান বলেন, 'পাঠানদের ঢাকা (মোগল-পূর্ব যুগ) আসলে প্রসারিত ছিল মাসান্দি থেকে উত্তর দিকে পাণ্ডু নদী পর্যন্ত এবং পশ্চিম দিকে ফুলবাড়িয়া পেরিয়ে চাঁদনীঘাট পর্যন্ত। এর অভ্যন্তরীণ সীমানা ছিল – পূর্বদিকে ধুলাই নদী, দক্ষিণে ধুলাই নদীর শাখা, যা শ্রীচক ও চাঁদখান ব্রিজের নিচ দিয়ে এবং বখশীবাজার হয়ে বংশাল স্রোতধারায় মিশেছে এবং চাঁদনী ঘাটের পূর্বদিকে বুড়িগঙ্গায় গিয়ে পতিত হয়েছে। এটা পশ্চিম এলাকারও সীমানা।'[২৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. ঢাকা : মোগলদের প্রাদেশিক রাজধানী

(১৬০৮-১৬৩৯ এবং ১৬৬০-১৭১৭)

ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের যৌক্তিকতা ঢাকায় মোগলদের প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপনের পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। চার্লস স্টুয়ার্ট লেখেন – 'ইসলাম খানের কর্তৃত্বের প্রথম কাজ ছিল রাজমহল থেকে ঢাকায় সরকারের অফিস স্থানান্তর; ক্ষমতাসীন সম্রাটের নামানুসারে তিনি ঢাকার নতুন নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। তিনি এখানে একটি প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণ করেন। এর ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচ্যের ঐতিহাসিকগণ ইসলাম খানের রাজধানী স্থানান্তরের কোনো কারণ উল্লেখ না করলেও এশিয়ায় পর্তুগীজদের ইতিহাসে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।'[২৪] তৎকালীন পর্তুগীজ ও জলদস্যুদের ক্রমাগত আক্রমণ প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সম্ভবত এ কারণেই রাজধানী স্থানান্তরে ইসলাম খানকে উৎসাহিত করে এবং ঢাকায় তিনি তাঁর বাসস্থান নির্ধারণ করেন। আক্রমণকারীর মোকাবিলায় তিনি এখানে সবসময় সতর্ক থাকতেন; বিষয়টি সম্রাটের গোচরীভূত করা হলে তিনি তাঁকে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার বাহিনীর কমান্ডার পদে পদোন্নতি দেন।'[২৫] সমসাময়িক বিশেষজ্ঞ মীর্জা নাথন তাঁর 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী' পুস্তকে পর্তুগীজ জলদস্যুদের কথা প্রায় উপেক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর পুস্তকে বাংলার নিম্নাঞ্চলে ইসলাম খানের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য বাংলার জমিদার ও তাদের প্রবল প্রতিরোধের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। আবদুল লতিফের 'ডায়েরি', 'বাহারিস্তান' ও জাহাঙ্গীরের 'স্মৃতিকথা' পড়লে একথা অনুধাবন করতে কারো অসুবিধা হয় না যে, সর্বশেষ আফগান শাসনকর্তা উসমান ও বাংলার শক্তিশালী জমিদারদের সম্পূর্ণ পদানত করার জন্য ইসলাম খান রাজমহল ত্যাগ করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে বাংলার নিচু এলাকার দিকে অগ্রসর হন। অবশেষে ঢাকায় তিনি তাঁর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন। ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর তাঁর পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রয়োজনের তাগিদে তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

রাজধানী স্থাপনের তারিখ : ঢাকায় ইসলাম খান কর্তৃক রাজধানী স্থাপনের তারিখ ড. এস এন ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস।[২৬] তিনি বলেন, '১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের শেষদিকে কাছাড় রাজার আত্মসমর্পণের পর ইসলাম খানের অগ্রযাত্রার প্রক্রিয়া এবং বিজিত এলাকা সুদৃঢ় করার কাজ প্রায় শেষ হয়। এ সময় সিলেট ও কাছাড়সহ সমগ্র বাংলায় মোগল সরকারের কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। দু'বছর ধরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার পর ইসলাম খান সমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রদেশে সম্রাটের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং রাজমহলের পরিবর্তে ঢাকায় নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ক্ষমতাসীন সম্রাটের নামানুসারে ঢাকা শহরের নতুন নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর।'[২৭] কিন্তু নতুন রাজধানীর এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কথা 'বাহারিস্তান'-এ উল্লেখ করা হয়নি। বরং ইসলাম খানের ঢাকা আগমনের প্রথম দিন থেকেই মীর্জা নাথন ঢাকাকে জাহাঙ্গীরনগর হিসেবে উল্লেখ করেন। সুতরাং নতুন রাজধানী স্থাপনের তারিখ ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ নির্ধারণ ইচ্ছামাফিকভাবে করা হয়েছে, একথা বলার কোনো যুক্তি নেই। বাংলায় ইসলাম খানের আগমন প্রক্রিয়া ওই বছরে (১৬১২ খ্রিস্টাব্দ) শেষ হয়নি। আমরা দেখতে পাই, পরবর্তী বছরে তিনি কামরূপ জয়ের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেছেন। ইসলাম খান ঢাকায় আগমন করেন ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষদিকে। সে সময়েই নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার তারিখ নির্ধারণ করার কথা গ্রহণ করা যায়।[২৮]

রাজধানীর স্থিতিকাল : ঢাকায় রাজধানী ছিল ১৬০৮ থেকে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তবে ১৬৩৯ থেকে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মোগল প্রতিনিধি শাহজাদা শাহ সুজা ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক কারণে রাজমহলে তাঁর কর্মস্থল স্থানান্তরিত করেন। তবে ওই সময়ে প্রশাসনিক সব কাজ রাজধানী ঢাকা থেকেই নির্বাহ করা হয়। ঢাকা শহর প্রসারিত হওয়ার ধারা কখনো থেমে থাকেনি। আসলে মোগলদের আমলেই ঢাকা শহরের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে এবং এর উন্নয়ন ও সুশোভিতকরণের যাবতীয় কৃতিত্ব মোগল গভর্নরদের। ঢাকার সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকে ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, এ বছরেই শাহজাদা আজিম-উশ-শান ঢাকা ত্যাগ করেন। সরকারিভাবে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করা হয় ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে।

প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ঢাকা : মোগলদের সামান্য সামরিক ঘাঁটি ও তাদের 'থানাদার'-এর প্রধান কার্যালয় থেকে ঢাকা হয়ে ওঠে পূর্ব ভারতের শহরগুলোর রানী। প্রদেশের রাজধানী হিসেবেই শুধু ঢাকার গুরুত্ব ছিল না; ঢাকা হয়ে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র। পূর্বে ঢাকার নিকটবর্তী সোনারগাঁও শহর ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র। ইসলাম খানের সৈন্যরা ওই শহরকে প্রায় ধ্বংস করে দেয়। তাছাড়া, মেঘনা নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ায় ওই শহরের গুরুত্বও কমে যায়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে সোনারগাঁও-এর সমৃদ্ধির কথা জানা যায় চীনা পর্যটকদের এবং ইবনে বতুতার বর্ণনায়।[২৯] ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ঢাকা একই রকম সমৃদ্ধি অর্জন করে। বাংলার সব ধরনের পণ্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে ঢাকা। বিদেশী ব্যবসায়ীরা ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় তাদের বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক পরিবর্তন : ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা কর্মচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীও পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যায়। আগে শহরের মূল লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল প্রধানত হিন্দু আচার-আচরণকেন্দ্রিক এবং তাদের চিন্তাধারা ও জীবনদর্শন ছিল দেশীয় ভাবধারায় প্রভাবিত। কিন্তু মোগল সৈন্যবাহিনী ও তাদের অনুসরণকারী শিবিরের লোকদের আকস্মিক আগমনে শহরের দৃশ্যপট পাল্টে যায়। মোগলরা ছিল মূলত পারস্যের ঐতিহ্য ও আচার-আচরণের অনুসারী। ঢাকার পুরনো শহরের ঐতিহ্যগত রীতিনীতি ও সংকীর্ণ গলি রাস্তা তারা পছন্দ করলো না। ইসলাম খান প্রথমেই একটা নতুন শহরের গোড়াপত্তন করলেন। নতুন শহরে তিনি মোগল দুর্গ দৃঢ় করলেন। নিজের বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন এবং একটা প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করলেন যা এখনো ইসলামপুর রোড নামে পরিচিত। তিনি তাঁর লোকদের বসবাসের জন্য কোয়ার্টার বরাদ্দ দেন এবং একাধিক মসজিদ তৈরি করে শহরকে সুশোভিত করেন। এ ধরনের একটা মসজিদ তাঁর নামেই করা হয়। ওই মসজিদকে বলা হয় 'ইসলাম খান কি মসজিদ'।[৩১] মোগলরা ফার্সি ভাষা ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে; পুরুষদের জন্য ইরানি জামা, কাবা (Qaba), সোনালী সাশ (Sash) ও পাগড়ি এবং মেয়েদের জন্য ঘাগড়া, ব্লাউজ ও ওড়না পোশাক চালু করেন। দরবার ও সরকারি অফিসে ওই পোশাক পরিধান করার জন্য তাঁরা সবাইকে উৎসাহিত করেন। এসব পরিবর্তন স্থানীয় হিন্দু লোকদের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। তবে মোগলদের সহিষ্ণু মনোভাবের কারণে তারা তাদের অনুরক্ত হয়ে পড়ে। সময়ের পরিবর্তনে ঢাকায় হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর লোকের উত্থান ঘটে – তাদের মধ্যে সাধারণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যা মোগল ঐতিহ্যের ধারক। সাধারণ ঐক্যের এ প্রভাব সারা বাংলার জনগণকে প্রভাবিত করে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় এটা মোগলদের দান, এর সাথে যুক্ত হয় বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি। সব মিলিয়ে বাংলায় নবজীবনের সূচনা হয়। ধারাবাহিক এ পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। এ সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলো।

শহরের বিস্তৃতি মোগলদের নতুন শহর শুরু হয় 'পাকুড়তলী' অর্থাৎ বাবুবাজার (ভুকাইলাশ-এর জমিদার বাবুদের দ্বারা বাজার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা ওই নামে অভিহিত হয়)[৩২] থেকে এবং তা বুড়িগঙ্গার তীর বরাবর পশ্চিম দিকে মনেশ্বর ও মিরপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। শহরের বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করে চার্লস ডি'ওলি বলেন, 'ঢাকা যখন সরকারের প্রধান কেন্দ্র ও তা জাঁকজমকে পূর্ণ ছিল তখন এর শহরতলীসহ মূল শহরের সীমানা দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা থেকে উত্তরে টঙ্গী পর্যন্ত (প্রায় ১৫ মাইল) এবং পশ্চিমে জাফরাবাদ থেকে পূর্বে পোস্তাগোলা পর্যন্ত (প্রায় ১০ মাইল) বিস্তৃত ছিল।'[৩৩] ঢাকা শহরের এ বিস্তৃতি ঘটে ধীরে ধীরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের প্রতিরক্ষা : একাধিক দুর্গের মাধ্যমে শহরটি ছিল সুন্দরভাবে সুরক্ষিত। এসব দুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা। পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের ভীতিকর কার্যকলাপ সম্পর্কে শিহাবুদ্দীন তালিশের বিবরণ থেকে অনেক কিছু জানা যায়। তিনি বলেন, 'জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে জলদস্যুরা লোক অপহরণ ও লুণ্ঠনের জন্য ঢাকায় আসতো – ব্রহ্মপুত্র থেকে যে নালাটি খিজিরপুর অতিক্রম করে ঢাকায় এসে মিলিত হয়, সেই নালা দিয়েই তারা ঢাকায় আসতো। খিজিরপুরের অবস্থান ছিল ব্রহ্মপুত্রের তীরে – উভয়ের মাঝে একটা বাঁধ ছিল। বর্ষা মৌসুমে বাড়িঘরের এলাকা ছাড়া সব এলাকা পানিতে ডুবে যেতো। সাধারণত শীতকালে দলদস্যুরা ঢাকায় আসতো। সে কারণে ঢাকার গভর্নরগণ বর্ষাকালের পরে এবং শীতকালে সৈন্যবাহিনী নিয়ে খিজিরপুর যেতেন এবং সেখানে ঘাঁটি তৈরি করে থাকতেন। কয়েক বছর পর ওই নালা শুকিয়ে যায় এবং ব্রহ্মপুত্রের নদীপথের কয়েকটি স্থান জলদস্যুদের আগমনের জন্য বাধাস্বরূপ হয়ে পড়ে। ফলে নদীপথে তাদের ঢাকায় আসার পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং যাত্রাপুর ও বিক্রমপুরে তাদের যাতায়াতের পথও সীমিত হয়ে পড়ে। সম্প্রতি ঢাকার বিভিন্ন গ্রাম ও অন্যান্য পরগনা থেকে জলদস্যুদের প্রধান লক্ষ্য লোক অপহরণের কাজ সহজ হলেও তারা ঢাকা শহরে আসার সাহস পেতো না।'[৩৪] আসলে, জলদস্যুদের আগমন প্রতিহত করতে ঢাকায় মিলিত বিভিন্ন জলপথের সংযোগ স্থলে দুর্গ নির্মাণ করা হয়। এর একটা হলো, ঢাকার পুরাতন দুর্গ - এর পাশেই গড়ে ওঠে আধুনিক জেলখানা। এই দুর্গ কখন এবং কে তৈরি করেন?

পাহারা দেয়ার ঘর বা চৌকি হিসেবে এ এলাকায় বহু দুর্গ গড়ে ওঠে; পরবর্তীকালে মীর জুমলার সময় অনেক দুর্গ গড়ে তোলা হয়। ডেমরার উজানে নদীপথের পাশে বেগ মুরাদের দু'টি দুর্গের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফতুল্লায় নদীর দু'পাশে দু'টি দুর্গের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় রেনেলের মানচিত্রে। নদীর পূর্বদিকের দুর্গকে বলা হয় ধোপাকিল্লা, আর পশ্চিম দিকের দুর্গ নাম ছাড়াই উল্লেখ করা হয়। ধুলাই ও লক্ষ্যা নদীর মুখে নির্মিত দুর্গের নাম খিজিরপুর দুর্গ। লক্ষ্যা নদীর প্রায় এক মাইল ভাটিতে পূর্বপাশের দুর্গের নাম সোনাকান্দা দুর্গ। দুর্গটি এখনো সুন্দরভাবে সুরক্ষিত আছে। এ স্থান থেকে সরাসরি দক্ষিণ দিকে ইছামতী নদীর দক্ষিণ পাশে (ইছামতী তখন ধলেশ্বরীর সাথে বিলীন হয়ে গেছে) ছিল ইদ্রাকপুর দুর্গ। এটা এখন মুন্সীগঞ্জ শহরে। ওইসব দুর্গ কেমন ছিল তা সোনাকান্দা দুর্গ দেখে অনুমান করা যায়।[৩৫] মীর্জা নাথন এই এলাকায় একটা প্রাচীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের কথা উল্লেখ করেন। ওই দুর্গটি তৈরি করেন একজন মগ রাজা। পরে মুসা খান তা সংস্কার করেন এবং মোগলদের সাথে যুদ্ধের সময় এ দুর্গকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসেবে ব্যবহার করেন।[৩৬] সোনাকান্দায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে দুর্গটি এখনো দেখতে পাওয়া যায় তা ঠিক এই রকম দেখতে।[৩৭] নারায়ণগঞ্জের স্টিমার ঘাট ও রেলস্টেশনের ঠিক প্রায় উল্টোদিকে ওই দুর্গের অবস্থান। ঢাকার দুর্গটি মনে হয় প্রথমে মোগলদের নিরাপত্তা চৌকি ছিল; ইসলাম খানের ঢাকা আগমনের আগে ওই নিরাপত্তা চৌকির অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা হয়। বিভিন্ন দুর্গের কথা বলতে গিয়ে মীর্জা নাথন মন্তব্য করেন, 'গৌড়, আকবরনগর (অর্থাৎ রাজমহল), ঘোড়াঘাট, ঢাকা এবং আরো কয়েকটি স্থান ছাড়া বাংলায় এ ধরনের প্রাচীন কোনো দুর্গ ছিল না। কিন্তু প্রয়োজনের সময় নৌকার মাঝিরা অতিদ্রুত এমন দুর্গ তৈরি করতে পারতো যা বিশেষজ্ঞদের তৈরি করতে কয়েক মাস বা বছর লেগে যেতো।'[৩৮] মোগল সৈন্যবাহিনীর ঢাকা আসার আগেই এ মন্তব্য করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় – ইসলাম খানের ঢাকা আগমনের আগেই এখানে একটা দুর্গ ছিল।

ঢাকায় দুর্গ নির্মাণ ঢাকা আগমনের পূর্বেই ইসলাম খান কয়েকজন অধঃস্তন মনসবদারসহ তাঁর দু'জন কর্মকর্তাকে ঢাকায় প্রেরণ করেন। মীর্জা নাথন বলেন যে, তাঁরা 'ঢাকায় দুর্গ নির্মাণের কাজে নিয়োজিত হন'।[৩৯] এ বক্তব্য সম্পর্কে ড. এন কে ভট্টাশালী ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ইসলাম খানের আগমনের পূর্বে ঢাকায় দুর্গ ছিল এবং মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে তাঁর কর্মকর্তাদের পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব ছিল তা হলো – ওই দুর্গকে সুন্দরভাবে সংস্কার করা এবং গভর্নরকে অভ্যর্থনার উপযুক্ত করে তোলা।'[৪০] একথা যদি সত্য হয় তাহলে 'ঢাকায় ইসলাম খান দুর্গ নির্মাণ করেন', সাধারণ এই ধারণার সংশোধন করতে হয়। ঢাকার তৃতীয় মোগল গভর্নর ইব্রাহীম খান ফতেহ জঙ্গ সম্পর্কেও একই রকম ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। বলা হয়, তিনি ঢাকা দুর্গ পুনর্নির্মাণ[৪১] এবং জিঞ্জিরা প্রাসাদ[৪২] (জাজিরা উপদ্বীপ) নির্মাণ করেন। সমসাময়িক ইতিহাস বাহারিস্তান-এ ওই নির্মাণ কাজ ইব্রাহীম খান করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়নি। তবে একথা বলা যায়, ইব্রাহীম খান ঢাকার পুরনো দুর্গের অভ্যন্তরে তাঁর আবাসিক প্রাসাদ নির্মাণ করেন। বিদ্রোহী শাহজাদা খুররম-এর (পরে শাজাহান নামে পরিচিত) ঢাকা আগমন প্রসঙ্গে মীর্জা নাথন ওই প্রাসাদ সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইব্রাহীম খানকে পরাজিত ও নিহত করে শাহজাদা খুররম নিজেই বাংলা অধিকার করেন।

ঢাকায় শাহজাহান : ঢাকায় শাহজাদা খুররমের আগমন (মে, ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দ) একটি স্মরণীয় ঘটনা। মীর্জা নাথন লেখেন, 'আকবরনগর তথা রাজমহল থেকে যাত্রার পর ষষ্ঠ দিনে ইউসুফ শাহী তথা শাহজাদপুরে (পাবনা জেলা) রাজকীয় শিবির স্থাপন করা হয়। এখান থেকে চতুর্থ দিনে অর্থাৎ আকবরনগর থেকে যাত্রার নয় দিন পর শাহজাদা নিরাপদে এবং আনন্দচিত্তে জাহাঙ্গীরনগরে পৌঁছান। খোজা ই'তিমাদ খান আগেই জাহাঙ্গীরনগরে পৌঁছান এবং উচ্চ ও নিম্নপদস্থ সব কর্মকর্তাদের সমবেত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতঃপর তাঁরা পদানুসারে এক থেকে দুই ক্রোশ ব্যবধানে শাহজাদাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সমবেত হন এবং শাহজাদার কাছ থেকে সম্মানসূচক উপহার লাভ করেন। প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ পদানুযায়ী রাজকীয় পোশাক, ঘোড়া, শাল এবং অন্যান্য সামগ্রী উপহার হিসেবে লাভ করেন। মৃত ইব্রাহীম খানের স্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সব সদস্য মাথা অবনত করে মাটি চুম্বন করে নিজেদের ধন্য করেন। সাহসিকতা ও মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও সমগ্র হিন্দুস্তানের প্রদীপ, বিজয়ী শাহজাদার গমন পথেরা উড়ন্ত ধুলা তাঁর (মৃত ইব্রাহীম খানের স্ত্রী) চোখের সুরমা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং শাহজাদাকে তিনি আতিথেয়তা প্রদান করেন। সম্মানীয় শাহজাদা ইব্রাহীম খানের আরামদায়ক বাসভবনে (জাহাঙ্গীরনগর তথা ঢাকার দুর্গের অভ্যন্তরে) সাত দিন অবস্থান করেন এবং অতঃপর বাংলা ও কুচ (Kuch)-এর সব থানায় সন্তোষজনক ব্যবস্থা কায়েম করে পাটনা জয়ের জন্য যাত্রা করেন।'[৪৩]

তৎকালীন ঢাকার বিস্তৃতি : ওই সময় পর্যন্ত শহরের বিস্তৃতি পুরনো ঢাকার বাইরে খুব বেশি একটা হয়েছে বলে মনে হয় না। নতুন বিস্তৃতির ক্ষেত্রে পুরাতন দুর্গ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দুর্গে প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য দুটি পথ ছিল – একটা পূর্ব দরজা, অন্যটা পশ্চিম দরজা। ওই এলাকাকে এখনো ওই নামেই অভিহিত করা হয়। ওই দুর্গকে ঘিরে গড়ে ওঠে বাদশাহী বাজার (এখন চকবাজার), পিলখানা, মাহুতটুলী (মাহুতদের কোয়ার্টার) এবং আরো অনেক এলাকা যা এখনো ওইসব নামেই পরিচিত। বকশীবাজার ও দেওয়ান বাজারের পুরো এলাকা ছিল প্রাদেশিক মন্ত্রী, দেওয়ান ও সচিবদের আবাসিক এলাকা।[৪৪] এ সময় রমনা এলাকায় দু'টো স্থান গড়ে ওঠে – একটার নাম মহল্লা সুজাতপুর এবং অন্যটির নাম মহল্লা চিস্তিয়া। এ এলাকায় আমরা দুই বা তিন তলাবিশিষ্ট অট্টালিকা, বাংলো ও অভ্যর্থনার জন্য প্রশস্ত হলঘরের অস্তিত্বের কথা শুনেছি। জাহাঙ্গীরনগরে আমরা বাগ-ই-বাদশাহী (শাহী উদ্যান)-এর কথা পড়েছি; এখানে ইসলাম খানকে প্রথম কবর দেয়া হয়।'[৪৫] এই উদ্যান সাধারণভাবে আধুনিক হাইকোর্ট বিল্ডিং এলাকায় অবস্থিত।[৪৬]

ঢাকায় ইরানি দূতাবাস : ঢাকার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে সমসাময়িক কিছু ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়। মীর্জা নাথন লেখেন, বিশ্ব নিয়ে চিন্তাশীল সম্রাটের মনে এই চিন্তার উদ্রেক হয় যে, তিনি ইরানের শাহ-এর দূতাবাসের বিভিন্ন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে বাংলায় প্রেরণ করবেন। তারা ওইসব এলাকায় নতুন বিজয় সম্পর্কে অবগত হয়ে পুনরায় শাহ-এর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় শাহ-এর দূত ইয়াদগার আলী সুলতানের এক ভাইকে বাংলায় প্রেরণ করা হয়। বাংলার খাজাঞ্চী মীর্জা কাশিম দূতের ওই ভাইকে রাজকীয় দরবার থেকে বাংলায় সাথে করে নিয়ে আসেন। মীর্জা কাশিম বাদশাহী ফরমান ও উপঢৌকন নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসেন, সে কারণে ইসলাম খান অগ্রবর্তী হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রথমে তিনি বাদশাহী ফরমান এবং পরে বাদশাহের প্রদত্ত পোশাক শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন।

অতঃপর তিনি দূতের ভাইকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁকে সাথে করে নিজ বাসভবনে আসেন। তাঁর সম্মানার্থে ঘোড়সওয়ার বাহিনী মোতায়েন করা হয়। রাজদূতের ভাইকে দেখার জন্য রাস্তায় সব শ্রেণীর লোক জড়ো হয়। এতো লোক সমবেত হয় যে, কোনো স্থানই আর খালি ছিল না। তাঁকে দেখার জন্য আগত লোকদের মধ্যে ধাক্কা-ধাক্কি শুরু হয় এবং বেশ উত্তেজনা দেখা দেয়। যাহোক, প্রাসাদে পৌঁছার পর ইসলাম খান একটা রাজকীয় অভ্যর্থনার আয়োজন করেন এবং ওই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, পানীয় ও ফল পরিবেশন করা হয়। ভোজসভা সমাপ্তির পর গোলাপী আতর ছিটানো হয়। সুবাদারের গৃহে ভোজসভার পর ১২টি পাত্রে করে ১২ হাজার টাকা উপঢৌকন হিসেবে রাষ্ট্রদূতের ভাইকে দেয়া হয়; অতঃপর ইসলাম খান বিশ্রামের জন্য চলে যান।'[৪৭]

ইসলাম খানের জাঁকজমক : ইসলাম খান কিভাবে রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন তার বিবরণ পাওয়া যায় অন্য একস্থানে। 'ভাটির জমিদার ও বোকাইনগরের উসমান এবং তারাফ ও মাতঙ্গ-এর বিরুদ্ধে সফলভাবে যুদ্ধ ও আক্রমণ পরিচালনার পর ইসলাম খান একটা সামরিক পর্যালোচনামূলক বৈঠক করেন। তিনি দু'মানুষ সমান উঁচু একটা মঞ্চ তৈরি করেন এবং ওই মঞ্চের ওপর একটা ছোট ঘর নির্মাণ করেন। এর নাম দেয়া হয় 'ঝরোকা'। যেসব বড় বড় কর্মকর্তা 'চৌকি' বা ঘাঁটিতে এসে সম্মান প্রদর্শন করতে পারেনি তাদেরকে নিজ নিজ পুত্র অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে পাঠানোর কথা বলা হয়। রাজকীয় নিরাপত্তায় গৃহে তাদেরকে রাত অতিবাহিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। অন্যান্য কর্মকর্তাদের পতাকার কাছে দাঁড়িয়ে তাদের আনুগত্য ঘোষণার নির্দেশ দেয়া হয়।'[৪৮] অন্য একস্থানে ইসলাম খানের 'সভাসদ ও গায়ক-গায়িকাদে'র সম্পর্কে জানা যায়।[৪৯] এসব গায়ক-গায়িকা এমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, তাদের মধ্যকার উত্তম গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর দরবারের সঙ্গীতজ্ঞ প্রেমরঙ্গাকে বাংলায় প্রেরণ করেন। অন্য এক সূত্র থেকে আমরা ইসলাম খান সম্পর্কে জানতে পারি, 'তাঁর নৈতিক উৎকর্ষতা ও গুরুত্ব এমন ছিল যে, সম্ভবত তিনি সারাজীবনে পানাসক্ত হননি বা নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হননি। তবু সারা প্রদেশে লুতি, হারকানি, কাঞ্চি (মহিলা নৃত্যশিল্পী) ও ডমনি (বেদে) শ্রেণীর পেশাজীবী লোক তাঁর কর্মচারী ছিল এবং তারা তাঁর কাছ থেকে মাসে ৮০ হাজার এবং বছরে ৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা লাভ করতো। লোকেরা মণি-মুক্তার অলঙ্কার ও রেশমি কাপড়ের পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং তিনি উপঢৌকন হিসেবে তা লোকদের মাঝে বিতরণ করতেন। তাঁর পোশাক ছিল সাধারণ, পাগড়ির নিচে তিনি আঁটসাঁট টুপি পরতেন; তিনি তাঁর শাহী পোশাকের নিচে একটা জামা পরিধান করতেন। তাঁর খাওয়ার টেবিলে রাখা খাদ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে ১ হাজার গরিব লোকের জন্য যথেষ্ট খাদ্য দেয়া হতো। তবে প্রথমেই তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হতো জোয়ার ও ভুট্টার রুটি, সবজি (শাক) ও 'সাঁথি' নামে পরিচিত শুকনা ভাত'।[৫০]

মীর্জা নাথনের উৎসব অনুষ্ঠান : মীর্জা নাথনের একদল গায়ক-গায়িকা (কলাওনত্) ছিল – এদের মধ্যে প্রধান ছিল শাহ ইনায়েত ও মারুফ।[৫১] মীর্জা নাথন তাঁর মৃত পিতার স্মরণে ছয় মাস পরপর ভোজসভার আয়োজন করতেন। তিনি লেখেন যে, ওই ভোজসভায় 'খান পদবিধারী সবাই যোগদান করতেন... এটা ছিল একটা বড় ধরনের ভোজসভা এবং এতে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার, পানীয় ও ফল পরিবেশন করা হতো। কুরআন তেলোয়াতকারী প্রত্যেককে একজোড়া মূল্যবান শাল দেয়া হতো এবং রাজকীয় রীতিতে গোলাপ-আতর ছিটানো হতো'।[৫২] তিনি আরো লেখেন, 'এবার তাঁর মনে একটা বড় ধরনের ভোজসভা করার ইচ্ছা জাগে এবং তিনি শোক অনুষ্ঠানকে আনন্দ অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে চান। এ কারণে তিনি সুবাদার, দেওয়ান, বখশী, কাজী ও মীর আদলসহ গুরুত্বপূর্ণ সব কর্মকর্তাকে নিমন্ত্রণ করেন। খান পদবিধারী সবাই মীর্জা নাথনের গৃহে আসেন। ওইদিন ছিল শুক্রবার। ইসলাম খান জুমার নামাজ পড়ার জন্য উপস্থিত হন। তিনি নির্দেশ দেন, যেসব কর্মকর্তা নামাজে অনুপস্থিত থাকবেন তাদের জরিমানা করা হবে'। আরো জানা যায় যে, ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা অত্যধিক পানাসক্ত হয়ে পড়েন। ইসলাম খান এসময় সরকারি কাজে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন 'মীর্জার কর্মচারীরা তাদের পোশাকে গোলাপ পানি ও কমলালেবু, ফুলের সৌরভ এবং বাতাসে অম্বর আতর ছিটিয়ে দেয়; ফলে মদের গন্ধে ভরপুর কামরা বেহেশতী সৌরভে পূর্ণ হয়ে যায়... বড় রকমের এ ভোজসভা সাত দিন সাত রাত ধরে চলে'।[৫৩]

অর্থনৈতিক অবস্থা : জরুরি ভিত্তিতে নৌকা সংগ্রহ এবং এ কাজ সম্পাদনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা থেকে সে সময়কার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। 'মীজা সাহেব তাঁর বাসভবনে ফেরার পর এ কাজ সম্পাদনের জন্য তিনি তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে নিয়োগ করেন। জাহাঙ্গীরনগরের শাহজাদা-বণিকরা তাঁর সাথে ব্যবসা করতে আগ্রহী ছিলেন – তাঁরা তাঁকে ঋণচুক্তির দলিল (তামাস-সুকাত) সম্পাদনের মাধ্যমে এক লাখ টাকা অগ্রিম প্রদান করেন। তাঁর কর্মকর্তারা বেপারীদের কাছ থেকে নৌকা নিয়ে আসে। যারা ভাড়ায় নৌকা দিতে রাজি হয় তারা নৌকার সাথে মাঝি দেয় এবং ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার নিশ্চয়তা দেয়। ভাড়ার হার নির্ধারণ করা হয় এবং সেই অনুযায়ী তাদের অর্থ দিয়ে দেয়া হয়। যারা নৌকা বেচতে চায় তাদেরকেও নৌকার দাম দিয়ে দেয়া হয়। সাতশ' মাঝিকে নিয়োগ করা হয় এবং তাদেরকে দু'মাসের অগ্রিম বেতন দেয়া হয়'।[৫৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকায় প্রথম খ্রিস্টান মিশন ঢাকায় মোগল শাসনের প্রথম দিকে অগাস্টিনিয়ানরা এখানে তাদের মিশন চালু করে। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাদের ৫ জন বাংলায় আসেন; ফাদার বার্নার্ড ডি জেসাসকে বাংলার ভিকার-জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার শ্রীপুর, হুগলি ও পিপিলীতে তাদের সরকারি মিশনারি কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[৫৫]

ঢাকায় একটি মগ আক্রমণের বিবরণ : মানরিক (Manrique) ঢাকায় আসেন ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় একটি মগ আক্রমণের বিবরণ দেন। তিনি বলেন, 'মগ রাজা জান্ড্রাম্যাক্স (Xandramax) সত্তরটি গোলিওটাস (Goleotas) ও পাঁচশ' গেলিয়াস (Gelias) নৌবহরসহ মোগল সমুদ্র উপকূলে আক্রমণ পরিচালনা করেন – রাজার অধীনে চাকরিরত ত্রিশ জন পর্তুগীজ ও খ্রিস্টানরাও ওই অভিযানে অংশগ্রহণ করে। বড় এবং প্রসিদ্ধ শহর ঢাকায় পৌঁছার পর তারা লোক বহনকারী নৌযানগুলো মোতায়েন করে। সমুদ্র উপকূলে নিরাপত্তা রাখার কাজে নিয়োজিত মোগলরা ধারণা করে যে, পর্তুগীজদের শক্তিশালী বাহিনী অভিযানে মোতায়েন আছে। ফলে তারা হতাশ হয়ে স্থান ত্যাগ করে এবং তিন হাজার ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সাথে যোগ দেয়; এসময় নবাব সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। শত্রুবাহিনীর অবতরণে তারা প্রায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি; অথচ তারা দাবি করতো যে, তারা শহরের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম। পর্তুগীজ গেলিয়াদের (Gelias) প্রথম আক্রমণের সময় তাদের নৌবহর এমন ভীরুতার পরিচয় দেয় যে, তারা পশ্চাদপসারণ করে এবং তাদের কয়েকটি নৌযান আক্রমণকারী বাহিনী দখল করে নেয়। অবতরণ করার পরপর বন্দুকধারী সৈন্যের গোলায় মোগলরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে এবং তারা পশ্চাদপসারণ করে। এক ঘণ্টার মধ্যে তারা সবাই ওই স্থান থেকে পলায়ন করে। অবশেষে মগ রাজা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই অবতরণ করে এবং নবাবের প্রাসাদ ও ব্যবসায়ীদের বাড়ি দখল করে – সেখানে সে প্রভূত সম্পদ লাভ করে। কিন্তু সে আসল সম্পদের সন্ধান পায় না – ওই সম্পদ হলো সম্রাটের ট্রেজারী বা ধনাগার। কারণ, তার অবতরণের সংবাদ পাওয়ার পরপরই মোগলরা ওই ধনরত্ন দেশের অভ্যন্তরে সরিয়ে নেয়। ফলে মগ রাজা যতোটা আশা করেছিল ততোটা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ...মগ রাজা তিন দিন অবস্থান করে শহরে লুণ্ঠন চালায় এবং হতভাগ্য বাসিন্দাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়। শহরের বিভিন্ন এলাকায় অগ্নিসংযোগ করা হয়; নবাবের প্রাসাদ ধ্বংস করা হয় এবং তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। কারণ রাজা সংবাদ পায় যে, বিরাট এক অশ্বারোহী বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে...। অতঃপর মগ রাজা তার নৌযানে উপস্থিত হয়। মোগল নৌবাহিনীর দুর্বলতার কারণে মগবাহিনী অনায়াসে শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের বিরাট এক অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে মগ রাজা শহর ত্যাগ করে।'[৫৬] এই ধ্বংসযজ্ঞের পর শহরকে অতিদ্রুত গড়ে তোলা হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ ও প্রাসাদ পুনর্গঠন করেন বাংলার গভর্নর ইসলাম খান মাশহাদী,[৫৭] তিনি ১৬৩৫ থেকে ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গভর্নর ছিলেন।

শাহ সুজার শাসনামলে ঢাকা : শহরে উন্নয়নের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয় শাহজাদা শাহ সুজার আমলে। তিনি বাংলার গভর্নর ছিলেন ১৬৩৯ থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (১৬৪৭ থেকে ১৬৪৮ এবং ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দ ব্যতীত)। তিনি নিজে বসবাস করতেন বিহারের নিকটবর্তী সীমান্ত এলাকা রাজমহলে এবং তাঁর ডেপুটি মীর আবুল কাশিম ঢাকা থেকে বাংলার নিম্নাঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

মানরিক-এর বিবরণ অনুযায়ী ঢাকা শহরের বিস্তৃতি : মানরিক ঢাকায় আসেন ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ঢাকার বর্ণনা দেন – 'এটা হলো বাঙ্গালার প্রধান শহর এবং প্রধান নবাব বা ভাইসরয়ের মূল কর্মস্থল – নবাব বা ভাইসরয় নিয়োগ করেন সম্রাট। সম্রাট তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে একাধিকবার নিয়োগ করেন তাঁর একেকজন পুত্রকে। আমি আগেই বলেছি, এ শহর বর্তমানে প্রধান শহর এবং বাঙ্গালার রাজধানী শহর। প্রসিদ্ধ ও প্রয়োজনীয় গঙ্গা নদীর (প্রকৃতপক্ষে বুড়িগঙ্গা নদী) প্রশস্ত ও সুন্দর অববাহিকায় এ শহরের অবস্থান; তদুপরি এ শহর দেড় লীগের বেশি (এক লীগ সমান প্রায় সাড়ে তিন মাইল) প্রসারিত। শহরের এক অংশে অতি পরিচিত মনেশ্বর এবং অন্য অংশে নারিন্দা ও ফুলবাড়িয়া; শহরটি তাই সুন্দর ও গোলাকার। শহরতলীতে বসবাস করে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোক – এখানেই আছে একটা ছোট অথচ সুন্দর মঠ ও গীর্জা। প্রকৃতি পূজার ব্যাপকতার মাঝে এখানেই স্বর্গীয় আরাধনার উৎসব হয় এবং ওই উৎসবের মধ্যদিয়ে শিক্ষা দেয়া হয় আত্মার মুক্তির সত্যিকার পথ।'

মানরিকের বর্ণনায় বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি : তিনি আরো লেখেন, 'ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন ধরনের পণ্যের সরবরাহের কারণে অনেক বিদেশী এই শহরে ভিড় জমায় – ওইসব পণ্য এ অঞ্চলের উর্বর ভূমিতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয়। ফলে শহরটি সমৃদ্ধির শহরে উন্নীত হয়েছে। ব্যবসায়ীদের বাড়িতে অর্থ-সম্পদ এমন বেশি পরিমাণ জমে থাকে যে, তা গণনা করা কষ্টকর। সাধারণত তা ওজন করা হয়; জমাকৃত এসব অর্থ-সম্পদ দেখে অনেকেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। আমাকে জানানো হয় যে, গঙ্গার (আসলে বুড়িগঙ্গা) ধারের এ শহর ও শহরতলীর জনসংখ্যা দু'লাখের বেশি। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত লোকের সংখ্যাও এর অন্তর্ভুক্ত (বাইরে থেকে অনেক লোক আসে)। অনেকে আসে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে। এ স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। অনেকে আসে কাজের বিনিময়ে অধিক মাসিক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহিনা পাওয়ার প্রত্যাশায়। মানুষ যেসব পণ্যের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সেসব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পর্যাপ্ততা দেখে বিস্মিত হতে হয় – অসংখ্য বাজারে এসব জিনিস পাওয়া যায়। বিভিন্ন রকম গৃহপালিত ও বন্য পাখির পর্যাপ্ততা দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম – এসব জীবন্ত পাখি বিক্রি হতো সস্তায়, একেবারে কম দামে। এক রৌপ্য মুদ্রার কমে (৪ আনা) যে কেউ কুড়িটা ঘুঘু বা পনেরটা বড় বন্য কবুতর কিনতে পারতো – অন্যান্য পণ্যও প্রায় একই দামে কিনতে পাওয়া যেতো। এ শহর থেকে সম্রাট ও মোগল শাসনকর্তারা যে পরিমাণ আর্থিক সুবিধা পান তা অবিশ্বাস্য। সুতরাং একথা বলেই আমি শেষ করতে চাই যে, আমাকে যা বলা হয় তাতে কোনো বিতর্ক নেই – আমাকে বলা হয়, শুধু পান থেকেই তারা প্রতিদিন ৪ হাজার টাকা (অর্থাৎ আমাদের মুদ্রায় ২ হাজার পেসো) খাজনা পায়। এ শহরের বস্তুগত সম্পদের পাশাপাশি সংযুক্ত হয় বাকলা (বাকেরগঞ্জ জেলা), সলিমানবাস (বাকেরগঞ্জের পশ্চিমে সুলাইমানাবাদ) ও কাতরাবো (মানিকগঞ্জ মহকুমায়) এলাকার উর্বর ভূমি।'

শহরে খ্রিস্টধর্মের অবস্থা : মানরিক আরো লেখেন – 'পূর্বে খ্রিস্টানরা রেসিডেন্ট মিশনের পাশে নতুন একটা গীর্জা তৈরি করে, পরে সিরিপুর (শ্রীপুর) ও নরিকুল (লরিকল)-এ আরো দুটো গীর্জা নির্মাণ করা হয়। এখানে তারা বেশ নির্যাতিত হয়, যীশুখ্রিস্টের বাণী প্রচারে তারা বিশেষভাবে মুসলমান মোল্লাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। মুসলমান মোল্লারা হলো কুরআনের ব্যাখ্যাকারী এবং তারা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য গলা কেটে পশু জবাই করে। ফলে যে এলাকায় একজন মোল্লা আছে সেই এলাকায় সাধারণ মানুষের নিজ হাতে পশু জবাই করার প্রয়োজন ছিল না।

'এসব লোকদের সাথে, আমি মনে করি, কিছু দরবেশের যোগ-সাজস আছে; দরবেশরা জগতের প্রাত্যহিক কাজ থেকে মুক্ত থাকে এবং তারা 'পীর' হিসেবে সম্মানিত। ওই সব 'পীর' নবাবের জ্যেষ্ঠ স্ত্রীর সাথে ষড়যন্ত্র করে নবাবের ভাইদের ওপর নির্যাতন চালায় এবং অতঃপর তাদের বিতাড়িত করে। এ বিষয়ে সাধারণ জনগণের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য তারা বলে যে, জনগণ যদি এসব কাফেরদের আশ্রয় দেয় তাহলে আল্লাহ তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন... সুতরাং তাদের তাড়িয়ে দেয়া উচিত এবং তাদের মিথ্যা কথা না শোনাই উত্তম। তাদের এ ষড়যন্ত্র হয়তো সফল হতো যদি নবাবের ভাইয়েরা সম্রাটের এবং নবাবের সমর্থন না পেতো। আল্লাহ তাঁর পবিত্র ধর্ম প্রচারে সহায়তার জন্য এ ঘটনা ঘটার অনুমতি দেন।

'সম্রাট আকবর এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর (সাধারণ লোক তাঁকে এ নামেই অভিহিত করতো) খ্রিস্টানদের প্রতিপালনের জন্য একাধিকবার জমি বা মাসিক মাহিনা দেয়ার উদ্যোগ নেন; সরকারি তহবিল বা রাজকোষ থেকে তাদের মাসিক মাহিনা প্রদান করা হয়।'[৭৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশী বাণিজ্য : মানরিক লেখেন – 'বাণিজ্যের বিস্তৃতি এমন ব্যাপক ছিল যে বেঙ্গলা বন্দর থেকে প্রতিবছর একশ'র বেশি জাহাজ বা বড় নৌকায় চাল, চিনি, তেল, তৈলাক্ত জিনিস, মোম ও এ ধরনের পণ্য বোঝাই করা হতো। অধিকাংশ কাপড় ছিল সুতার তৈরি এবং এমন সূক্ষ্ম ও কারিগরী নিপুণতায় তা তৈরি করা হতো যে তা অন্য কোথাও পাওয়া যেতো না। সবচেয়ে সুন্দর ও দামী মসলিন তৈরি হতো এদেশেই – ৫০ থেকে ৬০ গজ দীর্ঘ এবং সাত থেকে আট হাত প্রস্থ এ কাপড়ের পাড়ে থাকতো সোনা ও রূপা বা রঙিন সিল্কের কারুকাজ। এই মসলিন সত্যি এমন সুন্দর ছিল যে, ব্যবসায়ীরা তা প্রায় নয় ইঞ্চি লম্বা ফাঁপা বাঁশের মধ্যে নিরাপদে রাখতো এবং তা তারা খোরাসান, তুরস্ক, পারস্য এবং অন্যান্য অনেক দেশে নিয়ে যেতো'।[৫৯] অন্য একজন পরিব্রাজকের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, 'ঢাকা থেকে যেসব সুন্দর জিনিস আনা হয় তার মধ্যে প্রধান হলো 'খাসা', যা সাধারণভাবে পরিচিত 'মসলিন' নামে।[৬০]

পরবর্তী কুড়ি বছর অর্থাৎ ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার ইতিহাস সম্পর্কে জানার সূত্র বেশি পাওয়া যায়। একাধিক ইউরোপীয় পরিব্রাজক বাংলায় আসেন এবং তাঁরা ঢাকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

ঢাকা সম্পর্কে মানুকির বিবরণ মানুকি (Manucci) ঢাকা ভ্রমণ করেন ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে; তিনি লেখেন, 'রাজমহল থেকে আমি নদীপথে ঢাকা যাই, রাজমহল থেকে ঢাকা পৌঁছাতে আমার সময় লাগে পনের দিন। ঢাকা হলো সারা বাংলা প্রদেশের রাজধানী শহর... ঢাকা শহর সুদৃঢ় নয়, আবার বড়ও নয়; তবে এখানে অনেক লোক বাস করে। এখানকার অধিকাংশ বাড়ি খড় দিয়ে তৈরি। এসময় এখানে মাত্র দু'টো ফ্যাক্টরি ছিল – একটা ইংরেজদের এবং অপরটা ওলন্দাজদের। খ্রিস্টান ছিল অনেক – তারা ছিল সাদা ও কালো পর্তুগীজ। একটা গীর্জা ছিল। অগাস্টিনো নামে একজন খ্রিস্টান যাজক ছিল। আমি এখানে টমাস প্লাটা (প্রাট) নামে একজন ইংরেজের সাথে পরিচিত হই। তিনি ছিলেন একজন সজ্জন ব্যক্তি – তিনি মীর জুমলার কাছ থেকে মাসে পাঁচশ' টাকা ভাতা পেতেন। তিনি নদী তীরবর্তী এলাকার নিয়ন্ত্রণকারী ছিলেন; নৌকা তৈরি ও নৌযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র নির্মাণের কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন।'[৬১]

ঢাকা সম্পর্কে টেভারনিয়ারের বিবরণ : টেভারনিয়ার (Tavernier) ঢাকায় আসেন ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি মানুকির অনেক মন্তব্য সঠিকভাবে বর্ণনা করেন। প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেন, মীর জুমলা কেন ঢাকাকে তাঁর হেডকোয়ার্টার হিসেবে পছন্দ করেন। তিনি লেখেন, 'পূর্বে বেঙ্গলার গভর্নরগণ এখানে (রাজমহল) বসবাস করতেন। শিকারের জন্য দেশটি চমৎকার; তাছাড়া, এটা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু এখন নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে শহর থেকে প্রায় অর্ধ-লীগের বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১ লীগ সমান প্রায় সাড়ে ৩ মাইল) দূরে প্রবাহিত হয়। এছাড়া ঢাকাকে হেডকোয়ার্টার হিসেবে পছন্দ করার অন্য একটা কারণ হলো, আরাকান রাজা ও একাধিক পর্তুগীজ দস্যুদের ভীতিকর অবস্থার মধ্যে রাখা। তারা গঙ্গার মুখে অবস্থান করে এবং মাঝে মাঝে ঢাকা পর্যন্ত চলে আসে। গভর্নর ও ব্যবসায়ীগণ তাদের ঢাকা থেকে বিতাড়িত করে – ঢাকা এখন বড় শহর এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র'।[৬২] রাজধানী পরিবর্তনে টেভারনিয়ারের যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তিনি আরো বলেন, 'ঢাকা একটা বড় শহর এবং এর বিস্তৃতি ঘটেছে লম্বায়। প্রত্যেকে গঙ্গার (বুড়িগঙ্গা) ধারে একটা বাড়ি তৈরি করার ইচ্ছা পোষণ করে। শহরটি লম্বায় বিস্তৃত দু'লীগের বেশি (১ লীগ সমান প্রায় সাড়ে ৩ মাইল)। সর্বশেষ পাকা ব্রিজ (অর্থাৎ কদমতলী) থেকে, যা ঢাকায় বলে আমি উল্লেখ করেছি, একের পর এক বাড়ি রয়েছে; এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি বিচ্ছিন্ন। অধিকাংশ বাড়ির বাসিন্দা হলো কাঠমিস্ত্রী – তারা পালচালিত বা অন্যান্য ছোট ছোট নৌকা তৈরি করে। এসব ঘর খুবই সাধারণ, বাঁশ দিয়ে ঘেরা ও বাঁশের ছাদে মাটির পুরু প্রলেপ দিয়ে তৈরি। ঢাকার বাড়িগুলো খুব উন্নতমানের নয়। গভর্নরের প্রাসাদ চারদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এর মধ্যে যে প্রাসাদ আছে তাও খুব উঁচুমানের নয়; ওই প্রাসাদ নির্মিত কাঠ দিয়ে। তিনি সাধারণত শয়ন করেন তাঁবুতে। ওই প্রাচীরের অভ্যন্তরেই তিনি তাঁবু নির্মাণ করান এবং সেখানে বসেই তিনি দরবারের যাবতীয় কাজ সমাধান করেন। ওলন্দাজরা মনে করে যে, ঢাকার সাধারণ গৃহে তাদের পণ্য নিরাপদ নয় এবং সে কারণে তারা একটা সুন্দর গৃহ নির্মাণ করে। ইংরেজরাও একটা গৃহ নির্মাণ করে, তুলনামূলকভাবে সেটা দেখতে আরো সুন্দর। অস্টি খ্রিস্টান পাদ্রীদের গীর্জা ইট দিয়ে তৈরি, এর গাঁথুনি খুবই সুন্দর... আমার ঢাকা পৌঁছার পরদিন অর্থাৎ ১৪ জানুয়ারি আমি নবাবের সাথে দেখা করতে যাই; আমি তাঁকে স্বর্ণখচিত পোশাক উপহার হিসেবে প্রদান করি। এর ধারে ছিল স্পেনের সোনালী সূঁচিকর্মের ফিতা। চাদর ছিল একই ধরনের সোনা-রূপার কারুকাজ খচিত। আর উপহার দিই সুন্দর একটা পান্না-রত্ন। সন্ধ্যার দিকে আমি ওলন্দাজদের গৃহে ফিরে আসি, ওই গৃহেই আমি অবস্থান করি। নবাব আমার কাছে প্রেরণ করেন স্বচ্ছ পাথর, চীনা-নারাঙ্গ, পারশিক দু'টো ফুটি তরমুজ এবং তিন ধরনের নাশপাতি।

'১৫ তারিখে আমি তাঁকে আমার জিনিসগুলো দেখাই এবং শাহজাদাকে সোনা-পান্নার বাক্সে একটা ঘড়ি, রৌপ্য নির্মিত দু'টো ছোট পিস্তল এবং একটা সুদৃশ্য আয়না উপহার দিই। পিতা ও দশ বছরের যুবরাজ পুত্রকে আমার দেয়া সামগ্রীর মূল্য ৫ হাজার লিভরার (Livres) বেশি'।[৬৩] থেভনট (Thevenot) এর চেয়ে অধিক অন্য কোনো বিবরণ দেননি।[৬৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টমাস বাউরের বিবরণ : টমাস বাউরে (Bowrey) ১৬৬৯ থেকে ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দ সময়ের বেশকিছু অতিরিক্ত বিবরণ দেন। তিনি লেখেন, 'ঢাকা শহর বেশ বড় ও প্রশস্ত। কিন্তু এর অবস্থান হলো নিচু বিল ও জলাভূমিতে এবং এর পানি বেশ লোনা; এটাই এর একমাত্র অসুবিধা। কিন্তু এ শহরের অনেক সুবিধা আছে। যার ফলে ওই অসুবিধা থেকে মুক্ত থাকা যায়। শহরের পাশ দিয়ে একটা সুন্দর ও বড় নদী প্রবাহিত হয়। ৫ থেকে ৬শ' টন ভার বোঝাই জাহাজ এ নদীপথে চলাচল করতে পারে। গঙ্গা নদীর শাখা হওয়ায় এ নদীর পানি খুবই ভালো। কিন্তু শহর থেকে গঙ্গানদী অনেক দূরে; এর পরিধি ৪০ মাইলের কম নয়।

'সৌন্দর্য ও বিশালত্ব এবং অসংখ্য মানুষের জন্য শহরটি প্রশংসনীয়। এখানে একটা বড় ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী আছে; তাদেরকে নিয়মিত বেতন দেয়া হয় এবং তারা সবসময় প্রস্তুত থাকে। আরো আছে অনেক বিরাট, শক্তিশালী ও অতিশয় জাঁকাল হাতি। এরা যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; প্রাসাদের পাশে সবসময় এদের মোতায়েন রাখা হয়।

'অনেক ধনী লোক যুদ্ধের জন্য এবং জাঁকজমক বা মর্যাদার জন্য হাতি রাখে এবং এর ফলে যুদ্ধের জন্য বিরাট এক হস্তিবাহিনী মজুদ থাকে। কারণ, শাহজাদার সেবায় অব্যাহতভাবে পাঁচশ' ঘোড়া প্রস্তুত না রাখতে পারলে এ রাজ্যে কাউকে আড়ম্বরপূর্ণ হাতিতে চড়ার অনুমতি দেয়া হয় না।

'ইংরেজ ও ওলন্দাজদের প্রত্যেকের একটা করে ফ্যাক্টরি ঢাকা শহরে আছে। কিন্তু তাদের বিনিয়োগ খুবই সামান্য। উভয়পক্ষই একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও গভীর উদ্বেগের কারণ আছে – কারণ তারা শাহজাদা ও দরবারের খুব কাছাকাছি থাকে'।[৩৫]

ঢাকায় পর্তুগীজদের আগমন ঢাকায় আগত প্রথম ইউরোপীয়রা হলো পর্তুগীজ। এখানে তাদের মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে। এরা সন্দ্বীপ ও আরাকানের শক্তিশালী পর্তুগীজ গ্রুপ এবং শায়েস্তা খানের শাসনামলে ঢাকার ফিরিঙ্গী বাজারে বসতি স্থাপনকারী পর্তুগীজ নয়। আসলে, শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম বিজয়ে দৃঢ়সংকল্প হলে তিনি ঢাকার কাছে লরিকল-এ লবণ ব্যবসায়ী প্রাচীন পর্তুগীজ বসতি স্থাপনকারীদের কাছে শেখ জিয়াউদ্দীন ইউসুফকে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের অনুরোধ করেন তারা যেন চট্টগ্রামে বসবাসকারী তাদের স্বদেশীদের (পর্তুগীজ) আরাকানের রাজাকে পরিত্যাগ এবং মোগলদের সেবায় যোগদান করতে বলে।[৩৬] এ কাজে তারা সম্মত হওয়ায় শায়েস্তা খান তাদেরকে ফিরিঙ্গী বাজার নামে পরিচিত এলাকা দান করেন। শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে ইছামতী নদীর তীরে ফিরিঙ্গী বাজার অবস্থিত। ঢাকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্তুগীজদের আর একটা প্রাচীন নিদর্শন আছে – পর্তুগীজ ফ্যাক্টরি। এর একটা অংশ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দেও ছিল – ওই ফ্যাক্টরিটা ছিল ওএল রোজারি গীর্জার কাছে। ব্রাডলি বার্ট মন্তব্য করেন – 'ঢাকায় বর্তমানে যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরির ধ্বংসাবশেষ আছে তা পর্তুগীজদের বাড়ির অংশবিশেষ, ওই বাড়িতেই তাদের হেডকোয়ার্টার ছিল। ওই সময় হয়তো এটা নিশ্চয়ই একটা প্রশস্ত অট্টালিকা ছিল; কিন্তু অনেক কিছুর মতোই দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় এই শহরের পতন হয় দুঃখজনকভাবে এবং অতীতের দিনগুলোর স্মৃতি ছাড়া আর কিছু তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়'।[৩৭] তাদের অন্য একটা গীর্জা এখনো টিকে আছে শহর থেকে ৪ মাইল দূরে, তেজগাঁও-এ। এটা নির্মাণ করা হয় ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে।[৩৮]

ওলন্দাজদের ঢাকায় আগমন : বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতালের পাশে নদীর ধারে ঢাকায় ওলন্দাজদের একটা ফ্যাক্টরি ছিল। তেজগাঁও-এ তাদের একটা বাগানবাড়ি ছিল। তারা ইংরেজদের অনেক আগে ঢাকায় আসে বলে মনে হয়। শায়েস্তা খান ওলন্দাজদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেন এবং তিনি তাঁর নিজের লোকদের তাদের কাছে প্রেরণ করেন একথা বলার জন্য যে, তারা যেন জলদস্যুদের বিতাড়িত এবং আরাকান রাজাকে দমন করতে তাদের সাথে যোগ দেয়। ওলন্দাজ কোম্পানির জেনারেল পর্তুগীজদের ক্ষমতা চূর্ণ করতে উদগ্রীব ছিলেন এবং সে কারণে তিনি ওই প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর দু'জন যোদ্ধাকে মোগল নৌবহরে যোগ দেয়ার জন্য সমুদ্রে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে শায়েস্তা খান সন্দ্বীপের পর্তুগীজদের মন জয় করেন। ওলন্দাজ দুই যোদ্ধা পরে এসে উপস্থিত হয়। পর্তুগীজদের ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে শায়েস্তা খান মনে করেন যে, তাঁর পথ পরিষ্কার এবং এ সময় বাইরের সাহায্য নিয়ে তাঁর বিব্রত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি তাদের সদিচ্ছার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং বিনয়ের সাথে জানিয়ে দেন যে, তাঁর এখন আর তাদের প্রয়োজন নেই। বারনিয়ার লেখেন, 'আমি এসব জাহাজ ও তাদের কমান্ডারদের বাংলায় দেখেছি; ওই কমান্ডাররা শায়েস্তা খানের উদারতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনে সন্তুষ্ট ছিলেন বলে মনে হয় না'।[৩৯] ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজদের সম্পত্তি ইংরেজদের কাছে সমর্পণ করা হয়, তবে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগে তা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরিত হয়নি। একজন ওলন্দাজ প্রধান ঢাকায় প্রাণত্যাগ করেন ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে; ওয়ারী কবরস্থানে তাঁর কবরের নিদর্শন ছাড়া ঢাকায় ওলন্দাজদের আর কোনো প্রাচীন নিদর্শন নেই।

ঢাকায় ফরাসিদের আগমন : 'ফরাসিরা ঢাকায় আসে ইংরেজদের পরে, তবে তারা অনেক সম্পত্তি অর্জন করে। বর্তমান আহসান মঞ্জিলের স্থানে একটা ফ্যাক্টরি ও তেজগাঁও-এর একটা বাগানবাড়ি ছাড়াও পুরো ফরাশগঞ্জ তারা অধিকার করে (আসলে ফরাশগঞ্জ হলো ফ্রেঞ্চ-গঞ্জ এর পরিবর্তিত রূপ)। তাদের সম্পর্কে আমি প্রাথমিকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে তথ্য পাই তা হলো – তাদের নৌকাগুলো ঢাকার দিকে যায় ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় তাদের নেতা বা প্রধান ব্যক্তির নাম এম গ্রেগরি। ফরাসিদের সাথে প্রধান যে ঘটনা জড়িত তা হলো ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের ফ্যাক্টরি দখল সম্পর্কিত। আবাসিক ইংরেজদের পক্ষে ফরাসি প্রধান নায়েব নাজিম জেসারত খানের সাথে আলোচনা করেন এবং সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি ইংরেজদের আতিথেয়তা প্রদান করেন'।[৭০] সর্বশেষ ফরাসি প্রধান এম কোর্টিন (M. Courtin) এবং ঢাকার ফ্যাক্টরির অবসানের ইতিহাসের সাথে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শেষ মুসলিম শাসক সিরাজউদ্দৌলার ইতিহাসের সম্পর্ক আছে। এসব ঘটনার বিবরণ এস সি হিল লিখিত (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) 'থ্রি ফ্রেঞ্চ মেন ইন বেঙ্গল' পুস্তকে (পৃষ্ঠা ১৩২-৭৩) পাওয়া যায়। ঢাকার ফরাসি ফ্যাক্টরি প্রকৃতপক্ষে বিলুপ্ত করা হয় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে।[৭১]

ঢাকায় আর্মেনীয়দের আগমন 'অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আর্মেনীয়রা ঢাকায় বসতি স্থাপন করে এবং একটা কলোনি গড়ে তোলে... ঢাকা থেকে আড়াই মাইল দূরে তেজগাঁও-এ 'আওয়ার লেডি অব রোজারি' রোমান ক্যাথলিক গীর্জার অভ্যন্তরে... ১৭১৪ থেকে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে যেসব আর্মেনীয় মারা যায় তাদের কিছু পুরনো কবর ঢাকায় আছে... বর্তমান আর্মেনীয় চার্চ প্রতিষ্ঠার আগে তারা ঢাকায় এখন আরমানিটোলা নামে পরিচিত এলাকায় উপাসনার জন্য একটা ছোট উপাসনালয় গড়ে তোলে। পুরনো ওই উপাসনালয়ের পাশে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে সৌন্দর্যমণ্ডিত 'হলি রিজারেকশন' গীর্জা গড়ে তোলা হয়। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ওই গীর্জার পশ্চিম পাশে ঘণ্টাঘরের কাছে একটা চূড়া নির্মাণ করা হয়, যা ঘড়ির টাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়; কিন্তু ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে এক প্রবল ভূমিকম্পে ওই চূড়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যে স্থানটিতে গীর্জা আছে তা ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কবরস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বিস্তৃত ওই স্থানটি দান করেন আগা কাটচিক মিনাস (Catchick Minas) তার স্ত্রী সোফিয়ে (Sophie) ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যায় – তাকে গীর্জার অভ্যন্তরে কবর দেয়া হয়। ...ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার আর্মেনীয়রা ছিল পাট ব্যবসায়ের অগ্রদূত'।[৭২] পাট ব্যবসায়ের পূর্বে আর্মেনীয়রা, ড. টেলরের মতে, 'কাপড়, লবণ ও সুপারির ব্যবসা করতো ব্যাপকভাবে এবং জমিদারী পরিচালনা করে; তাদের উত্তরাধিকারীরা এখনো অনেক জমিদারীর মালিক'।[৭৩]

ঢাকায় গ্রিকদের আগমন : ড. টেলর লেখেন, 'গ্রিকরা শহরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে পরবর্তীকালে। আলেক্সিস আরগিরি (Alexis Argyree) ছিলেন কোলকাতায় গ্রিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এখানে মারা যান ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি অনেক সম্পত্তি রেখে যান যা তাঁর পুত্র সন্তানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। তাঁর সন্তানরা ঢাকা ও বাকেরগঞ্জে বসবাস শুরু করে। তাদের গীর্জা নির্মিত হয় ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং এ গীর্জার পাদ্রী 'মাউন্ট অব সিনাই' গীর্জার সাথে যুক্ত ছিলেন। আর্মেনীয়দের মতো গ্রিকরাও অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিল; তাদের মধ্যে অনেকে এখনো নারায়ণগঞ্জে লবণ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত'।[৭৪] ঢাকার উল্লেখ্যযোগ্য গ্রিকদের মধ্যে আছে র‍্যালি ব্রাদার্সরা। নারায়ণগঞ্জে তাদের একটা জুট ফ্যাক্টরি আছে। গ্রিকদের গীর্জা ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; এটাকে আর নির্মাণ করা হয়নি। এই গীর্জা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় সি. জে. সি ডেভিডসন-এর লেখা থেকে। তিনি ঢাকা সফর করেন ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে।[৭৫]

ঢাকায় ইংরেজদের আগমন : ঢাকায় প্রথম যে ইংরেজ আসেন বলে জানা যায়, তাঁর নাম জেমস হার্ট (James Hart)। তিনি কে ছিলেন বা কি কাজ করতেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। সম্ভবত তিনি ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় আসেন। কোম্পানির ফ্যাক্টরির কাছে একজন লোক খেসারত দাবি করে, সে একটা ডিক্রিও উপস্থাপন করে। ওই বছরে (১৬৫৮) জেমস হার্ট ডিক্রি কার্যকর করেন বলে জানা যায়।[৭৬] জে টি র‍্যাঙ্কিন (J T Rankin) লেখেন – '১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি এক পত্রে কোম্পানি ঢাকায় একটা এজেন্সি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মার্চ (March)-এর কাছ থেকে স্মিথ দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এটা ফ্যাক্টরি হিসেবে স্বীকৃত ছিল না বা এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও এর প্রধান হিসেবে পরিচিত ছিল না। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির পক্ষ থেকে কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তা জানা যায় না। ঢাকা ডায়েরিতে উল্লেখ আছে, জেমস হার্ট (James Hart)-এর কথা; তিনি ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জমি, বাড়ি ও মালপত্র দান করেন। দৃশ্যত, তিনি ওই বছরেই তাঁর ঢাকার বাড়ি ছেড়ে দেন এবং সে কারণে তিনি কোম্পানির এজেন্ট ছিলেন না বলে ধারণা করা হয়। তদুপরি, মানুকির লেখা এবং হুগলি ডায়েরি থেকে আমরা জানতে পারি যে, মীর জুমলার সময় এবং তাঁর কিছু সময় পরে ঢাকায় টমাস প্রাট (Thomas Pratt) নামে একজন লোক ছিলেন। প্রথমে তিনি নবাবের চাকরিতে ছিলেন এবং পরে কোম্পনির ব্যবসায়ে যোগ দেন। হতে পারে, তিনি নবাবের চাকরিতে থাকা অবস্থায় বাড়তি কাজ হিসেবে অথবা শুধু কোম্পানির ব্যবসার কাজ করতেন।

'১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে জন মার্চকে (John March) কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকায় পাঠানো হয়; জন স্মিথকে তাঁর সাথে পাঠানো হয় দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে। ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মার্চ (March) ঢাকা ত্যাগ করেন ও স্মিথ সেখানে কোম্পানি বিষয়ক প্রধান হিসেবে থেকে যান; এসময় দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন স্যামুয়েল হার্ভি (Samuel Hervy)। ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি ক্লাভেলের (Clavell) আদেশ মোতাবেক স্মিথকে সুপারসিড করেন রবার্ট এলউইস (Robert

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Elwes)। রবার্ট এলউইস ঢাকায় মারা যান ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর। এ সময় হার্ভি ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে কাজ করেন এবং ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে হল (Hall) দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি ওই দায়িত্ব পালন করেন।

'হার্ভি ফিরে না আসা পর্যন্ত ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে কিছু দিনের জন্য ফিচ নেডহাম (Fytch Nedham) কোম্পানির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন – হার্ভি ফিরে আসার পর তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। হার্ভি ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে হার্ভিকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কোম্পানির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে হার্ভি ফ্যাক্টরি বড় ও উন্নত করেন।

'কোম্পানির হুগলি প্রধান মি. ম্যাথিয়াস ভিনসেন্ট (Mathias Vincent) ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে আসেন। কোম্পানির ব্যবসায়ের ওপর আরোপিত শতকরা দু'ভাগ শুল্ক থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি নবাবকে অনুরোধ করেন। এটা বেশ আকর্ষণীয় বিষয়, কিভাবে তিনি প্রথমে 'শাহজাদার-এর দুয়ান' (Duan), পরে 'রাজার দুয়ান'এবং অতঃপর 'শাহজাদার নাজির' বা 'গৃহের কন্ট্রোলার'-এর কাছে যান। কয়েকদিন পর তিনি শাহজাদার সাক্ষাৎ পান। তিনি শাহজাদাকে ২৭টি সোনার মোহর এবং ১০০টি রৌপ্য মুদ্রা (পরে দুটো ঘোড়া) উপহার দেন। প্রায় তিন মাস ধরে বারবার এক কর্মকর্তা থেকে অন্য কর্মকর্তার কাছে ঘোরাঘুরি করার পর মি. ভিনসেন্ট মুক্ত বাণিজ্যের জন্য শাহজাদার-এর অর্ডার (বা নিশান) পান এবং এরপর তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন'।[৭৭] এ সময় ইংরেজদের ফ্যাক্টরি ছিল তেজগাঁও-এ, ওই এলাকাটির প্রায় সব এলাকা এখন কৃষিক্ষেত। পরে ফ্যাক্টরিটা শহরে স্থানান্তরিত করা হয় সম্ভবত ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে, বর্তমানে অবস্থিত স্টেট ব্যাংক বিল্ডিং-এর স্থানে।

ঢাকায় কাপড় সংগ্রহ : ঢাকায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা কিভাবে কাপড় সংগ্রহ করতো তার বিবরণ পাওয়া যায় একজন ইংরেজের ডাইরী থেকেঃ

'ঢাকা ও তার আশেপাশের এলাকায় কোশা মলমল (Cossaes Mullmulls) ইত্যাদির (সম্ভবত মখমল) জন্য টাকা দাদন দেয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো জানুয়ারি মাস। দালাল বা ব্রোকাররা এ কাজের সাথে জড়িত থাকতো এবং কাপড় ব্যবসায়ের জন্য সরকার তাদের নিযুক্ত করতো; তারা কাপড় সরবরাহের জন্য চার মাস সময় নিতো এবং ৬ মাসের মধ্যে তারা সাধারণত তাঁতীদের কাছ থেকে বাদামী রঙের কাপড় নিয়ে আসতো।

'ওই ব্রোকাররা টাকা নিয়ে পাইকারদের (পাইকারী বিক্রেতা) দিতো এবং পাইকাররা শহরে শহরে ঘুরে তাঁতীদের টাকা দিতো। পাইকারদের জিম্মাদার ছিলো তাঁতীরা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রোকারদের জিম্মাদার ছিলো পাইকার, আর কোম্পানির টাকার জিম্মাদার ছিলো ব্রোকাররা।

'সংগৃহীত বাদামী রঙের কাপড় সাধারণত নিয়ে আসা হতো এবং কাপড় সরবরাহ করার আগেই মূল্য ঠিক করা হতো। অবশ্য ঢাকায় কাপড় ব্যবসারত আরবীয় নাবিক ও মোগলরা প্রথমে নির্দিষ্ট কোনো মূল্য ঠিক করতো না; শহরে দালাল বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে কাপড় বুঝে নেয়ার পর বাজার দর মোতাবেক মূল্য নির্ধারণ করতো (তারা প্রতি বছর যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় স্থল পথে নিয়ে যেতো, এমনকি সুদূর তুরস্ক প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত)।

'কোম্পানির কাপড় আনা হলে ব্রোকাররা তা দেখতো, বাছাই করতো এবং শেষে মূল্য নির্ধারণ করতো; এর আগে তারা পাইকারদের (পাইকারী বিক্রেতা) সাথে কথা বলে নিতো। প্রতি একশ' টাকায় তারা দু'টাকা কমিয়ে রাখতো এবং তাদের সিদ্ধান্ত যে ঠিক, সে ব্যাপারে প্রধান একজন মত প্রকাশ করতো। কাপড় চওড়া না, লম্বা না, ভাল না এসব কথা বলে তারা মূল্য কম করার দাবি করতো এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তা পেতো (যদিও তা সমানুপাতিক ছিল না)। তবে নমুনা কাপড়ের চেয়ে খারাপ কাপড় হলে তা ফেরত পাঠানো হতো, তবে ব্রোকারদের সন্দেহ করা হতো না।

'যে পরিমাণ টাকা দেয়ার কথা আলোচনা হতো তারচেয়ে কিছু কম পরিশোধ করা হতো। নমুনা কাপড়ের মতো কাপড় পাওয়া না গেলে সাধারণত দালালরা ক্ষতিপূরণ দিতো। কখনও যদি এমন ধারণা হতো যে, দালালরা কাপড়ের দাম বাড়িয়ে দিতে পক্ষপাতিত্ব করেছে তাহলে শহরের একজন ইচ্ছুক ব্যবসায়ীকে ডেকে আনা হতো এবং সে কাপড়ের মূল্য নির্ধারণ করে দিতো। বালাসোর ও হুগলীতে অর্থ বিনিয়োগকারীর মতো অর্থ বিনিয়োগের জন্য চুক্তি করতে পারে এমন দায়িত্বশীল ব্যবসায়ী ঢাকায় আছে কি নেই সে ব্যাপারে কখনও খোঁজ-খবর নেয়া হয়নি। এজন্য ভাল বিনিয়োগকারী পাওয়া যায়নি। ব্রোকাররা সাধারণত গরিব ও মামলাবাজ। পাইকার বা তাঁতীরা যদি তাদের কাজে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্রোকাররা তাদের পাওনা অর্থ তো দেয়-ই না, বরং তাদের হয়রানি করে ও ক্ষতিপূরণ আদায় করে'।[৭৮]

শায়েস্তা খানের দ্বিতীয় মেয়াদের কার্যকাল

শায়েস্তা খানের দ্বিতীয় মেয়াদের কার্যকাল ছিলো শান্তি ও অগ্রগতির সময়; এ কার্যকালের মেয়াদ ছিলো ১৬৭৯ থেকে ১৬৮৮ সাল পর্যন্ত। এই কার্যকাল সময়ের মধ্যে হুগলিতে অবস্থানরত ইংরেজ প্রধান স্যার উইলিয়াম হেজেস ঢাকা সফর করেন। তিনি ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর ঢাকায় নবাবের সাথে সাক্ষাৎ করেন; ওই সাক্ষাৎকারের বিবরণ তিনি দেন এভাবে ঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সকাল ৯টার সময় আমি নবাবের সাথে দেখা করার জন্য গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি; ১৫ মিনিট পর তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের আমার কাছে পাঠান তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি বসেছিলেন গাঢ় লাল রঙের ভেলভেটের চাঁদোয়ার নিচে; ভেলভেটটি ছিলো সোনা ও রূপার কারুকাজ খচিত, সোনা ও রূপার ঝালরবিশিষ্ট। চাঁদোয়াটি ছিলো চারটি বাঁশের দণ্ডের ওপর টাঙানো – চারটি বাঁশের দণ্ড ছিলো সোনার পাত দিয়ে মোড়ানো। আমীর তুসাক (Emir Tusuck) বা 'মাস্টার অব দি সেরিমনি' আমাকে চাঁদোয়ার পাশে নবাবের বিপরীত দিকে বসার কথা বলেন; নবাবের দেওয়ান বা অন্য কোনো ব্যক্তি বসেছিলেন সামান্য দূরে। প্রথম প্রবেশের সময় আমি নবাবকে ব্যস্ত দেখতে পাই। তিনি তখন আসাম ও সিলেট থেকে সম্প্রতি বিতাড়িত সৈন্যদের সাথে নতুন সৈন্য নিয়োগ ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের নতুন উদ্যমে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছিলেন এবং সেখানে তাদের প্রেরণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঢাকা থেকে ওই দুই এলাকার (আসাম ও সিলেট) দূরত্ব ছিলো আট দিনের পথ। অন্যান্যের মধ্যে আমি একজন পর্তুগীজকে দেখতে পাই – তিনি ছিলেন ৫ বা ৬শ' পর্তুগীজের কমান্ডার। এসব কাজ তিনি দ্রুততার সাথে সম্পাদন করেন, তবু তাঁর সময় লাগে প্রায় ৪৫ মিনিট। সব কাজ শেষ করার পর নবাব আমার উকিল জেমস প্রাইস (James Price)কে ডাকেন এবং তাঁকে বলতে বলেন যে, তিনি (নবাব) আমাকে শহরে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। তিনি আমার সাথে নানা বিষয়ে ৪৫ মিনিট বা তারও বেশি সময় ধরে কথা বলেন। তিনি আমার কাছে অনেক ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, যেমন কবে আমি ইংল্যান্ড থেকে এসেছি, আমাকে কয়মাস সমুদ্রে থাকতে হয়েছিলো এবং কতদিন আমি এদেশে আছি, ইত্যাদি।

'আমি কোম্পানির লোক কিনা তা জানার জন্য তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন; বিষয়টি নিয়ে তিনি দু'বার আমাকে প্রশ্ন করেন। আমার যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়। আমার মতো একজন যোগ্য লোককে এজেন্ট নিয়োগ করায় তিনি কোম্পানির খুব প্রশংসা করেন... যখন তিনি আমাকে চলে আসার অনুমতি দেন (তাদের প্রথা অনুযায়ী) তখন তিনি উঠে দাঁড়ান এবং কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি আমাকে বলেন যে, আমি যেন আগে প্রস্থান করি। (আমাকে বলা হয়) এটা সর্বোত্তম সহৃদয়তা; এ রকম সহৃদয়তা আগে আর কোনো খ্রিস্টানের প্রতি দেখানো হয়নি'।[৭৯]

উইলিয়াম হেজেস (William Hedges) ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট লেখেন ঃ' 'আমাদের জানানো হয়, বুড়িগঙ্গার পানি এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, অধিকাংশ রাস্তায় মানুষের কোমর সমান পানি হয়েছে'।[৮০]

টমাস বাউরের (Thomas Bowrey) বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সময় ঢাকার সীমানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তা ৪০ মাইল বিস্তৃত হয়। পূর্বে ডেমরা খাল থেকে পশ্চিমে মিরপুর (সাতমসজিদের অপর দিকে) এবং দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা থেকে উত্তরে টঙ্গী পর্যন্ত শহরের বিস্তৃতি ঘটে। টঙ্গী ও পাগলায় ব্রিজ ও ইদ্রাকপুরে দুর্গ নির্মাণ করেন মীর জুমলা শায়েস্তা খান নির্মাণ করেন তাঁর প্রাসাদ ছোট কাটরা এবং বুড়িগঙ্গা নদীর তীর বরাবর নির্মাণ করেন একটা বাঁধ। এই প্রাসাদেই টেভেনিয়ার (Tavernier) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। শাহজাদা মুহাম্মদ আজম লালবাগ দুর্গের কাজ শুরু করেন; শায়েস্তা খান এখানেই তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের শাসনকালে বসবাসের স্থান নির্ধারণ করেন। শহরে অনেক মসজিদ, সমাধি ও অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়; স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি ঘটে এবং তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয় ঢাকা। চাউল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম এ সময় ছিলো খুব সস্তা। এক টাকায় ৮ মন চাউল বিক্রি হতো। কথিত আছে যে, এ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য শায়েস্তা খান চিরদিনের জন্য ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে পুরাতন দুর্গের পশ্চিম দরজা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন; ওই একই দামে পুনরায় চাউল বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত তিনি ওই দরজা বন্ধ রাখারও নির্দেশ দেন।[৮১]

শায়েস্তা খানের উত্তরাধিকারীগণ : শায়েস্তা খানের চলে যাওয়ার পর ঢাকার সমৃদ্ধি আস্তে আস্তে কমে আসে। তাঁর উত্তরাধিকারী নবাব বাহাদুর খান ও ইব্রাহীম খান (দ্বিতীয়) লোভী ছিলেন ও আমোদ- প্রমোদে দিন কাটাতেন। ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট ঢাকা ডাইরিতে দেখা যায় 'জনাব, আমাদের সব চেয়ে সুখের বিষয় হলো প্রধান দুষ্ট লোকটার (অর্থাৎ নবাব বাহাদুর খান) অপসারণ। জনাবের আবেদনপত্র পেশ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাদের প্রতি তাঁর কঠোরতা অব্যাহত রাখেন এবং তাঁর হাতে আমাদের অধিকাংশ ব্যবসার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তাঁর অর্থলোলুপ ছিলো তাঁর ব্যঙ্গকৌতুকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাঁর নীতি আমাদের জন্য যথেষ্ট ভয়ের কারণ ছিল যদি জনাবের আবেদনপত্র আমাদের সমৃদ্ধির সময় তাঁর কাছে পৌঁছাতো। এতে তাঁর অর্থলোলুপ আরো বৃদ্ধি পেতো। আপনি আমাদের প্রতি যে সহৃদয়তা ও দয়ার ভাব প্রদর্শন করেছেন তাতে তিনি আমাদেরকে বড় ধরনের শাস্তি দিতে উৎসাহিত হতেন'।[৮২] ইব্রাহীম খান সম্পর্কে ওই ডাইরিতে লেখা হয়, 'তিনি লুণ্ঠন ও শিকার করে আনন্দ পেতেন এবং প্রায় সময় আসক্ত থাকতেন...'।[৮৩] ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর ওই ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করা হয় নবাবকে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তিনি পিতলের বন্দুক পেয়ে অতিমাত্রায় খুশি হন এবং আরো কয়েকটা পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মূর্তির বড় শত্রু এবং মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার জন্য তিনি তাঁর নাজির বা প্রধান খোঁজাকে নির্দেশ দেন। মল্লিক হাদী (Mallick Haddee) তা প্রতিহত করার চেষ্টা করেন এবং নবাবকে তা ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি উত্তরে বলেন, ঘরে মূর্তি রাখা আল্লাহ সমর্থন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন না। ওইগুলো ভেঙ্গে ফেলে তিনি (নাজির) তাঁর জন্য ভালো কাজই করেন। তিনি পর্দা, ছবি আঁকা গ্লাস, আফতাব (পানির জগ), চিলুমচি (গামলা) (এটাও রঙিন গ্লাস), কাঁচের বাটসহ ছুরি, চীনা তৈজসপত্র ইত্যাদি ফেরৎ দেন। এসব কাজ করার পর নবাব বন্দুকের দিকে এগিয়ে যান, বন্দুকটা তিনি বাগানেই স্থাপন করেছিলেন; তিনি সেখানে গিয়ে তাঁর চেয়ারে বসেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সেখানেই বসে থাকেন এবং বন্দুকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন বলে আমাকে জানানো হয়'।[৮৪]

ইব্রাহীম খানের সময় ঢাকায় জানজিরা (সঠিক উচ্চারণ জাজিরা অর্থাৎ উপদ্বীপ) প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।[৮৫] বড় কাটরার বিপরীতে নদীর অপর পারে প্রাসাদটি অবস্থিত। কথিত আছে যে, ওই প্রাসাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বুড়িগঙ্গা নদীর উপর একটা কাঠের ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। প্রাসাদটি ছিলো সুন্দর স্থাপত্য শিল্পে তৈরি একটা বিরাট অট্টালিকা। এই অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বে ছিলো পানিপূর্ণ গভীর পরিখা। কথিত আছে যে, এই প্রাসাদেই হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার মা, খালা ও বিধবা স্ত্রীকে বন্দি করে রাখা হয় এবং এখান থেকেই তাদের নিয়ে গিয়ে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়।[৮৬] বর্তমানে একটা অষ্টকোণী টাওয়ার ও কয়েকটি কামরা এখানে বিদ্যমান আছে।[৮৭]

ঢাকায় নিজামতের শেষ অধ্যায় : বাহাদুর শাহ-এর পুত্র এবং আওরঙ্গজেবের প্রপৌত্র শাহজাদা আজিম উশ-শান ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহীম খান (দ্বিতীয়)-এর পর ভাইসরয় নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৭০২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তিনি ঢাকায় তাঁর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেননি। তাঁর পক্ষে ঢাকায় তাঁর ডেপুটি রহমত খান [৮৮] কাজ-কর্ম পরিচালনা করেন। অর্থ-সম্পদ সংগ্রহে শাহজাদার খুব আগ্রহ ছিলো। তিনি বিদেশী পণ্যের একমাত্র পরিবেশক হওয়ার চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশে তিনি বিদেশী পণ্য ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন বন্দরে তাঁর নিজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করেন; এই ব্যবসাকে বলা হতো 'সওদা-ই-খাস'। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিলেন; তিনি তাদের সাথে মিলে হিন্দু উৎসব 'হোলি' পালন করতেন। হিন্দু যুবরাজদের অনুকরণে জাফরানী রঙের পাগড়ি ও লাল পোশাক পরে তিনি দরবারে বসতেন। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে পোস্তায় আজিম উশ-শান তাঁর নিজের জন্য একটা প্রাসাদ নির্মাণ করেন – স্থানটি লালবাগ দুর্গ থেকে প্রায় ৩শ' গজ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ড. টেলর লেখেন 'গত কুড়ি বছরে পোস্তার ওই বাসভবনের বিরাট অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে; ওই অট্টালিকার সামান্য অংশের অস্তিত্ব এখন বিদ্যমান আছে'।[৮৯] সম্ভবত তাঁর নামেই 'আজিমপুরা' এলাকাটির নামকরণ করা হয়। এই শাহজাদার সময়কালে ঢাকায় বড় রকমের গোলযোগ শুরু হয়। ক্ষমতাসীন সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করতে নিষেধ করেন। তিনি লেখেন ' কবে থেকে তুমি 'সওদা-ই-খাস'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(ব্যক্তিগত ব্যবসা) শিখলে? এটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ ছাড়া আর কি হতে পারে? নিশ্চয়ই তোমার পিতা বা পিতামহের কাছ থেকে শেখনি? এসব চিন্তা থেকে দূরে থাকো, এটাই তোমার জন্য মঙ্গল'।[৯০] এভাবেই আজিম উশ-শান-এর ব্যক্তিগত ব্যবসার পথ বন্ধ হয়ে যায়; তবে তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকারি তহবিলে হাত দেন এবং জনগণের ওপর শোষণ চালান। কিন্তু তাঁর দেওয়ান মুরশীদ কুলী খান একাজে তাঁকে বাধা দেন – তিনি সরকারি ব্যয় হ্রাস ও সরকারি আয় নিয়ন্ত্রণে তৎপর হন। ফলে নাজিম (ভাইসরয়) ও দেওয়ানের মধ্যে কলহ শুরু হয়, যা সৈয়দ আউলাদ হাসানের ভাষায় '১৭০২ খ্রিস্টাব্দের এক সকালে দেওয়ান পোস্তার বাসস্থানে শাহজাদার এক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন। এ সময় শাহজাদা এখানেই বসবাস করছিলেন। নাগদিদের (Nagdis) সাবেক কমান্ডার আবদুল ওয়াহিদ (যাকে দেওয়ান পূর্বে চাকুরিচ্যুৎ করেন) এবং তাঁর অনুগত আরো কয়েকজন লোক তাঁকে সুযোগ মতো ধরার জন্য লুকিয়ে থাকে। তারা দেওয়ানের রাজকীয় পালকি ঘিরে ফেলে এবং বকেয়া বেতন দেওয়ার দাবি জানায়। করতলব খান (অর্থাৎ মুরশীদ কুলী খান) ও তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীরা অস্ত্রসজ্জিত ছিলো এবং তারা আক্রমণকারীদের সরিয়ে দিয়ে নিরাপদে প্রাসাদে পৌঁছাতে সমর্থ হয়। প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে দেওয়ান সরাসরি শাহজাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, আবদুল ওয়াহিদ ও তাঁর সৈন্যদের পরিকল্পনার সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা আছে। তিনি তাঁর ছোরা শাহজাদার সামনে রেখে বলেন, 'আপনি যদি আমার জীবন চান, তাহলে এই ছোরা নিন। আসুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি'। কিন্তু আজিম উশ-শান অভিযোগ অস্বীকার করেন। প্রাসাদ থেকে ফিরে আসার পর দেওয়ান সকালের ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং তা সম্রাটের কাছে পেশ করেন। তিনি মনে করেন যে, এখানে তাঁর জীবন নিরাপদ নয়। অতঃপর তিনি রাজস্ব সম্পর্কিত সব অফিস মাখসুসাবাদ (Makhsusabad)-এ স্থানান্তরিত করেন (স্থানটি তখন ওই নামেই পরিচিত ছিল) এবং সেখানেই তিনি তাঁর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন।'[৯১]

এই পরিবর্তনে আওরঙ্গজেব তাঁর সম্মতি জানান। ঘটনাটি ঘটে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে। আজিম উশ-শানকে ঢাকা ত্যাগ করে পাটনায় যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ডেপুটি সুবেদার হিসেবে ঢাকার কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয় তাঁর পুত্র ফররুখ সিয়ার-এর ওপর। তিনি ১৭১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওই পদে বহাল থাকেন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুরশিদ কুলী খান গভর্নর নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত সরকারিভাবে নিজামত ছিল ঢাকায়। এ সময় (১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ) মুর্শিদাবাদকে রাজধানী করা হয়। তবে ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা আজিম উশ-শানের ঢাকা ত্যাগের পর থেকে ঢাকার গৌরব ম্লান হয়ে যায়। মোগলদের প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে প্রায় একশ' বছর ধরে ঢাকার যে প্রধান অবস্থান ছিল তা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায় – মোগলদের সময়ে সেই অবস্থা আর ফিরে আসেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. নায়েব নাজিমদের অধীনে ঢাকা
(১৭১৭-১৭৬৩)

মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর ঢাকা হয়ে ওঠে নায়েব নাজিম (ডেপুটি গভর্নর)-এর কর্মস্থল; গভর্নর নিয়োগ করতেন নায়েব নাজিম বা ডেপুটি গভর্নরকে। নায়েব নাজিমদের অধীনে শহরের প্রশাসন ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। সেই সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অবনতি ঘটে। ফলে জনগণ ও শহরের বিস্তৃতির ওপর একইভাবে তার প্রভাব পড়ে ধীরে ধীরে।

নবাব মুরশিদ কুলী খান ঢাকার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন লুৎফুল্লাহকে (লুৎফুল্লাহর অপর নাম ছিল মুরশিদ কুলী খান)। তিনি ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার নায়েব নাজিমের পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে নিযুক্ত হন সরফরাজ খান; তিনি মুর্শিদাবাদে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর পক্ষে ঢাকায় কাজ করার জন্য গালিব আলী খানকে নিয়োগ করেন। তিনি গালিব আলী খানের দেওয়ান হিসেবে যশোবন্ত রায়কেও নিয়োগ করেন। দেওয়ানের কাজ সম্পর্কে রিয়াজ-উস-সালাতিন-এ উল্লেখ করা হয় – 'উল্লেখিত মুনশিকে প্রশিক্ষণ দেন নবাব জাফর খান। সততা ও ন্যায়পরায়ণতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি প্রদর্শন ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি শুধু রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করেননি, জনগণের সুখ-শান্তিও তিনি নিশ্চিত করেন। তিনি 'সওদা-ই-খাস' পদ্ধতি পুরোপুরি বাতিল করেন এবং মুরশিদ কুলী খানের সময় মীর হাবিব যেসব নতুন প্রথা উদ্ভাবন করেন ও জোর করে অর্থ প্রাপ্তির যেসব পন্থা অবলম্বন করেন তা বাতিল করে দেন। খাদ্যশস্যের বিক্রয় মূল্য কম রাখার প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে তিনি তা সস্তায় প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন এবং অতঃপর জাহাঙ্গীরনগর দুর্গের পশ্চিম দরজা উন্মুক্ত করে দেন; ওই দরজা বন্ধ করে দেন নবাব আমীর-উল-উমারা শায়েস্তা খান। ওই বন্ধ দরজায় একটা নিষেধাজ্ঞা খোদিত ছিল নবাবের সময় পণ্যদ্রব্যের যে দাম ছিল বাজারদর মোতাবেক প্রতি দিরহামে এক সের পণ্যদ্রব্যের সেই দাম কমিয়ে আনতে সফল না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন ঐ দরজা উন্মুক্ত না করে।[৯২]

ঢাকার মর্যাদার নিম্নতম অবস্থা : ঢাকা ডায়েরিতে উল্লেখ করা হয় যে, গালিব আলী খানের উত্তরাধিকারী ছিলেন সৈয়দ রাজা খান বা মুরাদ আলী খান।[৯৩] এ সময় রাজা রাজবল্লভ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম হওয়ার পর তিনি তাঁর জামাতা নওয়াজিশ মোহাম্মদকে ঢাকার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন। তাঁর ডেপুটি হিসেবে ঢাকায় পাঠানো হয় হোসেন কুলী খানকে। হোসেন কুলী খান ঢাকা ত্যাগ করার সময় তাঁর ভাইপো হোসেনউদ্দিন খানকে তাঁর স্থানে কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য নিয়োগ করেন। এভাবে নবাবের ডেপুটি, ডেপুটির ডেপুটি দ্বারা ঢাকার শাসনকার্য পরিচালিত হয়।

কর্মকর্তাদের মধ্যে অবাধে ঘুষ আদান-প্রদান : ঘুষ ও দুর্নীতির চরম অবনতির কথা জানতে পারা যায় ঢাকা ডায়েরি[২৪] থেকে। এ সময় ঢাকার কর্মকর্তাদের মধ্যে ঘুষ ও দুর্নীতি ছিল অবাধ (মোগলদের অধীন শিথিল স্থল শুল্ক পদ্ধতির এটা কি স্বাভাবিক পরিণতি ছিল?)। অর্থ চাওয়াকে ঘুষ বলে গণ্য করা হতো না। বরং কোম্পানিকে সুবিধা দেয়ার বিনিময়ে এটাকে উপহার হিসেবে বিবেচনা করা হতো। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে – ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে লিপিবদ্ধ করা হয় 'গত এপ্রিল মাসে মকসুদাবাদ থেকে এখানে আসেন সৈয়দ রাজা খান। তাঁর সাথে সরফরাজ খানের প্রিয় কন্যার বিয়ে ঠিক হয়... আমাদের নবাব গালিব আলী খান থেকে তাঁকে স্বাধীন করা হয়... তাঁর সাথে সৈয়দ রাজা খানের বিরোধ ছিল। এই লোকটি (সৈয়দ রাজা খান) অত্যন্ত ঔদ্ধত্যভাবে কাজ করতেন – শুধু নিজের অফিসে নয়, নবাবের সরকারি অফিস সংশ্লিষ্ট বিষয়েও তিনি একইভাবে কাজ করতেন। তাঁর চাহিদা অনুযায়ী কেউ অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে তিনি তাকে চাবুক মারতেন, হত্যা করতেন। কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তিনি তাঁর অত্যাচার চালাতেন। এখানে সবাই মনে করতো যে, গালিব আলী খানকে প্রত্যাহার করা হবে এবং তাঁকে নবাব করা হবে। এই লোকটি প্রায়ই (কোম্পানির) প্রধানকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ডেকে পাঠাতেন এবং নবাবকে যে ধরনের উপঢৌকন দেয়া হয়েছিল তাঁকেও সেই ধরনের উপঢৌকন দিতে বলা হতো। তাঁর চাহিদা পূরণে অস্বীকার করা হলে তিনি আমাদের সব ব্যবসা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিতেন। আমাদের কোম্পানি প্রধান তার দাবি কৌশলে এড়িয়ে যেতেন। তিনি অবশ্য তাঁর চাহিদা কমিয়ে দেন এবং বলেন যে, সম্মানজনক পোশাক প্রদান ছাড়া শুধু দেখা করলেই তিনি খুশি হবেন; শুধু কথা বলার উপঢৌকনের অর্থের পরিমাণ ২ হাজার টাকা। তবে আমাদের উকিল তাঁর একজন অধঃস্তন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলেন যে, ১ হাজার ৫শ' টাকা হলেই চলবে বলে তাঁরা মনে করেন। আমাদের কোম্পানি প্রধান গতকাল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার ও ৫শ' টাকা দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি ঘৃণার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন।'[২৫]

ঢাকায় পণ্যসামগ্রীর প্রচলিত মূল্য : সে সময় ঢাকায় পণ্যসামগ্রীর দাম কেমন ছিল তা ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ডায়েরিতে উল্লেখিত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় –

তেল	৩৫ মণ	১৬৮ টাকা ৭ আনা
গুড়	১০ মণ	৮৫ টাকা
মটরশুটি	১৫ মণ	৯ টাকা ৩ আনা ৩ পয়সা
ছোলা	৭৩ মণ ১৫ সের	৮৩ টাকা ১৪ আনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুতুল	২০ মণ	২০ টাকা
নিকৃষ্ট ছোলা	৩৮ মণ	১৬ টাকা ৩ আনা ৩ পয়সা
ভালো চাল ও সাধারণ চাল	৪৪৩ মণ	৫৪৬ টাকা ১৩ আনা ৩ পয়সা

মারাঠা আক্রমণের প্রভাব : মারাঠা আক্রমণের ভীতি ঢাকাতেও অনুভূত হয়। সাধারণ এ অনুভূতির কথা ঢাকা ডায়েরির বর্ণনাতেও পাওয়া যায়; ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল (ঢাকা ডায়েরিতে) লেখা হয় 'বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তাতে মনে হয়, মারাঠারা সরকারের জন্য একটা মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঠিক সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে, তারা মুকসাদাভাব (Muxadavab) দখল করে নিয়েছে। ওই স্থানের লোকেরা বেশ বিপদের মধ্যে আছে বলে মনে হয়। কারণ মুকসাদাভাব থেকে অনেক লোক তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে এখানে প্রতিদিন চলে আসছে। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে, একদল মারাঠা এখানে লুণ্ঠন করার জন্য আসতে পারে। এই প্রেক্ষিতে আমরা ৫০ জন অতিরিক্ত বন্দুকধারী রাখার এবং গ্যারিসনে সব সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করি।' ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকা ডায়েরিতে লেখা হয় ' মারাঠাদের সম্পর্কে কিছু পরামর্শ পাওয়ার পর এখানকার সরকার অত্যন্ত বিস্ময় ও ত্রাসের মধ্যে আছে। আমাদের (কোম্পানি) প্রধান আমাদের সামনে একটা পত্রের কপি মেলে ধরেন – আমাদের নবাবের কাছে ওই পত্রটি প্রেরণ করেন মুকসাদাভাব থেকে হোসেন কুলী খান; এখানকার দেওয়ানের মাধ্যমে তিনি ওই পত্র পাঠান এবং দেওয়ান গত রাতে ওই পত্র আমাদের নবাবের কাছে হস্তান্তর করেন। ওই পত্রে আমাদের নবাবকে মারাঠাদের সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, মারাঠারা মুকসাদাভাবে (Muxadavab) প্রবেশ করেছে। তারা দু'বার কেল্লায় আক্রমণ করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তারা কেল্লায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। তবে তারা শহরের আশপাশের সবকিছু পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। একথা সত্য বলে এখানে বিশ্বাস করা হয় যে, আগা সিপাইয়ের নেতৃত্বে একদল মারাঠা বড় নদী পার হয়েছে ও ভগবানগোলায় গিয়েছে এবং তারা এখানে (ঢাকায়) আসছে। এসব কারণে আমাদের দরবার বর্তমানে বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে। আমাদের শহরে খুব শিগগিরই গোলযোগ শুরু হবে। এই আশঙ্কায় আমাদের নবাব প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছে।' একই ধরনের একাধিক বিবরণ ঢাকা ডায়েরিতে উল্লেখ করা হয়েছে ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দের বিভিন্ন তারিখে।

মুসলমানদের হাত থেকে ব্রিটিশদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর : মুসলমানদের হাত থেকে ব্রিটিশদের হাতে সরকারি ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ঢাকার অবস্থা ছিল গোলযোগপূর্ণ। পরবর্তীকালে ঢাকার একজন নায়েব নাজিম ক্ষমতার এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হস্তান্তর সম্পর্কে বলেন, 'আলীবর্দীর (তিনি ঢাকার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন জেসারত খানকে) মৃত্যুর পর বাংলার নবাব হন সিরাজউদ্দৌলা। পরবর্তী বিবরণগুলো ফার্সি ভাষায় বর্ণিত দলিল থেকে অনুবাদ করা হলো; ওইসব দলিল সদয় হয়ে ঢাকার বর্তমান নবাব মান্যবর নূসরত জং সরবরাহ করেন।

'সিরাজউদ্দৌলা শিগগিরই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। কোলকাতা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করার উদ্দেশে তিনি বিরাট এক সৈন্যদল গঠন করেন এবং ঢাকায় সব ইংরেজকে হত্যা করার জন্য জেসারত খানকে নির্দেশ দেন। ওই নির্দেশে বলা হয়, এমনকি শিশু ও মহিলাকেও যেন রেহাই দেয়া না হয়; ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্যক্তিগত (ইংরেজদের) সব সম্পত্তি যেন দখল করে নেয়া হয় এবং লুণ্ঠিত সব সম্পদ মুর্শিদাবাদে রাজা মোহন লালের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ওই নির্দেশ ছিল চূড়ান্ত এবং তা পালনে এক মুহূর্ত দেরি করার অবকাশ ছিল না। ওই নির্দেশের সর্বোচ্চ নৃশংসতা জেসারত খানকে মারাত্মকভাবে হতবুদ্ধি করে তোলে। বহু নিরপরাধ লোকের ওপর সিরাজউদ্দৌলার নির্দেশ কার্যকর করা হলে তা হবে জঘন্য ও বীভৎস কাজ; আবার স্বেচ্ছাচারী শাসকের নির্দেশের বিরোধিতা করার অর্থ হলো তাঁর নিজের ধ্বংসকে ডেকে আনা। জেসারত খান অবশ্য ইংরেজদের রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

'এ সময় ইংরেজ কোম্পানির ঢাকা এজেন্ট ছিলেন রিচার্ড বেচার (Richard Becher)। জেসারত খান তাঁকে এবং তাঁর স্বদেশের সব লোককে দুর্গে ডেকে পাঠান। সেখানে তাদের একদিন ও একরাত আটক করে রাখা হয়, তবে তাদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। জেসারত খানের পরামর্শে তারা এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, তারা সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধাচারণ করবে না। অতঃপর তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তায় তাদের নিজ নিজ গৃহে ফেরত পাঠানো হয়। তবে তাদের সব সম্পদ দখল করে নেয়া হয় এবং নির্দেশ মোতাবেক মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেয়া হয়। একই সাথে জেসারত খান একটি পত্র লেখেন সিরাজউদ্দৌলাকে। ওই পত্রে তিনি লেখেন যে, ঢাকায় যেসব ইংরেজ আছে তাদের হত্যা করা কঠিন কিছু নয়; কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি খুবই সামান্য। তারা শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ। এতোগুলো নির্দোষ মানুষকে হত্যা করা বর্বরতা। তিনি তাদের জীবন রক্ষা করেছেন একথা মনে করে যে, ওই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল হয়তো মুহূর্তের অসন্তুষ্টির জন্য এবং তা কার্যকর করার জন্য জারি করা হয়নি। তিনি ব্রিটিশ নাগরিকদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা কোনো রকম শত্রুতামূলক কাজ করবে না। তিনি পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন।'

'এ সময় সিরাজউদ্দৌলা কোলকাতা দখল করেন। তিনি ওই পত্রের কোনো উত্তর দেননি। তবে জেসারত খানের আচরণে খুবই ক্রুদ্ধ হন। মনে হয়, তিনি জেসারত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। অতি শিগগির সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যদলের অধিকাংশ সৈন্য তাঁকে ত্যাগ করে ইংরেজদের পক্ষে চলে যায়। এই ঘটনা স্বেচ্ছাচারী শাসকের নিষ্ঠুর ও সঙ্কীর্ণ অথচ লোলুপ জীবনের তাৎক্ষণিক সমাপ্তি ঘটায়।

'বেশ কয়েক বছর পর কাশিম খানকে অবহিত করা হয় যে, জেসারত খান ঢাকায় ইংরেজদের জীবন রক্ষা করেন ও তাদের আশ্রয় দেন। কাশিম খান তাঁকে সেখান থেকে মুঙ্গের-এ নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। তাঁকে হত্যা করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি তা না করে ভিন্ন পথ অবলম্বন করা শ্রেয় মনে করেন। তিনি তাঁকে মুঙ্গের-এ আটক রাখেন এবং ঢাকার দেওয়ানের কাছে একটা পত্র লেখার নির্দেশ দেন – ওই পত্রে তাঁকে ঢাকায় অবস্থানরত সব ইংরেজকে অবিলম্বে হত্যা করার এবং কোম্পানির (ইস্ট ইন্ডিয়া) ও ব্যক্তিগত সব সম্পত্তি লুণ্ঠন করার নির্দেশ দেয়া হয়। ইংরেজরা তাদের হত্যা করার আগাম সংবাদ পেয়ে অতিদ্রুত নিজ নিজ গৃহ ও সম্পত্তি পরিত্যাগ করে এবং কোলকাতা যাওয়ার উদ্দেশে রাতের অন্ধকারে নৌকায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। পরদিন স্থানীয় সৈন্যরা পায়ে হেঁটে ও ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজদের ফ্যাক্টরি ঘিরে ফেলে এবং বুঝতে পারে যে, ইংরেজরা পলায়ন করেছে। তারা ফ্যাক্টরিতে আক্রমণ চালায় ও তা লুণ্ঠন করে। ইতোমধ্যে লকীপুর (Luckipoor) থেকে লেফটেন্যান্ট সুইনটন (Liuitenant Swinton) সৈন্যসহ শহরে উপস্থিত হন এবং প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও তিনি সফল হন; স্থানীয় সৈন্যরা মুঙ্গের-এ পলায়ন করে।'[৯৬]

ঢাকা সম্পর্কে রেনেলের (Rennell) বিবরণ : রেনেল ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় আসেন জরিপ কাজ পরিচালনার উদ্দেশে। তিনি তাঁর জার্নালে লেখেন : 'বুড়ীগঙ্গা বা নদীর পাশে ঢাকা অবস্থিত; এটা গঙ্গা নদীর পূর্বদিকের সর্বশেষ শাখা। সাধারণভাবে নদীটি প্রায় ২শ' ৫০ গজ প্রশস্ত এবং ঢাকার আশপাশে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এর স্রোতধারা বেশ জোরালো। শুষ্ক মৌসুমেও এ নদীতে বড় বড় নৌকা চলে।

'ঢাকা শহর এ নদীর উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত এবং বাঁধ বরাবর তা প্রায় চার মাইল প্রসারিত। ব্রিটিশ ফ্যাক্টরিটির অবস্থান ২৩.৪০° উত্তর অক্ষাংশে এবং তা নদী থেকে এক মাইলের চারভাগের প্রায় একভাগ দূরে। ফ্যাক্টরির একটা অংশ একটা চৌবাচ্চার কাছাকাছি পর্যন্ত প্রসারিত। ওই চৌবাচ্চার চতুষ্পার্শ্বে ১শ' গজের কম জায়গা আছে। ফরাসি ও ওলন্দাজ ফ্যাক্টরি আরো ছোট এবং নদী থেকে আরো দূরে অবস্থিত।'[৯৭] ঢাকা শহরের বিস্তৃতি সম্পর্কে রেনেল যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, নায়েব নাজিমদের সময়ে শহরের বিস্তৃতির কতোটা অবনতি ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. ব্রিটিশদের অধীনে ঢাকা

(প্রথম পর্ব ১৭৬৫-১৯০৫)

জেসারত খানকে পুনরায় নায়েব নাজিম নিয়োগ লেফটেন্যান্ট সুইনটনের (Swinton) ঢাকা আগমন থেকে সত্যিকার অর্থে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়; তিনি নিশ্চিতভাবে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ঢাকায় আসেন। এ সময় ঢাকার রাজস্ব বন্দোবস্তের দায়িত্বে ছিলেন মুহম্মদ রাজা খান। জেসারত খান ইংরেজদের বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন এবং ইংরেজরা অবিলম্বে তাঁকে ঢাকায় ডেকে পাঠান। তাঁকে তাঁরা ঢাকার নায়েব নিজাম নিযুক্ত করেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত বিবরণে দেখা যায় 'প্রদেশের বিশৃঙ্খল অবস্থা যখন কিছুটা কমে আসে তখন কোলকাতার কাউন্সিল সদস্যগণ জেসারত খানকে প্রকাশ্যে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করার এবং মসনদে উপবেশন করার অনুরোধ জানান। সেই মোতাবেক তিনি ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের পক্ষে একজন কাউন্সিল সদস্যকে প্রধান করে প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার কাজ শুরু করেন। সপ্তাহে দু'দিন নায়েব নাজিম তাঁর সম্পাদিত কাজ-কর্ম, পরিকল্পনা এবং প্রত্যেকটি বিভাগের খরচ ও আয় সম্পর্কিত বিবরণ তাঁর ইংরেজ সহকর্মীর কাছে প্রেরণ করতেন তাঁর সন্তুষ্টি ও তাঁকে অবহিত করার জন্য এবং প্রেসিডেন্সির অনুমোদনের জন্য। সপ্তাহে দু'দিন তিনি নির্ধারিত করে রাখেন আদালতের আপিল গ্রহণের জন্য – তিনি এবং ইংরেজদের পক্ষের প্রধান ব্যক্তি একত্রে তা গ্রহণ করতেন এবং চিফ ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতেন অথবা বিপরীত সিদ্ধান্ত দিতেন। এভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সরকারের কাজ-কর্ম পরিচালিত হয়। পারস্পরিক আস্থা ফিরে আসে এবং ইংরেজরা দেশের আইন, প্রথা ও রাজস্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পায়।'[৯৮]

নায়েব নাজিমের নতুন বাসভবন : ঢাকায় আসার পর লেফটেন্যান্ট সুইনটন প্রাচীন দুর্গের (বর্তমান জেলখানা এলাকা, চকবাজার) বাসস্থানে থাকেন এবং নায়েব নাজিম বড় কাটরায় তাঁর বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। পরে তাঁর জন্য নিমতলী কুঠি নির্মাণ করা হয়। এ কুঠির দু'টি অট্টালিকা বিদ্যমান আছে, যা পরে ঢাকা মিউজিয়াম ও তার অফিসের কাজে ব্যবহৃত হয়।[৯৯]

পরিবর্তনের সময়ে বিশৃঙ্খলা : মুসলমান থেকে ব্রিটিশ শাসন পরিবর্তনের কাল ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত বলে বলা হয় এবং অন্যান্য যুগে সব পরিবর্তনের সময়ের মতো এ সময়টাও ছিল বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ। এ সময়ে ঢাকা শহরের চেয়ে দেশের অন্যান্য স্থানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে মারাত্মকভাবে। ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীরা অবাধে ডাকাতি ও লুণ্ঠন করতো; নৌকায় ভ্রমণ করা মোটেই নিরাপদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না। জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির একটা প্রধান কারণ। পরিস্থিতি এমন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে যে, ঢাকায় ইংরেজদের ফ্যাক্টরিতে পুরনো হারে মজুরি দিয়ে তাঁতী নিয়োগ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। একের পর এক বন্যা ও দুর্ভিক্ষ হওয়ায় পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। ১৭৬৯, ১৭৮৪ এবং ১৭৮৭ বছরগুলো ছিল ঢাকার জন্য খুবই ক্লেশকর। তবে সবচেয়ে বড় রকমের বন্যা হয় ১৭৮৮ সালে। এ সময় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময় এক টাকায় চারসের চাল বিক্রি হয়। সম্ভবত, অর্থনৈতিক এই সঙ্কটের জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণকারী একদল ডাকাতের সৃষ্টি হয়, যারা 'সন্যাসি আক্রমণকারী' হিসেবে পরিচিত হয়। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে একদল 'নিম্নশ্রেণীর ফকির', ক্লাইভ তাদের ওই নামেই অভিহিত করেন, ঢাকা ফ্যাক্টরি আক্রমণ করে তা দখল করে।[১০০] ঢাকার প্রধান মি. কেলসল (Kelsall) ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উল্লেখ করেন 'সন্যাসিরা যেখানেই যায় সেখান থেকে এখনো চাঁদা আদায় করছে। সর্বশেষ তারা আলেপসিং (Alepsingh) পরগণায় বেগুনবাড়িতে (Byganbarry) ছিল বলে জানা যায়।'[১০১] ঢাকার কালেক্টর ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি উল্লেখ করেন '৫শ' সন্যাসির একটি দল আতিয়া (Attea) পরগণার কাগমারীতে উপস্থিত হয়েছে। ঢাকা থেকে স্থানটি প্রায় দেড় দিনের পথের দূরত্ব। ধামরাইয়ের লোকজন তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে, ঢাকার অধিবাসীরাও ভীষণ ভীতির মধ্যে আছে।' ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি লেখেন : 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ঢাকার ছয় ক্রোশের মধ্যে এসে পৌঁছায়, কিন্তু ঢাকার প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে তারা পালিয়ে যায়।'[১০২] তাদের দ্বিতীয়বার আক্রমণ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয় ১০ ফেব্রুয়ারি। ঢাকার প্রধান ২০ ফেব্রুয়ারি লেখেন 'এ প্রদেশের অধিকাংশ এলাকা থেকে সন্যাসিরা চলে গিয়েছে।'[১০৩]

ঢাকায় নতুন পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা : ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাস হওয়ার পর ঢাকার শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় একটি প্রাদেশিক পরিষদ নিয়োগ করা হয়। জেসারত খান ও কর্মকর্তাদের অধীন নিজামত (ফৌজদারি) প্রশাসন থাকলেও ভূমি রাজস্বের কালেক্টরকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট করে কোর্ট অব দেওয়ানি আদালত গঠন করা হয়। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজামত আদালতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে এবং এ আদালতের প্রথম বিচারক নিযুক্ত হন মি. ডানকানসন (Duncanson)। এ বছর জেসারত খান মারা যান; তাঁর প্রপৌত্র নবাব হাশমত জঙ্গকে নায়েব নাজিম নিযুক্ত করা হয়। তিনি ওই পদে সাত বছর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর ভাই নবাব নসরত জঙ্গ। তিনি অত্যন্ত খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন এবং ৩৭ বছর ধরে নায়েব নাজিম হিসেবে দায়িত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালন করেন। তাঁর সমসাময়িক চার্লস ডি'ওলি (D'Oly) লেখেন : 'স্থানীয় প্রশাসনে নায়েব নাজিমের এখন আর কোনো হাত নেই। প্রদেশের অভ্যন্তরীণ সব ব্যবস্থার পরিচালনার ভার এখন কোম্পানির হাতে ন্যস্ত। বর্তমান নবাব নসরত জঙ্গ উপরে উল্লেখিত জেসারত খানের উত্তরাধিকারী। তাঁর বয়স প্রায় ষাট বছর। তিনি শান্ত প্রকৃতির লোক। তাঁর বিনম্র আচরণ ও হৃদয়ের বদান্যতার প্রশংসা করে সবাই। তদুপরি চারুকলার প্রতি তাঁর আগ্রহ যথেষ্ট। তিনি ঢাকায় বসবাস করেন; তাঁর প্রাসাদ প্রাচ্য ধারায় অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে সাজানো। তিনি যে ঘরে মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেন সে ঘরটি ইংরেজদের 'প্রিন্ট ও পেইন্টিং' দ্বারা এমনভাবে সজ্জিত যে, এক ইঞ্চি দেওয়ালও খালি দেখা যায় না। আনুষ্ঠানিক যাত্রার সময় সারিবদ্ধভাবে বহু ঘোড়সওয়ার ও তাঁর অনুসারীরা তাঁকে অনুসরণ করে।'[১০৪] তাঁর সংগৃহীত পেইন্টিং থেকে দুটো পেইন্টিং – মুহররম শোভাযাত্রা ও ঈদ শোভাযাত্রা – ঢাকার বেচারাম দেউড়ির খান সাহেব আবুল হাসনাত ঢাকা মিউজিয়ামের কাছে উপহার হিসেবে দান করেন। এই পেইন্টিং দু'টোর শিল্পী হলেন আলম মুসাওয়ার,[১০৫] পেইন্টিং দুটো হলো ঢাকায় অনুসৃত ঊনবিংশ শতাব্দীর পেইন্টিং ধারার ক্ষয়িষ্ণু অধ্যায়ের।

ঢাকায় ব্যাপ্টিস্ট মিশন : উনিশ শতকে ঢাকা উৎসাহজনক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। শহরে ব্রিটিশ প্রশাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজ মিশনারিরা ঢাকায় আসতে শুরু করে। ব্যাপ্টিস্ট মিশন এখানে আসে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে এবং ছোট কাটরার কাছে তাদের নৌকাগুলো নোঙর করে। কিন্তু তাদের আগমনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের মাঝে বিস্ময় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ফলে মিশনারিদের শহর ত্যাগ করার জন্য ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিতে হয়। আসলে মি. লিওনার্দ (Leonard) ঢাকায় আসার পর ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে মিশন তাদের কাজ শুরু করে। তাদের প্রথম গৃহ ছিল চক এলাকায় (বর্তমান চকবাজার) এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তারা বাংলাবাজারে বর্তমান কোয়ার্টারে তাদের স্থান পরিবর্তন করে।

ঢাকা সম্পর্কে বিশপ হেবারের বিবরণ : বিশপ হেবার (Bishop Heber) ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা সফর করেন। শহর সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্টভাবে যে বর্ণনামূলক বিবরণ দেন তা এ রকম 'ঢাকা যে নদীর তীরে অবস্থিত তা রেনেল (Rennell) মানচিত্র তৈরি করার পর অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আগে এ নদী ছিল অপ্রশস্ত। কিন্তু এখন, এমনকি শুষ্ক মৌসুমেও কোলকাতার হুগলি নদীর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ঢাকা এখন শুধুমাত্র তার প্রাচীন জাঁকজমকের ধ্বংসাবশেষ। এর ব্যবসা-বাণিজ্য আগের তুলনায় ষাট ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে। এর জাঁকজমকপূর্ণ সব অট্টালিকা, এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ জাহাঙ্গীরের দুর্গ, তাঁর নির্মিত চমৎকার মসজিদ, প্রাচীন নবাবদের বিভিন্ন প্রাসাদ; ওলন্দাজ, ফরাসি ও পর্তুগীজদের ফ্যাক্টরি ও চার্চ এখন ধ্বংস হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছে; ওইসব এলাকা গাছ-পালায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এ জেলায় যে তুলা উৎপন্ন হতো তার প্রায় সব কাঁচা তুলা ইংল্যান্ডে প্রেরণ করা হতো; সহজে যোগাযোগ করা যেতো বলে ঢাকার লোকেরা ইংল্যান্ডের ম্যানুফ্যাকচারারদের বেশি পছন্দ করতো। শহরে এখনও বেশ কিছু আর্মেনিয়ান বসবাস করে, তাদের মধ্যে অনেকে বেশ সম্পদশালী। তাদের একটা চার্চ ও দু'জন পাদরী আছে। বেশ কিছু পর্তুগীজও আছে; তারা গরিব ও মর্যাদাহীন অবস্থায় আছে। গ্রিকদের সংখ্যা অনেক; তারা কর্মঠ ও বুদ্ধিমান বলে পরিচিত। অন্যান্য লোকের চেয়ে তারা ইংরেজদের সাথে বেশি মেলামেশা করে; সরকারের অনেক নিম্নপদে তারা নিয়োজিত আছে। বেসামরিক বা সামরিক চাকরি এবং আশপাশের এলাকায় কিছুসংখ্যক নীলকর ছাড়া ইংরেজদের কেউ নিম্নপদে নিয়োজিত নেই। হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা ৩ লাখ – এটা ঢাকার কালেক্টর মি. মাস্টার (Master) - এর হিসাব। এটা অতিরিক্ত হিসাব নয়, কারণ মি. মাস্টার বলেন যে, শহরে নব্বই হাজারের বেশি গৃহ ও কুটির আছে বলে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন।[১০৬] অন্য এক স্থানে তিনি হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার আনুপাতিক হার উল্লেখ করে বলেন, মোট জনসংখ্যার 'চার ভাগের তিন ভাগ' মুসলমান।[১০৭]

মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে বিশপ হেবার-এর বর্ণনা : ঢাকা শহর ও মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে বিশপ হেবার আরো কিছু বিবরণ দেন। তিনি বলেন 'বিস্তীর্ণ ঢাকা এলাকার তিন ভাগের দু'ভাগ ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ; অনেক এলাকা জনশূন্য ও জঙ্গলে পূর্ণ, কিছু এলাকা আছে মুসলমান নেতাদের দখলে... অনেক মর্যাদাবান মুসলমানের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি – তাদের চেহারা তুলনামূলকভাবে সুন্দর, আচরণ বিশেষ করে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার সময় কমনীয় ও মর্যাদাপূর্ণ। তাদের আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মতো পাকানো গোঁফ; মানুষের ভীড়, হৈ চৈ ও তাদের অনুসারীদের জাঁকজমক কোনো হিন্দুর জাঁকজমক ও ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করে দেয়। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে ভারতের অন্য অধিবাসীদের চেয়ে আমাদের কম পছন্দ করেন, এর অবশ্য কারণ আছে। তবে তাদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা শেখার প্রবণতা খুব বেশি এবং এই প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের মধ্যে ইংরেজদের অনেক প্রথা ও ফ্যাশন গ্রহণের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুকরণ করার একটা অদ্ভুত দৃষ্টান্ত সম্ভবত মীর্জা আশরাফ আলী। তিনি এক লাখ একর জমির জমিদার, তাঁর গৃহটি ধ্বংসপ্রাপ্ত আশ্রমের মতো। তিনি ইংরেজদের টাকার নোটে তাঁর পৈত্রিক পদবী 'করিম খান বাহাদুর' (Kureem Cawn Bahadur) - এর শব্দ-সংক্ষেপ কে.সি.বি স্বাক্ষর করেন। সেনাবাহিনী বা রাষ্ট্রের কোনো চাকরিতে যেসব নিম্নস্তরের মুসলমান যুবকদের উন্নতি করার সুযোগ নেই তারা শিগগির বা দেরিতে হলেও মদের নেশায় ডুবে যাচ্ছে, অথবা ডাকাত ও বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিচ্ছে। যারা ইংরেজদের আচার-আচরণ অনুসরণ করতে আগ্রহী তারা যে সব উচ্চ শ্রেণীর লোক, এমন নয়। এখানে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজি ভাষা শেখার আগ্রহ প্রায় সবার মধ্যেই আছে। আবর্জনাপূর্ণ বাজার ও কুঁড়ে ঘরের মধ্যে আমি পাখি মারার হালকা বন্দুক, খোদাই করা পাত এবং অন্যান্য ইংলিশ পণ্য বা ইংরেজদের অনুকরণীয় পণ্য দেখার আশা করিনি, অথচ তা আমি দেখতে পেয়েছি। এতে স্পষ্ট হয়, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষ ইংরেজদের অনুকরণে কতটা আগ্রহী... ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে, মাসে তা ছাব্বিশ দিন খোলা থাকে; স্কুলে এক হাজারের বেশি ছাত্র লেখাপড়া করে।'[১০৮]

নায়েব নাজিম নবাব শামস-উদ-দৌলা নসরত জঙ্গের উত্তরাধিকারী হন নবাব শামস-উদ-দৌলা। বিশপ হেবার নবাব শামস-উদ-দৌলা সম্পর্কে লেখেন 'এই রাজার তখন আর কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই, এমনকি তাঁকে সরকারি পালকি ব্যবহার করারও অনুমতি দেওয়া হয় না... তাঁকে অবশ্য মাসে ১০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হয়, নিরাপত্তা রক্ষীসহ 'দরবার' রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে; তাঁকে অভিহিত করা হয় 'হাইনেস' তথা সম্মানজনক উপাধিতে। 'পালকি' অবশ্য একটা বিশেষ মর্যাদার প্রতীক; তবে ওই 'পালকি'র বিষয়ে তাঁর ভাই নসরত জঙ্গের নির্দিষ্ট কোনো দাবি ছিলো না। ফলে এই লোকটি (নবাব শামস-উদ-দৌলা) তা প্রায় আশা করতে পারে না। আসলে তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সদয়ভাবে বিবেচনা করা হয়। যুবক বয়সে তাঁর স্বভাব মন্দ ছিলো। তিনি সরকার ও নিজ পরিবারের সাথে কলহ করেন এবং উজির আলীর রক্তক্ষয়ী ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন। এই ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার কারণে তিনি বেশ কয়েকবছর কোলকাতায় বন্দি অবস্থায় ছিলেন। এ সময় তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর দেশের অনেকের চেয়ে বেশি জ্ঞানলাভ করেন। তিনি ইংরেজিতে সুন্দরভাবে কথা বলতে ও লিখতে পারতেন, এমনকি তিনি নিজেকে শেকসপিয়ারের সাহিত্যের একজন সমালোচক বলে দাবি করতেন। মি. মাস্টার (ঢাকার কালেক্টর) আমাকে বলেন যে, তাঁর ছিলো উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু মন। তাঁর বুদ্ধিমত্তার যদি যথার্থ বিকাশ ঘটতো, তাহলে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন। কিন্তু এখন তিনি বৃদ্ধ, হীনবল ও অলস হয়ে পড়েছেন। এশীয় যুবরাজদের মতো তিনি অনেক অমিতাচারে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। সাধ্যমতো জাঁকজমক, পেশাদার নর্তকী বা বাইজী এবং আফিম – এসব অমিতাচারে তিনি আসক্ত হয়ে পড়েন। যে কোনো সমাজকে তা আতঙ্কিত করতে পারে, তাঁর নিম্নপদস্থ লোকদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। এসব অমিতাচার থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন, এশিয়ার যুবরাজরা এসব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াসে প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছে।'[১০৯] শহরে তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ যাতায়াত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে হেবার বলেন 'নবাবের ঘোড়ার গাড়ি আমাদের অতিক্রম করলো গুটিয়ে রাখা যায় এমন ঢাকনাযুক্ত একটা গাড়ি পুরান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– যাকে বলা হয় ল্যানডো (Landau)। গাড়ি টানছিলো চারটি ঘোড়া; একজন কোচওয়ান ও একজন প্যাস্টিলিয়ান (যে ব্যক্তি শকটবাহী ঘোড়াগুলোর একটিতে চড়ে সবগুলোকে চালায়), উভয়ের পোশাক লাল রঙের। কয়েকজন অশ্বারোহী নিরাপত্তারক্ষী ছিলো, তাদের পোশাকও লাল রঙের। তাদের মাথায় ছিলো রুচিহীন উঁচু টুপি, প্রাচীনকালে বোমা নিক্ষেপক সৈনিকরা যে ধরনের টুপি ব্যবহার করতো ঠিক সেই ধরনের। টুপির সামনের দিকে গিলটি করা; তারা ঘোড়ার পিঠে বসে ছিলো অগোছালোভাবে। ভারতের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা কার্যকারিতার দিক থেকে স্পষ্টত বিলীন হয়ে গিয়েছিলো ইউরোপীয় ফ্যাশনকে অবিচক্ষণ ও ত্রুটিপূর্ণভাবে অনুসরণ করায়। পূর্বাঞ্চলের একজন অশ্বারোহী সৈনিকের পাগড়ি ও প্রসারিত পোশাক সত্যি আকর্ষণীয় বস্তু। ঘোড়ার পিঠে পূর্বাঞ্চলের একজন যুবরাজ এবং সাদা পোশাক ও টুপি পরিহিত সারিবদ্ধভাবে অনুসরণকারী পদাতিক সৈন্য – দৃশ্যটি আরো আকর্ষণীয় ও অভিজাতপূর্ণ। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের একজন যুবরাজ জীর্ণ একটা গাড়িতে বসে আছেন এবং তাঁর দেহরক্ষীদের পোশাক কোনো মেলায় খেলা প্রদর্শনকারী অশ্বারোহীর পোশাকের মতো – এটা হাস্যকর ও বিষাদপূর্ণ।'[১১০]

হেবারের বর্ণনায় নিমতলী কুঠি : বিশপ হেবার নিমতলী কুঠিতে (বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর অফিস ও এর আশপাশের এলাকা) তাঁর সফরের বর্ণনা দেন এভাবে : 'শহরের মধ্য দিয়ে আমরা বেশ কিছুটা পথ গাড়িতে যাই, এরপর গাছ-গাছালির সাথে মিশে থাকা কুঁড়েঘরের মধ্যে দিয়ে একটা পুরানো এভিনিউ অতিক্রম করি; অতঃপর পুরাতন ইটের একটা গেট দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। কাছে থেকে স্থানটিকে জঙ্গলের মতো মনে হয় – মাঝখানে একটা বড় গাছ ও আশপাশে ঝোঁপ-ঝাঁড়। চতুর্দিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা। এখানে একদল সেপাই সারিবদ্ধভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানায় – তাদের পোশাক অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং তারা কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। এই সেপাইরা আসলে কোম্পানির স্থানীয় রেজিমেন্টের একটি দল; 'গার্ড অব অনার' হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাদেরকে নবাবের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সামনে একটা সুন্দর ও আকর্ষণীয় প্রবেশ পথ (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আবাসিক বিল্ডিং), একটা উন্মুক্ত গ্যালারি – এখানে সন্ধ্যার সময় সামরিক বাদ্য বা 'নহবত' বাজানো হয়। 'নহবত' হলো সার্বভৌম মর্যাদার প্রতীক। নবাবের সার্বভৌম মর্যাদার দাবি কখনই যথার্থ ছিলো না; কিন্তু সরকার তাঁকে তুষ্ট করে। এখানে ছিল নবাবের নিজস্ব গার্ড; তাদের গায়ে ও মাথায় ছিল উদ্ভট কোট ও টুপি। রূপার দণ্ড হাতে অনেক লোক দাঁড়িয়েছিলো (এটাকে গণ্য করা হতো উচ্চ সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতীক হিসেবে), আর ছিলো দু'জন ছাতা বহনকারী (Toujons) ও দুটো ছাতা। তারা আমাদের ভেতরের দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলো। এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলো সব ধরনের মানুষের জন্য ছোট প্রাঙ্গণ থেকে কিছুটা বড় প্রাঙ্গণ, এর চারপাশে মাঝে মাঝে নিচু অট্টালিকা, সাদা চুনকাম করা ও পরিচ্ছন্নভাবে রক্ষিত, এসব অট্টালিকা ছিলো কারো আশ্রয় দেওয়ার জন্য নয়। ডানদিকে কয়েক পদক্ষেপ সামনে ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় একটা হল; অষ্টভুজ এর আকার, গথিক (Gothic) স্থাপত্যবিষয়ক খিলানের অবলম্বন – এর চতুষ্পার্শ্বে বারান্দা। উঁচু গথিক (Gothic) স্থাপত্যের জানালা কাঠ দিয়ে তৈরি। এই অষ্টভুজের সাথে সংযুক্ত ছিলো একটা বড় গোলটেবিল, লাল কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত। ড্রয়িংরুমের চেয়ার ছিলো মেহগনি কাঠের, দু'টো বড় ও আকর্ষণীয় স্ফীতোদর আয়না – এ আয়নায় কামরা ও আসবাবপত্র সুন্দরভাবে দেখা যেতো। দু'টো সাধারণ কাচের পিলপা, কয়েকজন সম্রাটের ছবির প্রিন্ট। সম্রাট আলেকজান্ডার, লর্ড ওয়েলেসলি ও লর্ড হেস্টিংস এবং ডিউক অব ওয়েলিংটন; সুন্দর দু'টো তৈলচিত্র ছিলো, একটা নবাবের নিজের এবং অপরটি তাঁর ভাই মরহুম নবাবের। এ তৈলচিত্রের শিল্পী হলেন চিমনে (Chimney)। এরমধ্যে জাঁকালো কিন্তু রুচিহীন কিছু ছিলো না – সবকিছুর মধ্যে মর্যাদা ও সম্ভ্রান্তের ছাপ ছিলো।'[১১১]

শামস-উদ-দৌলার পুত্র কমর-উদ-দৌলা এবং সর্বশেষ নবাব গাজী-উদ-দীন হায়দার[১১২] এই মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখেন। নবাব গাজী-উদ-দীন হায়দার ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে মোগলদের জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ প্রাচীন স্মৃতি ঢাকা থেকে চিরতরে বিলীন হয়ে যায়।

ঢাকা সম্পর্কে টেলরের বিবরণ ড. টেলর (Dr. Taylor) ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার স্থান, বিবরণ ও পরিসংখ্যান নিয়ে একটা প্রামানিক গ্রন্থ, 'The Topography and Statistics of Dacca' প্রণয়ন করেন। ওই পুস্তকে সমসাময়িক কালের ঢাকা ও তার জীবনধারা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। শহর সম্পর্কে তিনি লেখেন 'পূর্ব দিকে নিচু পাললিক সমতল ভূমি যা লকিয়া (Luckia) পর্যন্ত বিস্তৃত, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে কিছু এলাকায় জঙ্গল এবং এরমধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মুসলমানদের কবরখানা, ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত বাগান, মসজিদ ও অট্টালিকা আছে... ঢাকার সীমানা দশটি থানার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা ৩৯ বর্গমাইলে বিস্তৃত। কিন্তু সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, শহরটি বিস্তৃত নদীর তীর বরাবর। এখান থেকেই এর রাস্তা, বাজার ও লেন প্রসারিত, যার দূরত্ব লম্বায় চার মাইল ও প্রস্থে প্রায় সোয়া এক মাইল। এর ভেতরদিক একটা সঙ্কীর্ণ খাল বা খাঁড়-এর শাখা দ্বারা সংযুক্ত। দেশীয় শহরগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মতো এটা গড়ে উঠেছে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে। ইটের দালান আছে, আছে কুঁড়েঘর। এসব ঘর একেবারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে এবং সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তা ও গলিপথে তা বিস্তৃত হয়ে আছে। এর দুটো প্রধান রাস্তা প্রায় ডান কোণায় মিলিত হয়েছে। একটা রাস্তা লালবাগ থেকে সঙ্কীর্ণ খালের শাখা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে ওপরের দিকে আরো দু'মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত... অন্য রাস্তাটি গেছে ক্যান্টনমেন্ট (তখন ক্যান্টনমেন্ট ছিল বর্তমান পুরানা পল্টন এলাকায়) ও শহরের উত্তর দিকের শহরতলীর দিকে। রাস্তাটি প্রায় সোয়া এক মাইল লম্বা... ওই দুই রাস্তার সংযোগস্থলে একটা ছোট উন্মুক্ত মাঠ আছে (বর্তমানে এ স্থানে গড়ে উঠেছে ভিক্টোরিয়া এবং পরে বাহাদুর শাহ পার্ক) – উন্মুক্ত এ স্থানটি চার কোণাবিশিষ্ট। মাঝখানে গোলাকার উদ্যান। স্থানটির পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং নদীর তীরে প্রায় আধা মাইল (ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে সদরঘাট এবং তাঁর আশপাশের এলাকা) এলাকা জুড়ে আছে ইংরেজদের ফ্যাক্টরি (বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংক, সাবেক স্টেট ব্যাংক বিল্ডিং), সেন্ট টমাস চার্চ, সরকারি স্কুল, নেটিভ হসপিটাল এবং অধিকাংশ ইউরোপিয়ানদের বাসগৃহ। শহরের পশ্চিম দিকের শেষপ্রান্তে আছে চক বা বাজার এলাকা এবং নদীর পাশ দিয়ে বরাবর একটা রাস্তা আছে। বাজারটি চার কোণাবিশিষ্ট এবং বেশ বড়। এর চারপাশে অনেক মসজিদ ও দোকান আছে... শহরের মধ্যে অনেক রাস্তা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এসব রাস্তা খুবই সঙ্কীর্ণ ও আঁকাবাঁকা। প্রায় দশবছর আগে মি. ওয়ালটারস (Walters) কিছু রাস্তা প্রশস্ত করেন; ওইসব রাস্তা দিয়ে সহজে গাড়ি করে যাতায়াত করা যায়।'[১১৩] 'শহর এলাকায় মাত্র দুটো রাস্তা তৈরি করা হয়েছে – একটি রাস্তা গেছে নারায়ণগঞ্জ এবং অন্য রাস্তাটি গেছে তেজগাঁও থেকে টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত; প্রথম রাস্তাটি আট মাইল এবং শেষোক্ত রাস্তাটি চৌদ্দ মাইল দীর্ঘ।'[১১৪] 'দেশে চাকাবিশিষ্ট যানবাহনের কথা কেউ জানতো না। শহরে দুই চাকার গাড়ির সংখ্যা সম্ভবত ১২টির বেশি ছিল না। ঢাকার কালেক্টর মি. ডগলাস (Douglas) ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে উল্লেখ করেন যে, ঢাকায় ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি প্রবর্তন করে সেই সময় শহরে আসা একদল লোক।'[১১৫]

তৎকালীন ঢাকার জনসংখ্যা : ড. টেলর লেখেন : 'উৎপাদন ও বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ায়, যা স্বাভাবিকভাবে আশঙ্কা করা হয়েছিল, শহরের লোকসংখ্যাও কমে যায়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লোকসংখ্যা ছিল ২ লাখ, কিন্তু ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী তখন লোকসংখ্যা ৬৮ হাজার ৩৮ জনের বেশি নয়। যে হারে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে তারচেয়ে অনেক বেশি হারে দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।'[১১৬] জনসংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে। তখন লোকসংখ্যা ৫১ হাজার ৬৩৬ জন বলে গণনা করা হয়। এই গণনা সম্ভবত সবচেয়ে কম ছিল। কারণ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯ হাজার ২১২ জনে। সেই সময় থেকে জনসংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০ হাজার ৫৪২ জনে।'[১১৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মীয় রীতি ও অনুষ্ঠান : ড. টেলর লেখেন 'শহর এলাকায় দু'জন বুজর্গ পীর আছেন, আর আছেন বহুসংখ্যক ফকির। মহররম ও রমজান অনুষ্ঠানে ফরিকদের মধ্যে অনেকে মাঝে মাঝে ধর্মীয়ভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে মাটির নিচে শুয়ে থাকতো। এই উদ্দেশে কবরের মতো করে গভীর গর্ত খনন করা হতো। ভক্তরা ওই গর্তের মধ্যে অবতরণ করতো। তারা সাথে করে কিছু খাদ্য ও পানি নিয়ে যেতো। কৃচ্ছ্রসাধনার সময় জীবন ধারণের জন্য ওই খাদ্য ও পানি মোটেই যথেষ্ট ছিল না। এই গর্তের উপরে বাঁশ, মাদুর ও মাটি দিয়ে ছাদ বানানো হতো। সামান্য একটু ফাঁক রাখা হতো যেনো বাতাস চলাচল করতে পারে। উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফকিররা এভাবেই থাকতো। মহররম অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হতো হোসেনী দালান থেকে – এটা ছিল একটা প্রসারিত অট্টালিকা, যেখানে বহু লোকের স্থান হতো। 'আশুরা' বা 'দশম দিনের' (Ten day's fast) রোজার সময় এ অট্টালিকার অভ্যন্তরে কৃত্রিম ফুল, স্বচ্ছ বস্ত্র, উট পাখির ডিম, হাসান ও হোসাইনের প্রতিকৃতি রাখা স্থানের উপরে দেওয়াল সাজানো হতো কালো কাপড় দিয়ে; একটা কামরার মধ্যখানে ঝরণা তৈরি করা হতো এবং রাতে অগণিত আলো ও রঙিন মোমবাতি জ্বালানো হতো। একদল প্রশিক্ষিত গায়ক 'মর্সিয়াখানি' বা শোকগাথা ও প্রশংসাগাথা গান গাইতো। তারা পুরো রোজার সময় 'শব-বাইদারী' বা সারারাত জেগে থাকতো। সপ্তম দিনে পাঞ্জা বা উন্মুক্ত হাত প্রদর্শনের দিনে ফুল শোভিত একটা লম্বা লাঠি হাতের ওপর রাখা হতো এবং জরিদার পোশাক পরে একদল লোক বাদ্য বাজিয়ে বিভিন্ন রাস্তায় মিছিল করতো। দশম দিনে বা রোজার শেষ দিনে 'তাবিয়াত' (তাজিয়া) বা দুই শহীদের (হাসান ও হোসাইন) প্রতিকৃতি জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বহন করা হতো শহরের একটা স্থানে এবং সেখানেই তা সমাধিস্থ করা হতো। এই উৎসবের সময় ছেলেরা লাল ও সবুজ রঙের পোশাক পরে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করতো। তাদের হাতে থাকতো পতাকা এবং পানি বা সরবত ভর্তি চামড়ার ব্যাগ। পথচারীকে তারা পানি বা সরবত পান করাতো। খাজা খিজির (সম্ভবত ইলিয়াস নবী)-এর সম্মানে 'বেইরা' (Beirah) উৎসব এ সময় খুব জাঁকজমকের সাথে পালন করা হতো। এ সময় 'নওয়ারা' পালন করা হতো। কিন্তু পরে এ উৎসব পালন কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায় – মুর্শিদাবাদ ও দেশের অন্যান্য শহরের চেয়ে এ উৎসব এখানে কোনোরকম জাঁকজমক ছাড়াই পালন করা হতো। এখানে নদীতে রক্ষাকারী দেবতা 'ভাদুর' (Bhuddur)-এর উপাসনা করা হতো সাধারণভাবে এবং প্রায় প্রতিদিন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোক এ উপাসনা করতো। তবে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানরাই প্রধানত এ উপাসনা করতো। নদীর তীরে পাখি উৎসর্গ করে এবং ফল ও ফুল অর্পণ করে এ দেবতার অনুগ্রহ কামনা করা হতো – মাটির পাত্রে অথবা কুমড়ার খোলে এসব নৈবদ্য পুরে পানিতে ভাসিয়ে দেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতো। মেঘনা নদী বরাবর নিম্নাঞ্চল চট্টগ্রাম পর্যন্ত 'ভাদুর' দেবতার উপাসনা হতো; আমার বিশ্বাস, এ উপাসনা আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

'গত দশ বছরের মধ্যে দেশের এ অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে একটা নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলায় তাদের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফরিদপুরের শরীয়তুল্লাহ এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮ বছর বয়সের সময় মক্কায় হজ করতে যান। দ্বিতীয়বার মক্কায় যাওয়ার পর তিনি ওহাবিদের সংস্পর্শে আসেন এবং সেখানে দীর্ঘ ২০ বছর অবস্থান করে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে দেশে ফেরেন। দেশে ফেরার পর তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করেন এবং বহু মুসলমান তাঁর দলে যোগ দেয়। উপরে যেসব জেলার কথা বলা হয়েছে সেখানকার ৬ ভাগের ১ ভাগ মুসলমান তাঁর দলে যোগ দেয়। শহর এলাকার মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ লোক তাঁর দলে যোগ দেয় বলে ধারণা করা হয়। এ শ্রেণীর লোকদের বলা হতো 'ফারাজী'। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর মৌলবিদের সাথে তাদের পার্থক্য ছিল খুব সামান্য – পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর মৌলবিদের সংখ্যা ছিল অনেক (এরা ছিলেন মৌলবি আবদুল্লাহর শিষ্য), তাঁরাও এখানে বসতি স্থাপন করে। তাঁরা কোরআনের নির্দেশ পালনে কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং কোরআনে অনুমোদন নেই এমন সব অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করেন। মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর পূর্বে নবীগণ যেভাবে মুহররম উৎসব পালন করেন তাঁরা ঠিক সেভাবে ওই উৎসব পালন করেন। বিশেষ করে মুহররম মাসের দশম দিনকে তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র দিন হিসেবে গণ্য করেন। কারণ ওইদিন আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.)-এর পৃথিবীতে আসার দিন। ওইদিন আরশ-কুরসি সৃষ্টি হওয়ার দিন। এ জন্য তাঁরা ওইদিন (১০ মুহররম) এবং তার পরদিন রোজা রাখেন, সারারাত ইবাদত করেন। এদিন নবী গরিবদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করেন, তাঁরাও এই প্রশংসনীয় কাজ করেন এবং শত্রুতা আছে এমন লোকের সাথে সমঝোতামূলক দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে শত্রুতার অবসান ঘটান। কিন্তু এ সময় হাসান ও হোসাইনের শহীদ হওয়ার স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান তাঁরা নিষিদ্ধ করেন এবং ওইসব অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষ্ঠান অবলোকন করাও এড়িয়ে চলেন। শিশু জন্মগ্রহণের প্রথম দিন থেকে ৪০ দিনের মধ্যে পালিত 'পট্টি' (Puttee) ও 'চিল্লা' (Chilla) অনুষ্ঠান তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা অবশ্য 'আকিকা' অনুষ্ঠান পালন করেন – এ অনুষ্ঠান হলো পুত্র সন্তানের জন্য দু'টো ছাগল এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটা ছাগল উৎসর্গ করা। এ অনুষ্ঠানের সময় শিশুর মাথার চুল কামানো হয় এবং চুলের ওজনে পিতা-মাতার সামর্থ্য অনুযায়ী সোনা বা রূপা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়। একইভাবে তাঁরা বিয়ের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতাও পরিত্যাগ করেন।'[১১৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : ড. টেলর আরো লেখেন 'হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিবাদের ঘটনা প্রায় নেই। ওই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্ণ শান্তিতে মিলেমিশে বসবাস করে। এমনকি উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ এক হুকায় তামাক খাওয়ার কুসংস্কারও মানে না।'[১১৯]

ব্রাহ্মণদের অবস্থা : ড. টেলর লেখেন : 'দেশের এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের অনেকে জাতি বিভেদের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে বেশ সফল হয়েছে। জাতিভেদের বৃত্ত থাকার ফলে তারা পূজা-পার্বণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তারা ইচ্ছামতো ধর্মনিরপেক্ষ পেশা, যেমন– দেওয়ান, লেখক, উকিল ইত্যাদি পেশায় যোগদান করতে পারে। শহরের নিম্নশ্রেণীর লোকরা শ্রেণীগতভাবে ব্রাহ্মণদের খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না। কিন্তু কোনো কোনো ব্রাহ্মণদের তারা খুব সম্মান করে, যেমন মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ। জাগতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে 'গোসাই'রা তাদের শিষ্যদের কাছ থেকে যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা পায় – এসব শিষ্যদের মধ্যে আছে তাঁতী, শাঁখারী এবং কৃষ্ণ ভক্তরা।'[১২০]

মহিলাদের অবস্থা : ড. টেলর বলেন, 'দেশের এ অঞ্চলের হিন্দু মহিলাদের নিভৃতে রাখার বিষয়টিকে প্রায় গুরুত্ব দেয়া হয় না। কিন্তু মুসলিম মহিলাদের নিভৃতে রাখার ব্যাপারে কঠোরভাবে দৃষ্টি দেয়া হয়। কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর মুসলমান মহিলাদের বাইরে বেরোতে দেখা যায়; যাদেরকে পুরুষদের মতো কঠোর পরিশ্রম করতে দেখা যায় – বিশেষ করে 'কুট্টি' শ্রেণীর মহিলাদের ধান-গম ভানতে দেখা যায়। তারা ইট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী বহন করে। জেলে ও বৈদ্য সম্প্রদায়ের মহিলাদেরকেও নৌকা বাইতে ও মাছ ধরার কাজে দেখা যায়। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমান মহিলাদের কাপড়ে আবৃত ছোট 'ডুলি' বা 'সেডান' (Sedan)-এ করে শহরে চলাফেরা করতে দেখা যায় – 'ডুলি' বা 'সেডান' বহন করে কয়েকজন বেয়ারা। পালকির ব্যবহার সচরাচর ছিল না। গরু বা ঘোড়ায় টানা দেশীয় গাড়ি ছিল একেবারেই অপরিচিত। দেশীয়দের মধ্যে খুব কম লোকই ঘোড়ায় চড়তো।'[১২১]

মহিলা ও পুরুষদের পোশাক ড. টেলর লেখেন 'প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর নিম্নশ্রেণীর পুরুষ ও মহিলার চেয়ে এখানকার সমশ্রেণীর পুরুষ ও মহিলা উত্তম পোশাক পরিধান করে। অনেককে দুই বা ততোধিক পৃথক কাপড় ছাড়াই দেখা যায়। শহর ছাড়া কেউ চামড়ার জুতা বেশি পরে না। দেশে 'খড়ম' (কাঠের তৈরি) ব্যবহার করতে দেখা যায়; সাধারণত এটা ব্যবহার করা হয় স্যান্ডেল হিসেবে। অনেক 'খড়ম'-এ সামনের ওপরের দিকে খিল জাতীয় কাঠের উঁচু অংশ (বা কাঠের বোতাম), পায়ের পাতা বা গোড়ালি আটকে রাখার জন্য ফিতা ব্যবহার করা হতো – মুসলমানরা চামড়ার পাতলা ফালি, আর হিন্দুরা পাট বা সুতার দড়িকে ফিতা হিসেবে ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতো। হিন্দু ও মুসলমান মহিলারা একই ধরনের পোশাক পরতো – একমাত্র পার্থক্য ছিল কাপড়ের পাড়ের রঙের। এখানকার হিন্দু মহিলারা শঙ্খের তৈরি কবজির অলঙ্কার বা ব্রেসলেট পরে। সাধারণত ওই অলঙ্কারে বাহুর উপরিভাগ ঢাকা থাকে। এসব অলঙ্কার ও রূপার মল (পাদাভরণ) অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে গণ্য করা হয় এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তা এক কন্যা থেকে অন্য কন্যার কাছে হস্তান্তর করা হয়। ব্রেসলেট ও সিঁদুরের দাগ বা কপালে লাল রঙের দাগ থাকলে বুঝতে হবে যে, মহিলার স্বামী জীবিত আছে। বিধবা ও অবিবাহিত মেয়েরা এসব পরতে পারে না। মুসলমান মহিলারা ব্রেসলেট পরে তবে তা লাক্ষা বা সীল করার জন্য গালা, কাঁচ বা রূপার শঙ্খের নয়। হিন্দু ও মুসলমান মহিলারা আর যেসব অলঙ্কার পরে তার মধ্যে আছে চার কোণাবিশিষ্ট প্রতিবিম্বিত কাঁচসহ আংটি, নাক ও কানের ইয়ারিং, গলার হার এবং চুলের জন্য চোখা আকারের অলঙ্কার (এসব চোখার মধ্যে মন্ত্রপূত কবচ বা তাবিজ রাখা হয়)। মধ্যবিত্ত বা উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের অলঙ্কার তৈরি করা হয় সোনা, রূপা এবং ছোট আকারের মুক্তা দিয়ে। গরিব শ্রেণীর মহিলাদের অলঙ্কার তৈরি করা হয় টিন, টিউটেনাগ (Tutenag), দস্তা ও পিতল দিয়ে।'[১২২]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ : একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ, যা ঢাকার জনগণকে বেশ আলোড়িত করে। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে দু'জন বিবরণ দেন – একজন বর্ণনা করেন শহরের সাধারণ উত্তেজনা সম্পর্কে এবং অন্যজন বর্ণনা করেন কিভাবে ওই ঘটনার শুভ সমাপ্তি ঘটে সে সম্পর্কে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্মরণীয় বছরের জুন মাসের একটি দিন – দিনটি ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে সরকারি সৈন্যদের বিদ্রোহের জন্য উল্লেখযোগ্য। একজন বেসামরিক বিচারক বিচারাসন থেকে উঠে বিপদের ঘণ্টা বাজান। অন্যান্য দিনের মতোই হৈ-হুল্লোড় দেখে তিনি বিস্মিত হন এবং তাঁর কল্পনা ব্যাহত হয়। তিনি একটা মিথ্যা চিৎকার শুনতে পান – 'তারা আসছে'। একদল লোক কাছারি থেকে দৌড়ে গিয়ে শহরের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী ভীতসন্ত্রস্ত লোকদের ভীড়ে মিশে গেল। একটা ভীতিকর দিনের দৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখা গেল। কর্মকর্তাদের হতাশাগ্রস্ত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে জনশূন্য অবস্থায় দেখা গেল। তাদের সহকর্মীরা যতো দ্রুত সম্ভব মাথা নিচু করে নিজেদের বাড়িতে চলে গেল... শহরের সচ্ছল ব্যক্তিরা নিজ নিজ বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলো। সাধারণ লোকরা অনিশ্চিত অবস্থার মাঝে এমনভাবে ছোটাছুটি শুরু করলো যে, তা অকল্পনীয়। দলে দলে লোককে এক রাস্তা দিয়ে এসে অন্য রাস্তা দিয়ে চলে যেতে দেখা গেল। শহরের ধনী ব্যক্তিরা তাদের অর্থ-সম্পদ মাটিতে পুঁতে রাখলো... কোম্পানির চাকরিতে যেসব কালো ও সাদা বর্ণের সৈন্য ছিল তারা অনতিবিলম্বে একটা যুদ্ধের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ও ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়লো। অবশ্য স্টেশনে কোনো ইউরোপীয় সৈন্যদল ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীতসন্ত্রস্ত স্থানীয় লোকরা খাদ্যশস্যের দোকান লুঠ করলো এবং ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সব পণ্য কিনে রাখলো। জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেল – সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তিরাও স্মরণ করতে পারলো না যে, অতীতে কখনো জিনিসপত্রের দাম এতো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। যে ভীতিকর পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা ছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সতর্ক হওয়ার জন্য গৃহীত ব্যবস্থার সঙ্কেত।'[১২৩]

ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মি. ব্রেনান্ড (Mr. Brennand) ৩০ জুলাই তাঁর ডায়েরিতে লেখেন – 'অস্ত্র চালাতে সক্ষম এমন ইউরোপীয় ও ইস্ট ইন্ডিয়ান অধিবাসীদের এক বৈঠক হয় কলেজে; প্রায় ৬০ জন লোক ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে দু'টো স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় – একটা পদাতিক এবং অপরটি অশ্বারোহী। স্থির হয়, পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন মেজর স্মিথ এবং অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন লেফটেন্যান্ট হিচিংস (Hitchins)।' ১১ আগস্ট তিনি তাঁর ডায়েরিতে লেখেন – 'আর্মেনিয়ানদের মধ্যে অনেকে কোলকাতা চলে যাচ্ছে। ইউরোপিয়ানরা কারখানাগুলো সুরক্ষার চিন্তা করছে... স্থানীয়রা সাহেবদের উত্তেজনা প্রায় বুঝতে পারছে না বা স্বেচ্ছাসেবী দল 'কাল-পল্টুন' রাতে কেন পাহারা দিচ্ছে তাও বুঝতে পারছে না।' তিনি তাঁর ডায়েরিতে ১৫ আগস্ট লেখেন 'সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, জলপাইগুড়ির লোকরা যদি বিদ্রোহ করে, তাহলে এখানকার সিপাইদের তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করা হবে। কালেক্টরেটে প্রায় ৫০ জন লোক ছিল। পরিকল্পনা করা হয় যে, প্রথমেই তাদের নিরস্ত্র করা হবে এবং অতঃপর লালবাগে গিয়ে সেখানকার লোকদের নিরস্ত্র করা হবে। তাদের কাছে যে বন্দুক আছে তা নিয়ে আসা হবে।' ৩০ আগস্ট তিনি তাঁর ডায়েরিতে লেখেন 'গতকাল ছিল রোববার, মহররমের মহান দিন। অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবকরা সারারাত পাহারা দেয়। শহরটি অস্বাভাবিকভাবে শান্ত ছিল বলে তারা বর্ণনা করে। আগের বছরগুলোতে যে সংখ্যক লোক জমায়েত হতো এ বছর তেমন হয়নি। মাত্র ৫০ জন লোক হোসেনী দালানে জমায়েত হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, মুসলমানরা খুবই ভীত হয়ে পড়েছে।' তিনি ২৬ নভেম্বর তাঁর ডায়েরিতে লেখেন – 'সারা ভারতের ওপর দিয়ে যে ঝড় প্রবাহিত হচ্ছিলো তা এই মাত্র ঢাকার ওপর দিয়ে শুভ অতিক্রম করেছে'... চট্টগ্রাম থেকে অবশ্য অশুভ খবর এসেছে... সন্ধ্যা ৬টার সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ৭৩নং সৈন্যদলের সিপাইদের নিরস্ত্র করা হবে... পরদিন সকালে ৫টার সময় স্বেচ্ছাসেবকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়। রোববার, ২২ তারিখ... নির্দিষ্ট সময়ে কমিশনার, বিচারক, কিছু বেসামরিক ব্যক্তি এবং ২০ থেকে ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত হন। তখনো কিছুটা অন্ধকার ছিল; আমরা সঙ্কেতের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। পরিকল্পনা ছিল ট্রেজারি গার্ডদের নিরস্ত্র করে তাদেরকে স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে সোপর্দ করা। নাবিকরা তখন তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্ত বাহিনী নিয়ে লালবাগে যাবে... সবকিছুই ঠিকমতো চলছিল বলে মনে হয়। ব্রেজারি গার্ডদের নিরস্ত্র করা হয়... ইতোমধ্যে নাবিকরা লালবাগে পৌঁছে দেখতে পায়, সিপাইরা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তারা প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। আমরা তাদের নিরস্ত্র করবো এ বিষয়টি তারা অবহিত আছে বলে দৃশ্যত অনুধাবন করা যায়। সেন্ট্রি তার হাতের বন্দুক তাক করে এবং আমাদের একজনকে হত্যা করে। অন্যরাও তাকে অনুসরণ করে। দক্ষিণ দিকের ভাঙ্গা গেটের কাছ দিয়ে নাবিকরা অগ্রসর হলে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসতে থাকে। বিবি মরিয়মের সমাধির সামনে বন্দুক বসানো হয়, যেন অগ্রযাত্রা থামানো যেতে পারে এবং তারা আমাদের লোকদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। নাবিকরা প্রাসাদের অভ্যন্তরে পৌঁছালে তারা যুগপৎ গুলি করতে থাকে। লেফটেন্যান্ট লিউস (Lewis) তখন নাবিকদের দুর্গ প্রাচীরের ওপরে বাম দিকে পরিচালিত করেন এবং সিপাইদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু হয়। অতঃপর সিপাইদের বেয়নেটের সামনে ধাবিত করা হয়। সিপাইরা তাদের কোয়ার্টারে আশ্রয় নেয়। কিন্তু নাবিকরা তাদের এক অট্টালিকা থেকে অন্য অট্টালিকায় তাড়িত করে। এ সময় মিডশিপম্যান মি. মেজ (Mays) - এর নেতৃত্বে তাঁর অধীন ৮ জন সৈন্য দুর্গ প্রাচীরের ওপর থেকে সিপাইদের বন্দুকের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়; তাদেরকে অবিলম্বে পর্যুদস্ত করা হয়, বন্দুকগুলো অকেজো করা হয় ও দখল করে নেয়া হয় এবং সিপাইরা যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়। দুর্গ প্রাচীরের প্রান্তসীমায় প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনেক সিপাই আত্মরক্ষার্থে স্থাপিত অস্থায়ী প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে যায়। মি. বেনব্রিজ (Bainbridge) ওই অস্থায়ী প্রাচীরের ওপরও আঘাত হানেন। তবে তিনি একজন সিপাইয়ের আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পেছনে সরে আসেন। নাবিকরা পুরোপুরি বিজয় লাভ করে; সিপাইরা পালিয়ে যায় এবং জঙ্গলে গিয়ে আত্মরক্ষা করে – প্রায় ৪০ জন সিপাই নিহত হয়। যারা পালিয়ে যায় তাদের মধ্যে অনেকেই আহত হয়। আমাদের পক্ষে একজন নিহত হয় ও চারজন মারাত্মকভাবে আহত হয়। নাবিকদের সাথে ছিলেন ড. গ্রিন (Dr. Green); তিনি তাঁর উরুতে আঘাত পান।... পলাতক বেশ কয়েকজন সিপাইকে ধরে আনা হয়। এদের মধ্যে ৪ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয় এবং অন্য সবার জন্য একই শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। সোমবার সবকিছু শান্ত হয়ে যায় এবং আমরা আমাদের কাজে ফিরে যাই। মনে হয় কোনো কিছুই ঘটেনি। তবে দেশীয়দের অনেকেই ভয়ে শহর ত্যাগ করে।'[১২৪] ঢাকার অন্য একজন নাগরিক লেখেন 'সবাইকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় এবং ঢাকা বিদ্রোহ এভাবেই শেষ হয়ে যায়। আন্টাঘর ময়দানে এই দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। ঢাকার বাসিন্দারা এই স্থানের দিকে ভীতিকর দৃষ্টিতে তাকাতো। আশপাশের মহল্লা, বাংলাবাজার, শাঁখারীবাজার ও কলতাবাজারের বাসিন্দরা ওই ঘটনা সম্পর্কে অনেক কুসংস্কারপূর্ণ কাহিনী বলতো – কিভাবে মৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিপাহীদের আত্মা ওই রাতে ময়দানে আসতো এবং কিভাবে গোঙানি ও ভীতিকর শব্দ শোনা যেতো তা তারা বর্ণনা করতো। এসব কাহিনী বলতো প্রবীণ লোকেরা এবং আমরা কখনো সন্ধ্যার পর ওই ময়দানের দিকে যেতে সাহস পেতাম না। এভাবেই ঢাকা বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে।'[১২৫] ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কোম্পানির কাছ থেকে ক্রাউন-এর কাছে সরকার হস্তান্তরের ঘোষণা কলেজের সামনে ইংরেজি ও বাংলায় পাঠ করা হয় – ওই স্থানটি পরে ভিক্টোরিয়া পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা হয় (১৯৫৭ সাল থেকে ওই পার্কটি বাহাদুর শাহ পার্ক নামে পরিচিত হয় – অনুবাদক)।

শহরের উন্নয়ন : ব্রিটিশ শাসনের এই সময়ে ঢাকা শহর ও এর জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৮৩০ থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা চলে অব্যাহতভাবে। এ সময়েই বেশকিছু বেসামরিক ইনস্টিটিউশান গড়ে ওঠে। যেমন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি, ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, সরকারি স্কুল ও কলেজ এ সময় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। চারজন কর্মকর্তা ওয়াল্টারস (Walters), টেলর (Taylor), গ্রান্ট (Grant) ও স্কিনার (Skinner) - এর প্রচেষ্টায় এসব উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি : ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভিত্তি স্থাপন করেন আসলে মি. ওয়াল্টারস। এই ইনস্টিটিউশনের মূল ক্ষমতা ছিল ঢাকা কমিটির ওপর এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে এই কমিটির ওপর মি. ওয়াল্টারস-এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। দেখা যায় যে, শহরের উন্নয়নের জন্য সরকার কিছু অর্থ বরাদ্দ করে। মি. ওয়াল্টারস শহরের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য এ অর্থ খরচ করেন, প্রতি মাসে প্রায় ১৬শ' টাকা করে। তিনি চকবাজারেরও উন্নয়ন করেন – এখানকার রাস্তা চওড়া করা হয় এবং সোয়ারিঘাট থেকে বড় কামানটি এনে এই বাজারের কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়, যা এখন সদরঘাটে আছে। মি. স্কিনারের সময় ঢাকা কমিটি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে সম্প্রসারিত হয়। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট। ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর এবং ঢাকার কালেক্টর এর প্রথম চেয়ারম্যান হন। এরপর গঠিত হয় স্থানীয় বোর্ডগুলো।

ঢাকার বর্তমান নবাবের পরিবার : শহরের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো পানির পাইপ সংযোগ ও রাস্তায় বিজলী বাতির ব্যবস্থা করা। এই উভয় কাজের সাথে ঢাকার বর্তমান নবাব সরাসরি জড়িত ছিলেন – তাঁর বদান্যতা ও উদারতার জন্য এ শহর চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে। এই পরিবারের সাথে প্রদেশের প্রাচীন মুসলমান শাসকদের কোনো সম্পর্ক নেই। এরা হলেন কাশ্মিরী পরিবার খাজা আবদুল হাকিমের উত্তরাধিকারী – খাজা আবদুল হাকিম সিলেটে বসতি স্থাপন করেন এবং ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসার মাধ্যমে এই পরিবারের সদস্যরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথেষ্ট সম্পদ অর্জন করেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন ঢাকার এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিণত হন – এই ব্যক্তিকে ব্রিটিশ সরকার নবাব উপাধি দেন। এই পরিবারের সদস্যরা ছিলেন অতিশয় দানশীল এবং এলাকার জনসাধারণ তাঁদের গভীরভাবে সম্মান করতো। জনসাধারণের ওপরও তাঁদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। সে কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নবাব উপাধি দেন। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে তাঁরা ছিলেন ঢাকার মুসলমানদের স্বীকৃত নেতা – উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতার অগ্রগতিতে, বিশেষ করে মুসলিম লীগের সৃষ্টি ও এর প্রসারে তাঁরা সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।[১২৬]

খাজা আবদুল হাকিমের এক ভাই মৌলবি আবদুল্লাহ ঢাকায় আসেন এবং তাঁর থেকেই বর্তমান নবাব পরিবারের উৎপত্তি। তাঁর পৌত্র খাজা আলিমুল্লাহ ফরাসিদের ফ্যাক্টরি ক্রয় করেন ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে।[১২৭] তাঁর পুত্র খাজা আবদুল গনি পৈতৃক নবাব উপাধি ছাড়াও 'নাইটহুড' সম্মানসূচক উপাধি পান।[১২৮] তিনি শহরে পানির পাইপ সংযোগের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করেন – এই পানির পাইপ সংযোগের ভিত্তি স্থাপন করেন লর্ড নর্থব্রুক, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। এই দানের পরিমাণ পরে আড়াই লাখ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব কেসিএসআই (KCSI) উপাধি পাওয়ার পর ২ লাখ টাকা দান করেন এবং পরে তিনি আরো ২ লাখ টাকা দান করেন ঢাকায় বিজলী বাতির ব্যবস্থার জন্য। তাঁদের আবাসিক প্রাসাদের নাম আহসান মঞ্জিল। নবাব স্যার আহসানউল্লাহর নামে ওই প্রাসাদের নামকরণ করা হয়। নবাব আহসানউল্লাহ হলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহর পিতা এবং ঢাকার বর্তমান নবাব বাহাদুর নবাব হাবীবুল্লাহর পিতামহ।

শহরে শিক্ষার উন্নয়ন : এই সময়ে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন সাধিত হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে। এর সাথে ড. টেলরের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি জনশিক্ষার স্থানীয় কমিটিগুলোকে সংগঠিত করেন। ঢাকায় ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের দায়িত্ব এই কমিটিগুলোর। তাঁকে সহায়তা করেন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মি. গ্রান্ট। ঢাকায় প্রথম ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। এই স্কুলটি গড়ে তোলা হয় ইংরেজদের ফ্যাক্টরি এলাকায় – ওই স্থানটি এখন স্টেট ব্যাংকের দখলে (বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা বিল্ডিং)। স্থানীয় কমিটি অতি শিগগিরই ওই স্কুলটিকে কলেজে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে চাঁদা উঠানো হয় এবং কলেজ বিল্ডিয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কোলকাতার বিশপ, ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে। ওই বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে। তবে কলেজে ক্লাস শুরু হয় একই বছরের জুলাই মাস থেকে। ড. টি এ ওয়াইজ (Dr. T A Wise) ছিলেন ঢাকার সিভিল সার্জন – তিনি এই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা : মিটফোর্ড হসপিটাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ মে। রবার্ট মিটফোর্ড (Robert Mitford) ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার কালেক্টর ছিলেন। তিনি ১ লাখ ৬৬ হাজার টাকার একটা দাতব্য তহবিল উইল করে যান। ঐ অর্থ দিয়ে হাসপাতালটি নির্মাণ করা হয়। নবাব আহসানউল্লাহ বাহাদুর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে লেডি ডাফরিন (Lady Dufferin) এর সফর উপলক্ষে তাঁর সম্মানে ডাফরিন লেডি হসপিটাল নির্মাণের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করেন। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেললাইন ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে চালু হয় এবং ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তা ময়মনসিংহ পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। নারায়ণগঞ্জ ও গোয়ালন্দের মধ্যে নিয়মিত স্টিমার সার্ভিস চালু হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে।

শহরের বিস্তৃতি : ব্রিটিশ যুগের প্রথম দিকে শহরের পরিধি কমে আসলেও ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ইসলামপুর, তাঁতীবাজার, কামারনগর, গোয়ালনগর ও রায়সাহেব বাজারের উত্তরাংশ সে সময় নিচু জমি ছিল। এসব এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটি আস্তে আস্তে মাটি ভরাট করে। বর্তমান কোর্ট বিল্ডিং গড়ে তোলা হয় একটা বড় গর্ত ভরাট করে। ওই গর্তটি ছিল স্টেট ব্যাংক বিল্ডিং (বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা বিল্ডিং)-এর উত্তর পাশে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে ওয়ারী এলাকার জমি (সব খাস জমি) ইজারা দেয়া হয় এবং শিগগিরই সবাই দখলে নেয়। পাঁচ বছরের মধ্যে ওই স্থানে সরকারি কর্মকর্তাদের কলোনি গড়ে ওঠে। খালের ওপর ঝুলানো ব্রিজের পূর্বদিকে এবং পোস্তগোলার উত্তর পাশে গেন্ডারিয়া এলাকায় একইভাবে ভদ্রলোকদের কলোনি হিসেবে শহরের সাথে সংযুক্ত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এটা সম্পন্ন হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ. ঢাকা : পূর্ববাংলা ও আসামের রাজধানী

(ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয় পর্ব ১৯০৫ থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

বাংলা ভাগের প্রেক্ষাপট : ভাইসরয় হিসেবে লর্ড কার্জনের (Lord Curzon) ভারতে আগমনের পর উপমহাদেশের রাজনৈতিক জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সংস্কার এবং তা দ্রুত কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ স্বীয় মতে দৃঢ় ও অনমনীয় রাজনীতিক বিশেষ করে হিন্দু রাজনীতিকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। তাঁর সব সংস্কার কর্মকাণ্ডের মধ্যে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বাংলা ভাগ বাঙালিদের ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদের ওপর সরাসরি আঘাত হানে – বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির স্থবির অবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও যোগ্যতা প্রতিষ্ঠার সৎ উদ্দেশ্য থেকেই তিনি তা করে থাকতে পারেন। নিঃসন্দেহে এর ফল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর, যাদের প্রায় সবাই হিন্দু, কায়েমী স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে – তারা চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য পেশায় সমগ্র প্রেসিডেন্সিতে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করছিল। তারা মনে করে, পূর্ববাংলা ও আসামকে নিয়ে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করে তাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে তারা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিল তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। অপরপক্ষে, নতুন এই প্রদেশে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা প্রথমবারের মতো অনুভব করে যে, বাংলা ভাগ তাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ নিয়ে আসবে। মনে হয়, ব্রিটিশ সরকার হঠাৎ করে তাদের ভুল বুঝতে পারে যে, এই এলাকা ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অবহেলা করা হয়েছে এবং এখন তারা তাদের ভুলের সংশোধন করতে চাচ্ছে। ভেতরের উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক না কেন, বাংলা ভাগ থেকে ঢাকা ও মুসলমানরা নিঃসন্দেহে লাভবান হবে। লর্ড কার্জন মুসলমান ভদ্রলোক ও রাজনীতিক নবাব স্যার সলিমুল্লাহর অতিথি হিসেবে তাঁর রাজকীয় বাসস্থান 'আহসান মঞ্জিল'-এ অবস্থান করেন। তিনি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি নির্জন এলাকায় কার্জন হলের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই জঙ্গলের মধ্যেই অতি শিগগির ঢাকার নতুন শহর গড়ে উঠবে। বর্তমানে ওই স্থানেই রমনা এলাকা গড়ে উঠেছে।

বাংলা ভাগের রাজনৈতিক ফলাফল : বাংলা ভাগের মিশ্র আশীর্বাদ হিন্দু ও মুসলমানরা ভিন্নভাবে গ্রহণ করে। হিন্দুদের কাছে এটা তাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। মুসলমানদের কাছে তা তাদের উন্নয়নের সুপ্ত আশাকে জোরালো ও রাজনৈতিক অগ্রগতির পথকে আলোকিত করে। হিন্দুরা তাৎক্ষণিকভাবে বাংলা ভাগকে প্রত্যাখ্যান করে। এর বিরোধিতায় তারা তাদের জনগণকে সংগঠিত করে এবং তা রদ করতে প্রয়াস চালায়। এর ফলে স্বদেশী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলন, বিভিন্ন বিপ্লবী দল ও জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ঢাকা প্রত্যক্ষ করে 'অনুশীলন সমিতি'র বর্ধিত কার্যকলাপ। যা রাজদ্রোহ কমিটির (Sedition Committee) রিপোর্টে (১৯১৮) দেখতে পাওয়া যায়। মুসলমানরা যাত্রা শুরু করে ভিন্ন পথে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে অভিজ্ঞ নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মৃত্যুর পর তাঁর ব্রিটিশ তোষণনীতি পরিহার করার জন্য নবপ্রজন্মের যুবকরা গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে। মুসলিম দেশগুলোর আন্তর্জাতিক রাজনীতিও তাদেরকে নতুন চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে – এসব চিন্তা-চেতনা ব্রিটিশদের অনুকূলে ছিল না।[২৯] এ সময় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বাইরে ভিন্ন একটা রাজনৈতিক দলের দাবি ছিল। কিন্তু অতীতের বিভিন্ন ঘটনার ভীতি – যেসব ঘটনার ফলে সংঘটিত হয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ – তাদের মনকে তাড়িত করে। এ সময় বাংলা ভাগ মুসলমানদের কাছে এমন আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দেয় যা তারা চায়নি; তারা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। লর্ড কার্জন ঢাকা সফরকালে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুরের সাথে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে পরবর্তীকালের ঘটনাগুলো উপমহাদেশের ভবিষ্যতের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব বাহাদুর মুসলিম নেতৃবৃন্দকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান এবং এই শহরেই গঠিত হয় রাজনৈতিক দল অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ। রাজনৈতিক সম্মেলনের ওই স্থানটি ছিল নবাবের প্রশস্ত উদ্যান, যা শাহবাগ নামে পরিচিত। দলের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নবাব ভিকার-উল মুলক।

ঢাকা নতুন রাজধানী ঢাকা আবার রাজধানী শহর হয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর। বেমফিল্ড ফুলার (Bampfylde Fuller) নিযুক্ত হন প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর। অতঃপর লেফটেন্যান্ট গভর্নর হন ল্যান্সলট হেয়ার (Lancelot Haire)। পুরো এ সময়ে ঢাকায় বিস্ময়কর পরবর্তন ঘটে। সমকালীন লেখক মি. ব্রাডলি বার্ট (Bradley Birt) লেখেন 'এর মধ্যেও নতুনত্বের মধ্যে চমকপ্রদ, সময়ের বিবর্তনে ধূসর ইটের বিপরীতে লাল ইট দিয়ে একটা আধুনিক শহর গড়ে উঠতে শুরু করলো। কিন্তু এটা ছিল শুরু এবং একদিন তার আকার কেমন দাঁড়াবে তা শুরু দেখে কেবল অস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। তবু অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে অস্থায়ী গভর্নমেন্ট হাউজ গড়ে উঠেছে – প্রাচীন এই শহরে নবজীবনের যে প্রত্যুষের সূচনা হয়েছে এই গভর্নমেন্ট হাউজ হলো তার কেন্দ্র ও প্রতীক। স্থায়ী গভর্নমেন্ট হাউজ পরে নির্মাণ করা হবে – রাজকীয় ওই অট্টালিকা হবে নতুন রাজধানীর জন্য উপযুক্ত। ওই অট্টালিকা থেকে রেসকোর্স দেখা যায়; রেসকোর্সের পাশেই আছে একটা প্রাচীন মসজিদ ও হাজী খাজা শাহবাজের সমাধি – হাজী শাহবাজ ছিলেন শায়েস্তা খানের সময়ে ঢাকার একজন খ্যাতিমান ব্যবসায়ী। নতুন সরকার গড়ে ওঠায় আগত সামরিক কর্মকর্তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসস্থানের জন্য নতুন অট্টালিকা নির্মাণ করা হচ্ছে – প্রাচীন এ শহরে নতুন নির্মিত অট্টালিকায় আধুনিকতার ছাপ দেয়া হচ্ছে। গণপূর্ত বিভাগ নির্মিত ২০ শতকের বেগুনি-লাল রঙের প্রাসাদগুলোর সাথে মসজিদের মর্যাদাপূর্ণ গম্বুজ ও মিনার এবং অতীতকালের প্রাসাদের বিস্ময়কর বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।'[১৩০] ঢাকার ব্যাপ্টিস্ট মিশনের সমসাময়িক অপর একজন মি. হ্যারল্ড ব্রিজেস (Mr. Harold Bridges) ওই পরিবর্তন সম্পর্কে লেখেন 'রমনায় নতুন ও অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটা শহরতলী গড়ে উঠেছে। এটা যথার্থই শহরতলীর উদ্যানে পরিণত হয়েছে – ওই উদ্যানকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অনেক বড় বড় ও মনোরম অট্টালিকা। সরকারি অফিস ও কর্মকর্তাদের বাসস্থানের জন্য ওইসব অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। এসব বিল্ডিং-এর অনেকগুলো এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবহার করছে – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। বড় বড় সরকারি বিল্ডিং নির্মাণ পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে ঢাকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা পুনরায় সংগঠিত করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। কিন্তু পরিকল্পনাটি যে কারণেই হোক না কেন ব্যর্থ হয় এবং পরে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে নর্দমার আবর্জনা ভূগর্ভ দিয়ে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়। রমনা এলাকায় বিল্ডিং তৈরি হওয়ার পর বাংলাবাজার এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী প্রায় সব ইউরোপীয়রা সেখান থেকে চলে আসে এবং শহরতলীর প্রশস্ত উদ্যান এলাকার আকর্ষণীয় বাঙলোগুলো দখল করে নেয়।'[১৩১] এ সময় যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিং নির্মাণ করা হয় তার মধ্যে আছে কার্জন হল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখা), ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেল (এখন ফজলুল হক মুসলিম হল), ঢাকা হল, গভর্নমেন্ট হাউজ (ঢাকা হাইকোর্ট – এখন তা পুরান হাইকোর্ট), সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অংশ ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ), প্রেস বিল্ডিং (বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ), বর্ধমান হাউজ (বর্তমানে বাংলা একাডেমীর পুরান ভবন) এবং রমনা রেস্ট হাউজ।

বাংলা ভাগ রদ : ঢাকার উন্নয়নের ধীরগতির প্রেক্ষাপটে এই অধিকতর দ্রুত উন্নয়ন কার্যক্রম ছিল একটা হুলস্থূল ব্যাপার। এসব বিল্ডিং নির্মাণ সম্পূর্ণ এবং বিল্ডিং-এর কামরায় কাজ শুরু হওয়ার আগেই ব্রিটিশ সরকার বার বার নিশ্চয়তা দেয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাগ রদ করার ঘোষণা দেয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে মান্যবর পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করেন, 'এখন থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লী, কোলকাতা নয়। বাংলা ভাগ – যা তিক্ত বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছে – রদ করা হবে। একটা গভর্নর-ইন-কাউন্সিলের অধীন বাংলা হবে একটা প্রদেশ। বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে একটা নতুন প্রদেশ গঠন করা হবে। আসাম পুনরায় থাকবে একজন চিফ কমিশনারের অধীনে।'[১৩২] এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে ঢাকা পুনরায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলা শহরে রূপান্তরিত হয়। বাংলা ভাগ রদের কারণে ঢাকার মুসলমান জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। কিন্তু তাদের স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করতে তারা এখনো প্রস্তুত হতে পারেনি। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর জিসিআইই (GCIE) পদবি পাওয়ায় নিশ্চুপ হয়ে যান। ঢাকার প্রবীণ লোকরা বাংলা ভাগ রদকে অভিশাপ হিসেবে গণ্য করেন। স্থানীয়ভাবে কথিত আছে যে, দরবেশ ও ধার্মিক লোকদের প্রাচীন কবরের ওপর রমনায় বিল্ডিং তৈরি করার জন্য অভিশাপ নেমে আসে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছ. ঢাকা : ব্রিটিশদের অধীন

(তৃতীয় পর্ব ১৯১২ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

বাংলা ভাগ রদের বিকল্প ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge) মুসলমানদের শান্ত করার জন্য ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি ঢাকায় আসেন। মুসলমানরা এই সুযোগকে কাজে লাগায় এবং অন্য একটা দাবি উত্থাপন করে। উল্লেখিত আছে – 'ভাইসরয়ের (লর্ড হার্ডিঞ্জ) উদ্দেশ্যে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি ঢাকায় প্রদত্ত ভাষণে পূর্ববাংলা ও আসামের বেশ কয়েকজন মুসলমান প্রতিনিধি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা বিভিন্ন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সুযোগ গ্রহণ করেনি। বাংলা ভাগ সংশোধনের ফলে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হবে কিনা এই মর্মে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। উত্তরে লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেন, ভারত সরকার পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করেছে মুসলমানদের সত্যিকার মুক্তির উপায় হলো শিক্ষা; ভারত সরকার অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে সুপারিশ করবে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি একটি ঘোষণা প্রকাশ করা হয়; ওই ঘোষণায় ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভারত সরকারের সুপারিশ করার সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়।'[১৩৩]

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্ভবত সরকারই উত্থাপন করে। কিন্তু এ নিয়ে যে বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয় তা থেকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক বিষয় জানা যায়। কোলকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন ১৯১৭-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে যে প্রশ্নমালা তৈরি করে তা সংরক্ষিত আছে। এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব এ কে ফজলুল হক উল্লেখ করেন 'বাংলা ভাগ রদ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তা তাদের মন থেকে দূর করার জন্য এটা একটা সুবিধা প্রদান বলে প্রথমেই মনে হয়।'[১৩৪] একই ধরনের অনুভূতি ব্যক্ত করে জনাব এএফএম আবদুল আলী বলেন, 'সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পকেট সংস্করণ ঢাকায় দিয়ে পূর্ববাংলার মুসলমানদের পুরস্কৃত করা হবে যেন তারা বিনীতভাবে বাংলা ভাগ রদ মেনে নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা যতোদূর সম্ভব বাড়াতে হবে। পুরোপুরি একটা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় সঠিক পদক্ষেপ; তবে এ রকম বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববাংলার মুসলমানদের প্রায় কোনো উপকারে আসবে না। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় সুবিদিত গরীব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের জন্য একটা বিলাসিতা মাত্র। আমার মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আবাসিক এবং একই সাথে এফিলিয়েটেড বিশ্ববিদ্যালয় হতে হবে। পূর্ববাংলার এমনকি আসামের সব কলেজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েশন পাওয়ার অনুমতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে হবে।'[১৩৫] এই বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয় ঢাকার মুসলমান প্রতিনিধিদলের আবেদনপত্রে : 'এটা সুবিদিত যে, বাংলা ভাগের সময় থেকে পূর্ববাংলা অবহেলিত এলাকা, আর মুসলমানরা হলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এ বিষয়টা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বাংলা ভাগের সময় থেকে পূর্ববাংলা ও তার জনগণের প্রয়োজনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সরকার আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালায়... সে কারণে বাংলা ভাগ রদকে বিশেষ করে মুসলমান জনগোষ্ঠি অত্যন্ত সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে। বাংলা ভাগের পর মুসলমানদের শিক্ষার সমস্যাটি সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং এমন গুরুত্ব প্রদানই যথার্থ ছিল। সে কারণে মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করে যে, বাংলা ভাগ রদ হওয়ার পর তারা পুরান অবস্থায় ফিরে যাবে এবং তাদেরকে পুনরায় পশ্চাতে ফেলে দেওয়া হবে... এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নটি শুধু মুসলমানদের প্রশ্ন নয়, এই বিষয়টি পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের শিক্ষার সমস্যার সাথে গভীরভাবে জড়িত... বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা সম্পর্কে বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা শুধু ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে এটা পূর্ব বাংলার জনমতের বিপরীত। বলা হয় যে, এর ফল সবাই ভোগ করবে – শিক্ষার জন্য যারা ঢাকায় আসতে পারবে তারাই এর সুযোগ পাবে, এমন নয়। যাদের কল্যাণ সাধন বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য অর্জনে এমনকি পূর্ববাংলা প্রদেশের বড় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েও একে নিজের প্রয়োজনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে।'[১৩৬]

মুসলমানদের এই মতামতের বিপরীতে শ্রীষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায় হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গী উল্লেখ করা যেতে পারে 'প্রথমেই আমি আপনাদের বলতে চাই যে, ঢাকায় বা বাংলা প্রেসিডেন্সীর অন্য কোনো স্থানে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণার আমি প্রবল বিরোধী। কারণ একটা পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ হলো একটা পৃথক নিয়ন্ত্রণ এজেন্সির প্রতিষ্ঠা। একটা পৃথক নিয়ন্ত্রণ এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করা হলে রাজনৈতিক দিক থেকে তার ফল হবে খুবই ভয়াবহ। এর অর্থ হলো ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদের অনুভূতিতে বাধা দেওয়া। এই অনুভূতি জনগণের কল্যাণের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে তা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। বাংলা ভাগ ইস্যুতে আমি যে বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলাম, এ বিষয়েও আমি সেই অবস্থান নিয়েছি।'[১৩৭] ঢাকার হিন্দুদের এই ধরনের মনোভাব প্রকাশ পায় ভিন্ন ভাষায়; তারা 'ঢাকার জনগণে'র পক্ষে এক আবেদন পত্রে বলে 'আমাদের মতে,একটা নতুন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার জন্য বার লাখ টাকা খরচ না করে – যার অর্থ হলো আবর্তক ব্যয়সাপেক্ষ প্রশাসন – ওই অর্থ শহরে বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে যথার্থভাবে ব্যয় করা যেতে পারে... ওইসব শিক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠান যদি অনুমোদন করা হয় তাহলে বর্তমান কোলকাতা ইউনিভার্সিটির অধীন এক যুগ বা তার অধিককাল ঢাকা এর ব্যয়ভার সুন্দরভাবে বহন করতে পারবে।'[১৩৮]

ঢাকায় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এসব জবাবের মধ্যে ঢাকার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এরপর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যা ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্যিকার কাজের কেন্দ্রে পরিণত হয়। রমনা এলাকায় নতুন নির্মিত প্রায় সব বিল্ডিং বিশ্ববিদ্যালয় ও এর শিক্ষক কর্মকর্তার নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়। একাজ শুরু হয় শান্তিপূর্ণভাবে। এ বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার পর হিন্দুরাই বেশি লাভবান হয়। মুসলমানদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগ লাভ করে। এমনকি ছাত্রদের মধ্যেও ওই পার্থক্য ছিলো ব্যাপকভাবে। মুসলমান ছাত্রদের চেয়ে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা ছিলো অনেক বেশি। এ অবস্থা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে যে বাদানুবাদ হয়, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সেই মনোমালিন্য সব সময়ই ছিলো এবং উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে তা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা লাভ করে। মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে মুসলমানদের অধিকারের দাবি সোচ্চার হলে জনগণের রাজনৈতিক ভারসাম্য উল্টে যায়। এই দাবির বিষয়ে হিন্দুদের ক্রমাগত বিরোধিতা মুসলমানদের স্তিমিত চেতনাকে উজ্জীবিত করে। এর ফলে, একদিকে মুসলমানরা যেমন তাদের সাধারণ স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে উজ্জীবিত হয় তেমনি অন্যদিকে সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় – যার প্রকাশ ঘটে হিন্দু-মুসলমান দাবি ও হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি উদাসীনতা এবং তাদের মধ্যেকার সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হওয়ার মধ্যে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঢাকা হয়ে ওঠে দাঙ্গার প্রধান কেন্দ্র। এ ধরনের প্রথম ঘটনা ঘটে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু উৎসব জন্মাস্টমীর সময় – একটা ছেলের কলা বিক্রয় করার মতো অস্পষ্ট ঘটনা নিয়ে ওই ঘটনা ঘটে। এই দাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও অনুপ্রবেশ করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্ররাও পরস্পরের বিরুদ্ধে মারামারি করে। এখনও প্রতি বছর শহীদ নজির-এর স্মৃতি স্মরণ করে 'শহীদ নজির দিন' পালন করা হয় – ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের এক দাঙ্গায় নজির বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শহীদ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঢাকায় জাপানীদের আক্রমণের আশংকা করা হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে ওই বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। তবে, অন্যান্য সমস্যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রথমে শুরু হয় কালোবাজারী এবং পরে দেখা দেয় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায়ও এই দুভিক্ষ দেখা দেয় এবং দলে দলে গ্রামের মানুষ শহরে এসে ভীড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমায়। ফলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে। গরিব লোকেরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনাহার ও মৃত্যু শহরে সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রেঁস্তোরা ও হোটেল খোলা থাকতো, যারা কিনতে পারতো তাদের জন্য সেখানে খাদ্যের কমতি ছিলো না। দরিদ্ররাই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়।

শহরের বিস্তৃতি : অন্যদিক থেকে ঢাকা লাভবান হয়। যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ঢাকা এয়ারপোর্ট (পুরাতন এয়ারপোর্ট) নির্মাণ করা হয়। ব্রিটিশ ও মার্কিনীদের জন্য সামরিক হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। আহত লোকদের প্রথম বর্তমান ফজলুল হক মুসলিম হলে রাখা হতো, পরে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তাদেরকে ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং-এর পশ্চিম অংশে নিয়ে যাওয়া হতো – ওই অংশটি এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের আওতাধীন। ব্রিটিশ শাসনের এই সময় বেশ কিছু নতুন এলাকার উন্নয়ন ঘটে; এরমধ্যে আছে পুরান পল্টন, শান্তিনগর ও সেগুনবাগিচা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ. আধুনিক ঢাকা

পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিলো উপমহাদেশের জনগণের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। একদিকে জাপানিদের প্রাথমিক বিজয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আধুনিক পন্থায় প্রাচ্য ঐক্যবদ্ধ হলে পাশ্চাত্যের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারে; অন্যদিকে পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধকে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে বাংলার জনগণ সাদরে গ্রহণ করে এবং এর ফলে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নিজেদের স্বার্থে যুদ্ধের চেতনায় তারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও জনগণের মনোভাব বুঝতে পারে। যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাগুলো অতি দ্রুত ঘটতে থাকে; পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্রিটিশ প্রশাসন ব্যর্থ হয়। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সৈন্যরা পরিস্থিতিকে আরো বিপজ্জনক করে তোলে। চারদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা জোরেসোরে আলোচিত হতে থাকে। ব্রিটিশদের অবশ্যই চলে যেতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশদের উত্তরাধিকারী কে হবে – হিন্দুরা না মুসলমানরা? যুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক ধারা ছিলো অত্যন্ত স্পষ্ট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ছিলো দু'টি প্রধান শক্তি এবং তাদের লক্ষ্য ছিলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাদের সমর্থনকারীরা ছিলো একই রকম দৃঢ় ও অনমনীয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এবং নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সংগ্রাম করা। জনগণের মাঝে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ব্যাপকভাবে, বেসামরিক প্রশাসন প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা দেখা দেয়। সৈনিক ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল সম্যকভাবে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার ও দু'টো রাজনৈতিক দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সৌভাগ্যবশত তারা সমঝোতামূলক প্রয়াসে সম্মত হয়। এই প্রথম বারের মতো ইতিহাস প্রত্যক্ষ করে যে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্রিটিশদের কাছ থেকে উপমহাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল শান্তিপূর্ণভাবে। একটা নতুন দেশ পাকিস্তান সৃষ্টি হলো ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট তারিখে।

ঢাকা : পুনরায় রাজধানী : ঢাকা আবার তার সাধারণ অবস্থা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে রূপান্তরিত হলো। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট কার্জন হলে এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়; ওই অনুষ্ঠানে খাজা নাজিমউদ্দিন স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ঢাকা শহর প্রত্যক্ষ করে স্বাধীনতা, সুখ ও সমৃদ্ধির জগতে নব জন্ম। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে প্রবাহিত হয় নতুন বাতাস – রাস্তায় নতুন মুখের আনাগোনা বেড়ে যায়। বাস, লরি ও ট্যাক্সির শব্দে রাস্তার নীরবতা ভঙ্গ হয়। রমনার নীরবতা জীবনের স্পন্দনকে স্বাগত জানায়। বিশ্রাম নেওয়ার ও ঘুরে বেড়ানোর শান্ত শহর আকস্মিকভাবে নতুন কর্মকর্তা ও তাদের অধীনস্ত লোকদের আগমনে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় পরিবেশের প্রাচীন ঢাকা নতুন রাজধানীকে প্রত্যক্ষ করার জন্য জেগে উঠলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরে সূচিত পরিবর্তন : শহরে পরিবর্তন ঘটলো ব্যাপকভাবে – গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও জাতিগত ক্ষেত্রে। বিভিন্ন শ্রেণীর জনসংখ্যা বেড়ে গেলো। প্রবীণ লোকদের অধিকাংশই উচ্চ হিন্দু সম্প্রদায়ের, ঢাকার রাস্তায় তাদের আর দেখা গেলো না – তারা তাদের পছন্দের দেশ ভারতে চলে গেলো। ভারত থেকে উচ্ছেদকৃত হাজার হাজার মুসলমান শহরে এসে ভীড় জমালো – রাস্তা, বাড়ি ও শহরের বিভিন্ন স্থানে তারা আশ্রয় নিলো। বাঙ্গালি, বিহারী, গুজরাটি, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবি, সিন্ধী, পাঠান–. বিভিন্ন ধরনের চেহারা ও পোশাক পরিহিত ও ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষার লোককে ঢাকার রাস্তায় দেখা গেলো। আশ্রয় ও পুনর্বাসনের আশায় এসব লোককে হতবুদ্ধি অবস্থায় দেখা গেলো। নিস্তেজ পরিবেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। একমাত্র মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি তাদের মনে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল। জনগণের সাধারণ মৈত্রী বন্ধন হয়ে উঠলো ইসলামী চেতনা ও অতীতের ঐতিহ্য – এদের প্রায় সবাই তাদের মূল বাসস্থানকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছে এবং পাকিস্তানে নতুন আবাসভূমি গড়ে তুলতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঢাকার বিস্তৃতি : মুসলিম বিশ্বে ঢাকা আবার গুরুত্বপূর্ণ শহরের মর্যাদা পেলো; প্রাচ্য দেশগুলোর বিভিন্ন শহরের 'রানী' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ঢাকা তার যাত্রা শুরু করলো। গলি ও আঁকাবাঁকা রাস্তার প্রাচীন শহরকে নতুনভাবে সাজানো হলো; নতুন নতুন অট্টালিকা এর সাথে যোগ করা হলো। মোগলদের সময় যে এলাকা কর্মচঞ্চল ছিল, সেই এলাকাতেও সংস্কার করা হলো এবং বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়ন কাজ সম্পূর্ণ করা হলো। এসব এলাকার মধ্যে আছে আজিমপুরা কলোনি, ঢাকেশ্বরী কোয়ার্টার্স, রমনা বিল্ডিংস এবং শান্তিনগর ও ইস্কাটন এলাকায় ফ্লাট। নির্মাণ কাজ শুরু করা হলো তেজগাঁও-এ শিল্প এলাকা, দিলখুশার নিকটবর্তী এবং মতিঝিল-এ বাণিজ্যিক এলাকা এবং ধানমন্ডীর কাছে মার্কেট ও আবাসিক এলাকা। আমাদের বলা হয় যে, চূড়ান্ত পরিকল্পনায় শহরের পুরান ও নতুন এলাকার মধ্যে সংযোগ সাধন করা হবে এবং সামগ্রিকভাবে শহরটিকে সমন্বয়পূর্ণ ও সুপরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

নতুন প্রত্যাশা : ঢাকায় এখন পরিবর্তনের হাওয়া চলছে। প্রতিদিন আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে নির্মাণ কাজের দৃশ্য। শহরের জন্য কি বিরাট ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তা কেবল ভবিষ্যৎ প্রজন্মই প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এটা ঐতিহাসিকের বর্ণনার বিষয় নয়। ইতিমধ্যে ঢাকায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে, সে সব ঘটনা স্মরণযোগ্য। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ ঢাকার জনজীবনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সন্ধ্যার দিকে লাখ লাখ লোক তেজগাঁও বিমান ঘাঁটিতে গিয়ে জড়ো হয়। অপরাহ্ন ৬ টার সময় দীর্ঘ আকাঙ্খিত বিমানটি অবতরণ করে। ওই বিমান থেকে নেমে আসেন জাতির পিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, যার সাহসী উদ্যম ও প্রয়াসের ফলে অর্জিত হয় পাকিস্তান। শহরটি এসময় উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। আশপাশের গ্রাম থেকে লোকেরা তাদের নেতাকে এক নজর দেখার ও তাঁর কথা শোনার জন্য শহরে ছুটে আসে। ২১ মার্চ কায়েদে আজম জনসভায় প্রথম ভাষণ দেন। তাঁর নিম্নলিখিত বক্তব্যে জনগণের প্রতি উপদেশ ও দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্পর্কে সতর্কবাণী ছিল, 'যতদিন পর্যন্ত আপনারা রাষ্ট্র থেকে এই বিষ দূর করতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত আপনারা কখনই ঐক্যবদ্ধ হতে, নিজেদের সচেতন করতে এবং সত্যিকার বিশ্বাসী জাতিতে নিজেদের গঠন করতে পারবেন না। আপনারা যা চান তা বাঙ্গালি, পাঞ্জাবি, সিন্ধী, বেলুচি, পাঠান এবং এ ধরনের কারও জন্য নয়। তারা অবশ্যই এক একটা ইউনিট; কিন্তু আপনাদের কাছে জানতে চাই, ১৩শ' বছর আগে (১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে একথা বলা হয়) আমাদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো তা কি আপনারা ভুলে গিয়েছেন? আমি আপনাদের বলতে পারি যে, এখানে আপনারা সবাই বাইরের লোক। বাংলার মূল অধিবাসী কারা – এখন যারা বসবাস করছে তারা না নিশ্চয়ই।

'সুতরাং একথা বলার প্রয়োজন কি : আমরা বাঙালি বা সিন্ধী বা পাঠান বা পাঞ্জাবি। না, আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছে। আমি মনে করি আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে, আপনারা যেখানেই থাকুন এবং যা-ই হোন না কেন, আপনারা মুসলমান। আপনারা এখন একটা জাতির অন্তর্ভুক্ত। আপনারা এখন একটা রাষ্ট্র গঠন করেছেন, বিরাট এক রাষ্ট্র, এটা আপনাদের সবার।

'এটা কোনো পাঞ্জাবির নয়, বা কোনো সিন্ধীর নয়, বা কোনো পাঠানের নয়, বা কোনো বাঙালির নয়। এটা আপনাদের সবার। আপনাদের কেন্দ্রীয় সরকার আছে, সেখানে একাধিক ইউনিট এর প্রতিনিধিত্ব আছে। সুতরাং আপনারা যদি একটা জাতিতে গঠিত হতে চান তাহলে, আল্লাহর ওয়াস্তে, এই প্রাদেশিকতা পরিহার করুন। শিয়া, সুন্নী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়-বিভক্তির মতো প্রাদেশিকতা একটা অভিশাপ'।[১৩৯]

বাতাস কোন্ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তা এই কথার মধ্য দিয়েই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। বিভাগ-পরবর্তী ঢাকার ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ভাষা আন্দোলন – বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা পাবে কিনা এই প্রশ্নে। বাংলা ভাষা এখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার মধ্যে একটি রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ভাষা ইস্যুটি শুরু মাত্র, যা পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সমতার বিষয়টি পুনরায় আলোচনায় আসে। এর ভবিষ্যৎ এখনও অজ্ঞাত।[১৪০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূত্র :

১. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়; স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে নতুন দেশের অভ্যুদয় ঘটে। ঢাকা হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী।

২. জেমস টেলর, টপোগ্রাফি অব ঢাকা, ১৮৪০, পৃ. ৯১।

৩. ঐ, পৃ. ৬৬।

৪. আউলাদ হাসান, নোটস্ অন দি এনটিকুইটিজ অব ঢাকা, পৃ. ১-২।

৫. বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, খণ্ড-২৩, ১৯২৭, পৃ. ২৭।

৬. ভারতীয় বিদ্যা, খণ্ড ১১, নম্বর ৩ এবং ৪, পৃ. ১৮৩-১৮৬।

৭. ঢাকার ইতিহাস, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭-৩৮।

৮. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, খণ্ড-৬, ১৯১০, পৃ. ১৪১-১৪৩।

৯. জে এফ ফ্লীট, করপাস ইনস্ক্রিপসানাম ইনভিকারাম,খণ্ড-৩, পৃ. ৮।

১০. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, খণ্ড-৬, ১৯১০, পৃ. ১৪৪।

১১. ভারতবর্ষ, বাংলা সাল, ১৩৪৮, পৃ. ৯০।

১২. বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, খণ্ড-৫১, ১৯৩৬, পৃ. ৫।

১৩. মসজিদের বিবরণের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

১৪. আউলাদ হাসান, টীকা পৃ. ৩৪।

১৫. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, খণ্ড-৬, ১৯১০, পৃ. ১৪৫।

১৬. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ. ৩৪।

১৭. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, খণ্ড-৬, ১৯১০, পৃ. ১৪৬।

১৮. ঐ, পৃ. ১৪৭।

১৯. জেমস টেলর, টপোগ্রাফি অব ঢাকা, পৃ. ৯২।

২০. ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিক্যাল কোয়ার্টারলি (কোলকাতা), খণ্ড-১৯, ১৯৪৩, পৃ. ২৯৭-৩১৭।

২১. আকবরনামা, এইচ বেভারিজ, খণ্ড-৩, পৃ. ১২১৫,১২৩৬।

২২. বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, খণ্ড-৫১, ১৯৩৬, পৃ. ৪৮-৫৭।

২৩. হাবীবুর রহমান, আসূদগান-ই-ঢাকা, ভূমিকা, পৃ. ১২; ঢাকা-আজ সে পঞ্চাস বরস পহেলে, পৃ. ১২।

২৪. স্টুয়ার্টস হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, পৃ. ২৩২-২৩৩-২৩৭।

২৫. ঐ

২৬. হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, খণ্ড-২ জেএন সরকার সম্পাদিত, পৃ. ২৮৪।

২৭. ঐ, পৃ. ২৮৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮. বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'বাহারিস্তান' দেখুন (ইংরেজি অনুবাদ– ড. এমআই বোরাহ, খণ্ড-২, পৃ. ৮১৩-৮১৪; বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, খণ্ড-৫১, পৃ. ৪৮-৪৯।

২৯. বিশ্বভারতী এ্যানালস, খণ্ড-১, পৃ. ৯৬-১৩৪।

৩০. এইচ এ আর গিব, ট্রাভেলস অব ইবন বতুতা, পৃ. ২১৩-২১৪।

৩১. মসজিদের বিবরণের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

৩২. আউলাদ হাসান, টীকা পৃ. ২২; এসএম তাইফুর, গ্লিম্পসেস অব ওল্ড ঢাকা, পৃ. ১৪ টীকা-১।

৩৩. ডিওলি, এন্টিকুইটিজ অব ঢাকা, পৃ. ৪।

৩৪. জেএন সরকার, স্টাডিজ ইন মোগল ইন্ডিয়া, পৃ. ১২৭।

৩৫. এসব দুর্গের বিবরণের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

৩৬. আউলাদ হাসান, টীকা পৃ. ৫৮।

৩৭. বাহারিস্তান, খণ্ড-১, পৃ. ৮৬।

৩৮. ঐ, পৃ. ৫৭।

৩৯. ঐ, পৃ. ৫৪।

৪০. ইসলামিক কালচার, খণ্ড-১৬, ১৯৪২, পৃ. ৩৯৫।

৪১. এসএম তাইফুর, গ্লিম্পসেস অব এল্ড ঢাকা, পৃ. ৪১, যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, খণ্ড-১, পৃ. ৩৩৯।

৪২. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ. ৪৪; রহমান আলী, তওয়ারীখ-ই-ঢাকা, পৃ. ২৮৩।

৪৩. বাহারিস্তান, খণ্ড-২, পৃ. ৭০৮-৭০৯।

৪৪. এসএম তাইফুর, গ্লিম্পসেস অব ওল্ড ঢাকা, পৃ. ৪১; যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, খণ্ড-১, পৃ. ৩৩৯।

৪৫. বাহারিস্তান, খণ্ড-১, পৃ. ২৫৭।

৪৬. এসএম তাইফুর, গ্লিম্পসেস অব ওল্ড ঢাকা, পৃ. ১৮৮-১৯০।

৪৭. বাহারিস্তান, খণ্ড-১, পৃ. ২১২।

৪৮. ঐ, পৃ. ১২০।

৪৯. ঐ, পৃ. ২২৪।

৫০. মাসির উল-উমরা, খণ্ড-১, পৃ. ৬৯৩।

৫১. বাহারিস্তান, খণ্ড-২, পৃ. ৫১২।

৫২. ঐ, খণ্ড-১, পৃ. ২১৩।

৫৩. ঐ, খণ্ড-১, পৃ. ২১৫-২১৭।

৫৪. ঐ, খণ্ড-২, পৃ. ৬৪৪।

৫৫. ট্রাভেলস অব মানরিক, খণ্ড-১, ভূমিকা পৃ. ২৫-২৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৬. ঐ, খণ্ড-২, পৃ. ২৭৯-২৮০, আরো দেখুন, শিহাবুদ্দীন তালিশ, ফাতিইয়াহ, ইবরিয়া; যদুনাথ সরকার, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, পৃ. ৩১৪, পাদটীকা-১, এই আক্রমণের তারিখ ভুল করে উল্লেখ করা হয়েছে ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ।

৫৭. যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, খণ্ড-১, পৃ. ৩৩৯।

৫৮. ট্রাভেলস অব মানরিক, খণ্ড-১, পৃ. ৪৩-৪৭।

৫৯. ঐ, পৃ. ৫৬-৫৭।

৬০. টমাস বাউরে, বে অব বেঙ্গল, পৃ. ২৩০।

৬১. মানুকি, স্টোরিয়া, খণ্ড-২, পৃ. ৮৬-৮৭।

৬২. টেভারনিয়ার-এর ট্রাভেলস, পৃ. ১০০।

৬৩. ঐ, পৃ. ১০৩-১০৪।

৬৪. টমাস বাউরে, বে অব বেঙ্গল, পৃ. ১৪৩, পাদটীকা-১।

৬৫. ঐ, পৃ. ১৪৯-৫১।

৬৬. শিহাবুদ্দীন তালিশ, উদ্ধৃত– 'দি কনকয়েস্ট অব চাটগাঁও', জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯০৭, পৃ. ৪০৭।

৬৭. রোমান্স অব এ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটাল, পৃ. ২৮৬।

৬৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

৬৯। ঢাকা রিভিউ, খণ্ড-৯, ১৯২০, পৃ. ২৩০।

৭০. ঐ, পৃ. ২৩০-২৩১।

৭১. বেঙ্গল: পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, খণ্ড-৪২, ১৯৩১, পৃ. ৪৮-৫৪।

৭২. আর্মেনিয়ানস ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৫৭১-৭৫।

৭৩. টেলরের টপোগ্রাফি, পৃ. ২৫৪।

৭৪. ঐ, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

৭৫. বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, খন্ড-৪২, ১৯৩১, পৃ. ৪৫-৪৬।

৭৬. ঢাকা রিভিউ, খণ্ড-৯, ১৯২০, পৃ. ২৩১।

৭৭. ঐ, খণ্ড-১-৮, ১৯১৮-১৯১৯, পৃ. ১-৩।

৭৮. ঐ, পৃ. ১০-১১।

৭৯. হেজে'স ডাইরি, খণ্ড-১, পৃ. ৪৩-৪৪।

৮০. ঐ, পৃ. ১৫৯।

৮১. ঢাকা রিভিউ, খণ্ড-৪, ১৯১৪, পৃ. ১৫২।

৮২. ঐ, খণ্ড-৮, ১৯১৮-১৯১৯, পৃ. ১৯।

৮৩. ঐ, পৃ. ২১।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৪. ঐ, পৃ. ২৮।

৮৫. বর্তমানে তা জিনজিরা প্রাসাদ নামে পরিচিত। প্রাসাদটি পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। (অনুবাদক)।

৮৬. ইতিহাস থেকে জানা যায়, সিরাজউদ্দৌলার বিধবা পত্নী পরে মারা যান। (অনুবাদক)।

৮৭. আউলাদ হাসান, টীকা-৪, তিনি ভুল করে উল্লেখ করেন যে, ঐ প্রাসাদটি নির্মাণ করেন ইব্রাহীম খান ফতেহ জঙ্গ। টেলর'স টপোগ্রাফি, পৃ. ৯৭, তাইফুর, গ্লিম্পসেস অব ওল্ড ঢাকা, পৃ. ১১০-১১১।

৮৮. ঢাকা রিভিউ, খণ্ড-৮, ১৯১৮-১৯১৯, পৃ. ১।

৮৯. টেলর'স টপোগ্রাফি, পৃ. ৯৬।

৯০. উদ্ধৃতি, জে এন সরকার, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, পৃ. ৪০৩।

৯১. ঢাকা রিভিউ, খণ্ড-২, ১৯১৪, পৃ. ১৫৩।

৯২. রিয়াজ-উস-সালাতিন, পৃ. ৩০৪-৩০৫।

৯৩. ঢাকা রিভিউ, খণ্ড-৮, জুলাই ১৯১১, পৃ. ৩।

৯৪. ঐ, পৃ. ৮।

৯৫. ঐ, পৃ. ১৪-১৫।

৯৬. চার্লস ডি'ওলি (D'Oyly) এ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা, পৃ. ১৬-১৮।

৯৭. মেমোয়ার্স অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, খণ্ড-২, পৃ. ৪০।

৯৮. চার্লস ডি'ওলি, এ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা, পৃ. ১৮

৯৯. মিউজিয়াম বর্তমানে শাহবাগ এলাকায় অবস্থিত। নিমতলি কুঠির-এর অস্তিত্ব এখন বিলীন হওয়ার পথে। ঐ এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আবাসিক ভবন হয়েছে এবং একটি অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর অফিস। (অনুবাদক)।

১০০. জে এম ঘোষ, সন্যাসী এ্যান্ড ফকির রেইডার্স ইন বেঙ্গল, কোলকাতা, ১৯৩০, পৃ. ৩৬।

১০১. উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ৪৪।

১০২. ঐ পৃ. ৫৬।

১০৩. ঐ পৃ. ৫৭।

১০৪. ডি'ওলি, এ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা, পৃ. ১৮।

১০৫. হাবীবুর রহমান, আসূদ গান-ই ঢাকা, পৃ. ৫৪।

১০৬. হেবার'স ন্যারেটিভ, খণ্ড-১, পৃ. ১৪০-৪১।

১০৭. ঐ, পৃ. ১৪৫।

১০৮. ঐ, খণ্ড-২, পৃ. ৩৪০-৪২।

১০৯. ঐ, খণ্ড-১, পৃ. ১৪৩-১৪৪।

১১০. ঐ, খণ্ড-১, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

১১১. ঐ, খণ্ড-১, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১২. এই নবাব সম্পর্কে সমসাময়িকের বিবরণের জন্য দেখুন- বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, খণ্ড-৪২, ১৯৩১, পৃ. ৩৯।

১১৩. টেলর'স টপোগ্রাফি, পৃ. ৮৬-৮৮।

১১৪. ঐ, পৃ. ১১৮।

১১৫. ঐ, পৃ. ১১৯।

১১৬. ঐ, পৃ. ৩৬৬।

১১৭. ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার, পৃ. ৫৮।

১১৮. টেলর'স টপোগ্রাফি, পৃ. ২৪৬-২৪৯।

১১৯. ঐ, পৃ. ২৫৭।

১২০. ঐ, পৃ. ২৫৭।

১২১. ঐ, পৃ. ২৬৪

১২২. ঐ, পৃ. ২৬৫-২৬৬।

১২৩. 'ঢাকা ফোরটি ইয়ার্স এ্যাগো', ঢাকা রিভিউ, খণ্ড-৬, জুন ১০১৬, পৃ. ৯৯-১০১।

১২৪. ঢাকা রিভিউ, খণ্ড-৫, ১৯০৫, পৃ. ২৪৫-২৪৯।

১২৫. হৃদয়নাথ মজুমদার, দি রেমিনিসেন্স অব ঢাকা, পৃ. ২৩।

১২৬. যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, খণ্ড-১, পৃ. ২৪৪।

১২৭. টেলর'স টপোগ্রাফি, পৃ. ৯৭।

১২৮. তারীখ-ই খাজেগানে ঢাকা।

১২৯. স্যার এইচ এইচ আগা খান, ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন।

১৩০. ব্রাডলি বার্ট, রোমান্স অব এ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটাল, পৃ. ২৬১-২৬২।

১৩১. দি ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটি ইন ঢাকা, পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৬১।

১৩২. কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, খণ্ড-৫, পৃ. ২১৯।

১৩৩. কোলকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট, খণ্ড-৪, পৃ. ১২২।

১৩৪. ঐ, খণ্ড-৯, পৃ. ১১৪।

১৩৫. ঐ, খণ্ড-৯, পৃ. ৮।

১৩৬. ঐ, খণ্ড-৯, পৃ. ৮০-৮২।

১৩৭. ঐ, খণ্ড-৯, পৃ. ৫৬।

১৩৮. ঐ, খণ্ড-৯, পৃ. ৮৫-৮৬।

১৩৯. দি স্টার অব ইন্ডিয়া, ২৩ মার্চ ১৯৪৮।

১৪০. এই 'সমতা'র বিষয়টি পরে জোরালো হয় এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এক যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে- অনুবাদক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

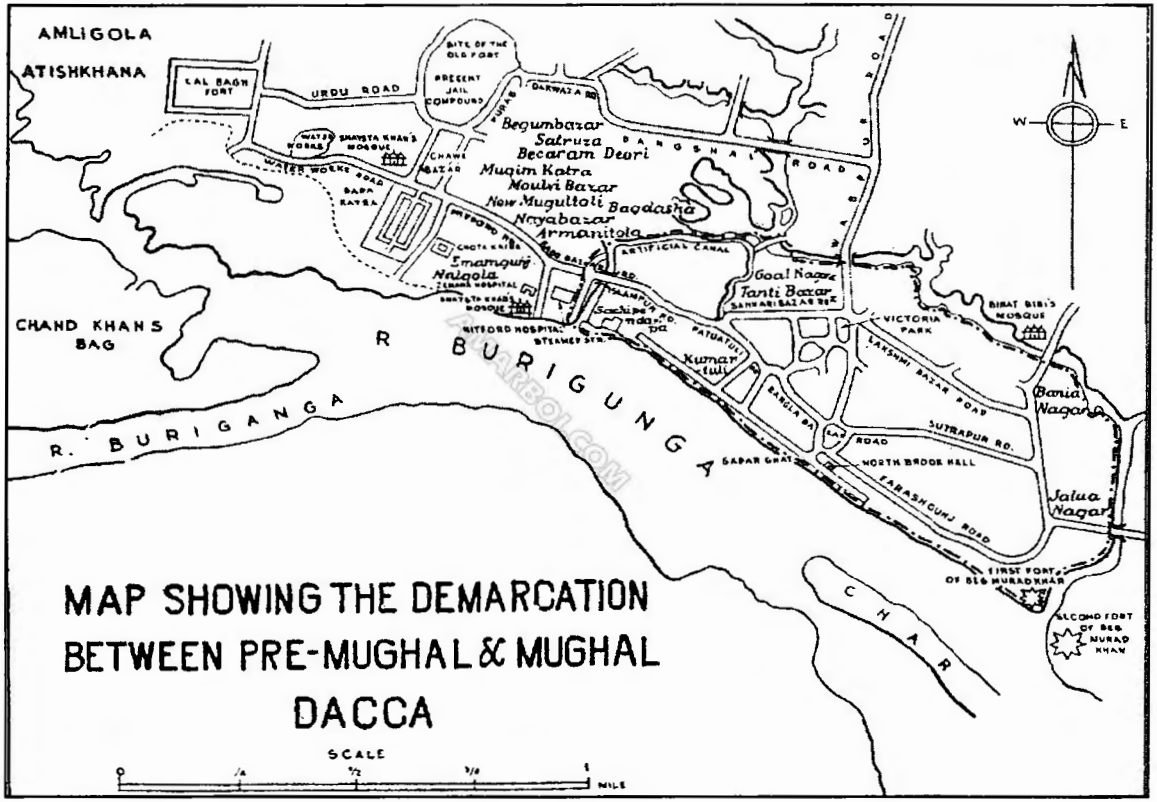

MAP SHOWING THE DEMARCATION BETWEEN PRE-MUGHAL & MUGHAL DACCA

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় - তিন

ঢাকার স্মৃতিস্তম্ভ

ঢাকা প্রধানত মোগলদের শহর। ঢাকা ও তার আশেপাশে এখন যে সব স্মৃতিস্তম্ভ আছে তার অধিকাংশই মোগলরা নির্মাণ করে অথবা মোগলদের অধীনে নির্মিত হয়। কিন্তু কোনো মোগল সম্রাটকে ঢাকায় অভ্যর্থনা জানানোর বা এখানে কোনো প্রাসাদ বা আমোদ-প্রমোদের ভবন নির্মাণের জন্য তাকে উৎসাহিত করার সৌভাগ্য ঢাকার হয়নি। কারণ রাজধানী দিল্লী, আগ্রা বা লাহোরে এসব কাজ করতে সম্রাট অভ্যস্ত ছিলেন। যাহোক, পাঁচজন মোগল শাহজাদা এই শহরকে অনুগৃহীত করেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের নিজস্ব স্মৃতি রেখে যাওয়ার চেষ্টা করেন। মোগল গভর্নর ও তাঁদের অধীনস্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আড়ম্বরপূর্ণ বাসগৃহের সাথে এসব স্মৃতি যুক্ত হয়। মসজিদ, গম্বুজ ও দুর্গে বিভিন্ন রকম মনোরম আচ্ছাদন ও চমৎকার উদ্যান ছিল। কিন্তু ঢাকার ইতিহাসের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সময়ের অস্থিরতা একসাথে বিরাট ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিনাশকারী প্রকৃতি ও মানুষের অবহেলা ওইসব স্মৃতিচিহ্নের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে। ব্রিটিশ যুগে এ শহরের মর্যাদা মফস্বল শহরের পর্যায়ে নেমে আসে, অতীত গৌরব সম্পর্কে এর অবশিষ্ট উৎসাহে ভাটা পড়ে। শহরের অস্তিত্ব টিকে থাকে মোগলদের ঘোরালো অন্ধকার গলিপথে, এখানে-সেখানে টিকে থাকা অট্টালিকার ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঠামো এবং বিভিন্ন স্থানে এর পুরনো সঙ্গী বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে প্রতিফলিত টাওয়ার ও গম্বুজের গভীর প্রতিবিম্বে। মুয়াজ্জিনের আজানের সুউচ্চ ধ্বনি মসজিদের উঁচু স্থান থেকে ধ্বনিত হয় শুধুমাত্র নতুন ও পুরনো ঢাকার মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে আধুনিক ঢাকার উত্থান ঘটে ধীরে ধীরে এবং মাঝে মাঝে তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নতুন নতুন অট্টালিকা নির্মাণের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় স্টাইল ও রীতি অনুসরণে উৎসাহ দেখা যায়। এর ফলে পুরনো মোগল শহরের জাঁকজমক বাড়ে। শহরটি এখন বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিং-এর কাঠামো সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং আকর্ষণীয় রমনা এলাকায় পুরাতন ভিত্তির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে নতুন অট্টালিকা। আড়ম্বরপূর্ণ ও প্রশস্ত অট্টালিকাগুলো গড়ে ওঠে ১৯০৫ থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে – ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে একটা পরিবর্তন আসছে, এটা যেন তার পূর্বাভাস। অতঃপর উন্নয়ন অব্যাহত থাকে এবং তা ঢাকার গৌরবকে নতুন করে বাড়িয়ে দেয়।

ঢাকায় এখনো যেসব স্মৃতিস্তম্ভ টিকে আছে তা খুব উঁচুমানের দক্ষতা ও সুরুচিসম্পন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন নয়; তবে এর গুরুত্ব এই যে, এসব ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আসছে। এমনকি এসব স্মৃতিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ টিকে আছে অতীতের গৌরবের আবেগপ্রবণতার মাঝে। ব্যস্ত জীবন থেকে যাঁরা একটু অবকাশ নিতে চান তাদের কাছে এসব স্মৃতিস্তম্ভ সব সময় আগ্রহের বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে এবং ক্ষণিকের জন্য তারা এই শহরের শাশ্বত জীবনকে অবলোকন করবেন। এতে আকর্ষণ আছে, আবেগপ্রবণতা আছে; কিন্তু প্রলুব্ধ করার মতো সৌন্দর্য নেই। শহরের এই সৌন্দর্যের বিষয় পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বর্ণনা করা হলো।

ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ

তারিখ ও নমুনা ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকায় যেসব ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ আছে তা মুসলমান, খ্রিস্টান, হিন্দু ও শিখরা নির্মাণ করে। মুসলমানদের স্মৃতিস্তম্ভগুলো নির্মাণ করা হয় বিভিন্ন সময়ে এবং এর মধ্যে আছে মসজিদ, সমাধি, দুর্গ, সরাইখানা, ব্রিজ ও অন্যান্য অট্টালিকা। খ্রিস্টানদের গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিং-এর মধ্যে আছে গীর্জা, যা সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করা হয়। হিন্দুরা নির্মাণ করে মঠ বা মন্দির। সুদূর অতীতে কোন্ সময় এসব নির্মাণ করা হয় সুনির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না – তবে পরবর্তীকালে অধিকাংশ মঠ বা মন্দির ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে গঠন করা হয়। শিখদের 'সঙ্গত' (Sanghat) স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে; তবে তাদের স্থাপত্য শিল্পে পুরোপুরি মোগল ধারার ছাপ বিদ্যমান। এসব স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয় ইট দিয়ে।

স্থাপত্য শিল্পের স্টাইল ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার মুসলমানদের যেসব প্রাচীন বিল্ডিং আছে তাহলো মসজিদ ও সমাধি – এসব নির্মাণ করা হয় স্বাধীন সুলতানদের সময়ে। এসব বিল্ডিং-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো – এর দেয়ালে লেপন বা প্লাস্টার নেই; ইটের সামনের দিকে দেখা যায় খোদিত নকশা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর সাথে উজ্জ্বল টাইলস সংমিশ্রিত থাকে। এসব বিল্ডিং-এর কোনায় অষ্টভূজ মিনার এবং প্রবেশদ্বারে একটা সাধারণ ধনুকের মতো খিলান থাকে; এসব খিলান এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন বিশেষ গুরুত্ব না পায়। প্রবেশদ্বারের ওপর ছাদের কিনারা ও কার্নিসে খোদাই করা হয় এবং গম্বুজ – যা অর্ধবৃত্তাকার – থাকে সরাসরি ছাদের ওপর, কোনো রকম মধ্যবর্তী ভিত্তি বা ড্রাম ছাড়াই। বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে থাকে পিলার দেয়া হলঘর – গম্বুজকে ধরে রাখার জন্য ওইসব পিলার ব্যবহার করা হয়। এটা হলো বিল্ডিং-এর সার্বিক বৈশিষ্ট্য, এর ভিত্তিতেই দর্শনার্থীরা সহজেই স্মৃতিস্তম্ভের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের উত্তম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টান্ত হলো বিক্রমপুরের কাছে রামপালে নির্মিত মসজিদ। ঢাকায় বিনত্ বিবির মসজিদে পরবর্তীকালে প্লাস্টার এবং গম্বুজ পুনঃনির্মাণ করা হলেও কার্নিস ও ছাদের কিনারার ভেতর দিকে খোদাই করা আছে।

মোগলদের আগমনের সাথে সাথে বাঙলো টাইপের বিল্ডিং বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে; এ বিষয়টি বারবার 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী'তে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের বাঙলো সাধারণত আয়তক্ষেত্রাকার এবং এর দেয়াল প্লাস্টার করা; দেয়ালের চারকোনার সাথে ধনুকের মতো খিলানের কোনো সংযোগ নেই। উপরে আছে ধনুকের মতো সংযুক্ত ছাদ-এর কিছু অংশ সামান্য বাঁকা এবং গোলাকারভাবে সংযুক্ত করার জন্য সামান্য প্রান্ত। এ ধরনের ছাদের সাথে আগ্রায় ইতিমাদ-দৌলার সমাধির ওপর নির্মিত চন্দ্রাতপের সাদৃশ্য আছে; এ ধরনের ছাদের উৎস হলো উত্তর ভারতের হিন্দুদের নির্মিত ছাদের স্টাইল। এ রকম ছাদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো চকবাজারের কাছে চুড়িহাট্টা মসজিদ এবং ঢাকা হাইকোর্ট সীমানার অভ্যন্তরে বিদ্যমান সমাধি (এই সমাধির ওপর নির্মিত চাঁদোয়া বা ছাদ পরে পুনঃনির্মাণ করা হয় – অনুবাদক)। এ ধরনের ছাদ স্থানীয় বাঙালিঘর বা কুঁড়েঘরের ওপর যে ছাদ দেয়া হয় তা থেকে ভিন্ন ধরনের – বাঙালিঘরের ছাদ বাঁকা এবং নিচের দিকে ঝোঁকানো। বাঙালিঘরের ছাদের দৃষ্টান্ত হলো ঢাকেশ্বরী মন্দির ও জেলখানার কাছে বেগমবাজার মসজিদের ছাদ।

মসজিদের নির্মাণ কৌশলে মোগলরা এদেশে একটা বড় রকমের পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই পরিবর্তন হলো ছাদের ওপর তিনটি গম্বুজ ও মূল মসজিদের বাইরের অংশের নির্মাণ কাঠামোয় – এর সাথে মূল বিল্ডিং একেবারে আলাদা; বরং তা তিন স্তরবিশিষ্ট ধনুকাকৃতি ছাদের সাথে সংযুক্ত থাকে। মূল ধনুকাকৃতির ছাদ বিল্ডিং থেকে কিছুটা বড় এবং তা সামনের দিকে প্রদর্শনের জন্য তৈরি করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব ধনুকাকৃতির ছাদ অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজের নিচে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে। ছাদের কিনারা থাকে সোজা এবং অন্ধকারে তা উজ্জ্বল দেখাবার জন্য বাজপাখির চোখের মতো উজ্জ্বল মোল্ডার সংযুক্ত করা হয়। গম্বুজের জন্য অবশ্যই একটা ভিত্তি থাকে এবং এ কারণে তা উঁচু করা যায় – সাধারণত মূল গম্বুজটি বড় থাকে। কোনার মিনারগুলো কারুকাজপূর্ণ প্লাস্টার দিয়ে সাজানো হয়। অভ্যন্তরভাগের হলঘর হলো সমকোণী চতুর্ভূজের মতো। মোগল-পূর্ব যুগের স্তম্ভ বা থাম এখন আর দেখা যায় না। এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ ও সমাধি এখনো দেখা যায়। তবে মাঝখানের প্রবেশ পথকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তৈরি করা হয়। আসলে স্মৃতিস্তম্ভমূলক প্রবেশ পথ তৈরির ফ্যাশন ঢাকায় চালু হয় শাহ সুজার সময়। এ ধরনের প্রবেশ পথ তৈরির সুন্দর দৃষ্টান্ত হলো বড় কাটরার প্রবেশ পথ এবং লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ গেট। এগুলো ছিল ঢাকায় রাজকীয় মোগল স্টাইলের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন; মোগল যুগে বা পরবর্তীকালে যেসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিল্ডিং নির্মিত হয় তার মধ্যে এর প্রভাব কমবেশি দেখতে পাওয়া যায়। ঢাকায় মোগল স্থাপত্যের সুবর্ণ যুগ ছিল শায়েস্তা খান ও শাহজাদা মোহাম্মদ আজমের শাসনকাল – এ সময় আগ্রা ও দিল্লী থেকে সম্ভবত রাজমিস্ত্রী এনে তাদের সহায়তায় বেশ কয়েকটি সুন্দর বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। সুতরাং ঢাকায় মোগল স্থাপত্যের তিনটি স্তরের কথা আমরা কিছুটা সঠিকভাবেই বলতে পারি – এ তিনটি স্তর হলো শায়েস্তা খান-পূর্ব স্টাইল, শায়েস্তাখানি স্টাইল এবং শায়েস্তা খান-পরবর্তী স্টাইল। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, শায়েস্তাখানি স্টাইল বলতে শায়েস্তা খান কর্তৃক উদ্ভাবিত স্টাইল নয়।[১] শায়েস্তাখানি স্টাইল বলতে শায়েস্তা খানের দীর্ঘ পঁচিশ বছর শাসনামলে রাজকীয় মোগল স্থাপত্য স্টাইলের যে ধারা ঢাকায় প্রসার লাভ করে সেই স্টাইলকে বুঝায়।

মোগল স্টাইলের এ ধারা অব্যাহত থাকে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করে মসজিদ ও সমাধির মতো ধর্মভিত্তিক বিল্ডিং-এ। কিন্তু অলঙ্কারপূর্ণ কারুকাজে এ ধারার অবনতি ঘটে। এসব কাজ এখন সাধারণত অসমতল প্লাস্টারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়; এছাড়া প্লাস্টার করে জাল বোনার ডিজাইন, বিল্ডিং-এ চূঁড়ার আধিক্য এবং অন্ধকারে জ্বলজ্বল করার জন্য মোল্ডার-এ রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অবনতি ঘটে। ধর্মের সাথে সম্পর্ক নেই এমন সব বিল্ডিং-এ প্রথম দিকে ধীরে ধীরে ইউরোপীয় স্টাইলের অনুপ্রবেশ ঘটে – পরে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত বিল্ডিং-এ তা পরিব্যাপ্ত হয়। প্রথমে অনুকরণ করা হয় করিনথীয় রাজধানীর (গ্রিসের অন্তর্গত করিনথ প্রদেশের রাজধানী) পিলার বা থাম এবং বাসকগোত্রীয় পাতার – প্লাস্টার দিয়ে এসব অনুকরণ করা হয় অদক্ষভাবে। এরপর আসে খিলানের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত প্রলম্বিত প্রস্তরখণ্ডসহ অর্ধবৃত্তাকার ধনাকাকৃতি খিলান। মোগল টাইপের ধনুকাকৃতি ছাদ বাদ দেয়া হয় এবং তার পরিবর্তে ভার বহন করার জন্য লোহার বড় কড়ি ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের প্রথম বিল্ডিং-এর নিদর্শন হলো বর্তমান বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি অফিসের কাছে নিমতলী কুঠির গেটওয়ে বিল্ডিং। কারুকাজপূর্ণ প্লাস্টার ব্যবহারের বিস্তৃতিও লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নির্মিত অধিকাংশ বিল্ডিংগুলোতে। গথিক ধনুকাকৃতি খিলানও (গথ জাতির স্থাপত্য) দেখা যায়, এর সাথে ইউরোপীয় স্টাইলের দুই বা তিন জানালা নির্মাণের দৃষ্টান্তও মাঝে মাঝে দেখা যায়। ছোট কাটরার প্রবেশ পথে বর্তমানে যে জানালা দেখা যায় তা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একেবারে পুরোপুরি ইউরোপীয় স্টাইলের বিল্ডিংও দেখা যায়, যেমন ঢাকা হাইকোর্ট (পুরাতন হাইকোর্ট বিল্ডিং) এবং স্টেট ব্যাংক (বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক) বিল্ডিং।

খ্রিস্টানদের সব গীর্জা নির্মাণ করা হয় ইউরোপিয়ান স্টাইলে; কিন্তু তেজগাঁও গীর্জার সদরের বহির্ভাগে যে ছাপ পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে সমসাময়িক মোগল স্টাইলের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু মন্দিরগুলোর নির্মাণ কৌশলে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের টাইপ ও ডিজাইন। পাশে বারান্দাসহ বা ব্যতীত একক মোচাকার চূঁড়াবিশিষ্ট মন্দির, পঞ্চরত্ন (ছাদের ওপর পাঁচটি মোচাকার চূঁড়াবিশিষ্ট) মন্দির, বাঙালি ধরনের ছাদের মতো তীর্থস্থানের মন্দির দেখতে পাওয়া যায়; ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মতো মন্দিরও দেখতে পাওয়া যায় – এসব মন্দিরের ছাদের ওপর যেন মোচাকার চূঁড়া বসিয়ে দেয়া হয়েছে; ওই চূঁড়া উপরের দিকে প্রসারিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা সরু হয়ে যায় এবং লতাপাতার কারুকাজ শোভিত শেষপ্রান্তে থাকে কলস। রাজা বাবুর বাড়ির ব্যক্তিগত চণ্ডিমণ্ডপ সাধারণের পূজার জন্য উন্মুক্ত করা হয়, এটা একটা একক দৃষ্টান্ত। এসব মন্দিরে যে কোনো কারণেই হোক মুসলিম স্থাপত্যের অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

একমাত্র শিখ সঙ্গত তার প্রাচীন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছে। রমনা রেসকোর্সের কাছে সুজাতপুরে (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা) এর অবস্থান। এই বিল্ডিং-এর ভিত পরিকল্পনা একেবারে বিবি পরীর সমাধির মতো; তবে এর কোনার মিনার ও ধনুকাকৃতির কারুকাজপূর্ণ উন্মুক্ত প্রবেশদ্বার সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের।

ক. বাঙলো টাইপ স্মৃতিস্তম্ভ

ঢাকা শহরে এ ধরনের অনেক বিল্ডিং আছে। চুড়িহাট্টা মসজিদ বেশ প্রাচীন; শিলালিপি থেকে দেখা যায়, এটা নির্মিত হয় ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে। একই টাইপের বিল্ডিং হলো আরমানিটোলা মসজিদ; এটা নির্মিত হয় ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে। এ ধরনের বিল্ডিং হলো একটা একক হলঘর-এর ওপরে আছে পরস্পর সংযুক্ত ধুনাকাকৃতি ছাদ বা খিলান – পরস্পর সংযুক্তির লাইন বাঁকা – এসব বাঁকা লাইন সাধারণত লতাপাতার কারুকাজ দ্বারা সজ্জিত থাকে। বাঙালি টাইপের বাঙলোয় যেমন নিম্মমুখী প্রসারিত ছাদ থাকে, এসব বিল্ডিং-এর ছাদ তেমন নয়। এ ধরনের বাঙলো টাইপ অট্টালিকা উত্তর ভারতে দেখা যায়; ঢাকায় ওই ধরনের অট্টালিকার প্রচলন করে মোগলরা।

১. চুড়িহাট্টা মসজিদ : চকবাজারের কাছাকাছি চুড়িহাট্টা বসতি এলাকায় মসজিদটি অবস্থিত। চকবাজার মসজিদের উত্তরদিক থেকে একটা গলিপথ দিয়ে ওই মসজিদে যাওয়া যায়; তবে জেলখানার দক্ষিণ-পশ্চিম কোনার পাশে উর্দু রোড দিয়ে ওই মসজিদে গাড়ি করে যাওয়া যায়। মোহাম্মদ বেগ নামে একজন মোগল অফিসার ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন; এ সময় বাংলার ভাইসরয় ছিলেন শাহজাদা শাহ সুজা। কথিত আছে যে. ়ই মসজিদের পাশে পূর্বে একটা মন্দির ছিল; ওই মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাপ্ত শিলালিপি থে… ়ানা যায়, একথা আংশিক সত্য।[২] কিন্তু বর্তমান মসজিদের স্থানে আগে … ন্দর ছিল না, এটা নিশ্চিত। মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মসজিদের পূর্বদিকের খোলা অংশে চতুষ্কোণ কক্ষ আছে; পরপর দু'টো ধনুকাকৃতি খিলানের মধ্যদিয়ে মসজিদের তিনটি দরজাই খোলা যায় – এই খিলান দু'টো তীক্ষ্ণাগ্র ও চতুষ্কোণবিশিষ্ট। ছাদের কিনারায় অন্ধকারে জ্বলজ্বল করার মতো মোল্ডার আছে, আর মসজিদের কোনায় আছে মিনার। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিমদিকে আছে তিনটি 'মেহরাব' এবং মূল লাইনের ওপর একাধিক চারকোনাবিশিষ্ট প্যানেলের সারি আছে। মসজিদের পূর্ব ও দক্ষিণদিকে নতুন বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে।

২. নবরায় লেনের (ইসলামপুর) মসজিদ : এ মসজিদটি অবস্থিত নবরায় লেনে। ইসলামপুর রোড বা তাঁতীবাজার থেকে আসা রাস্তা দিয়ে এ মসজিদে যাওয়া যায় (নবরায় লেনে আগে অসামাজিক কাজের ঘাঁটি ছিল)। একটা উঁচু ভিত্তির ওপর মসজিদটি অবস্থিত, এক কোনায় ছিল একটা কূয়া। মসজিদের বাইরের অংশে ছিল একাধিক প্যানেল; প্রত্যেক প্যানেলে ছিল ইংরেজি 'S'-এর ন্যায় আকারবিশিষ্ট বক্ররেখার খিলান। প্রধান দরজা পথে আছে একাধিক চূঁড়াবিশিষ্ট খিলান বা স্তম্ভ; দরজার পাশে দেয়ালে আছে ত্রিপত্রাকার বস্তু। ছাদের কিনারা সম্ভবত নতুনভাবে নির্মিত, কারণ অন্ধকারে ছাদের কিনারায় জ্বলজ্বল করা মোল্ডার একেবারে ভিন্ন ধরনের। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিমদিকে আছে তিনটি 'মেহরাব', প্রত্যেকটি মেহরাব প্যানেল দ্বারা সজ্জিত। পূর্বদিকে একটা নতুন বারান্দা তৈরি করা হয়েছে। মসজিদটি কে নির্মাণ করেন তাঁর নাম অজ্ঞাত রয়েছে। মসজিদটির নির্মাণের ধরন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্যায়ের; তবে কোন সালে এটা নির্মিত হয় তার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৩. শাহ মোহাম্মদ জামালের সমাধি : এ সমাধি অবস্থিত তাঁতীবাজারে; পটুয়াখালী কোতোয়ালি পুলিশ চৌকি থেকে কোতোয়ালি রোড ধরে এ সমাধিতে যাওয়া যায়। চতুর্দিকে দেয়ালবেষ্টিত স্থানে সমাধিটি অবস্থিত। এর সাথে আছে একটা এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। মসজিদটি প্রায় ১শ' বছরের পুরাতন (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে এ কথা বলা হয়)। এখানে একটি মাদ্রাসা তৈরি করা হয়; এখন ওই মাদ্রাসার অস্তিত্ব নেই। সমাধিটি শাহ মোহাম্মদ জামালের; তাঁর একজন ভক্ত শেখ মোহাম্মদ জাকির অষ্টাদশ শতকে ওই সমাধিটি নির্মাণ করেন।[৩]

৪. আগামসিহ লেনের মসজিদ : মসজিদটি এই লেনে অবস্থিত এবং কাজী আলাউদ্দিন রোড থেকেও এই মসজিদে যাওয়া যায়। চারটি লেনের সংযোগস্থলে মসজিদটির অবস্থান। মসজিদের বাইরে থেকে তিনটি দরজা দিয়ে এর ভেতরে প্রবেশ করা যায় – প্রত্যেকটি দরজায় পরপর দুটো স্তম্ভ আছে। মূল স্তম্ভের সাথে যে চূঁড়া আছে তা বাইরের দিকে প্রসারিত। ছাদের কিনারায় অন্ধকারে জ্বলজ্বল করার যে মোল্ডার আছে তা ভিন্ন ধরনের এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বলে ধারণা করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মসজিদের পূর্বদিকে নতুন বারান্দা নির্মিত হয়েছে।

৫. হযরত চিশতী বেহেশতির সমাধি : সমাধিটি হাইকোর্ট এলাকার মধ্যে হাইকোর্টের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এটা একটা উঁচু ভিত্তির ওপর অবস্থিত; এ সমাধির ভিত্তি পরিকল্পনা ও ছাদ ছাড়া প্রায় সবই ব্যাপকভাবে সংস্কার করা হয় (পরে এর ছাদও নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়)। এখানে কে শায়িত আছেন জানা যায় না। হাকিম হাবিবুর রহমান অনুমান করেন যে, ঢাকায় প্রথম মোগল গভর্নর ইসলাম খান চিশতীর কোনো এক আত্মীয়কে এখানে সমাধিস্থ করা হয়।[৪] কিন্তু জনাব এসএম তাইফুর[৫] মনে করেন যে, ইসলাম খান চিশতীকেই এখানে সমাধিস্থ করা হয়; বাহরিস্তান-এ একথাই বলা হয়।[৬] কিন্তু একথা মনে করা ভুল যে, ফতেহপুর সিক্রীতে ইসলাম খান চিশতীর যে সমাধি সম্রাট জাহাঙ্গীর নির্মাণ করেন তা কৃত্রিম বা জাল। মসির-উল-উমারা স্পষ্টভাবে বলেন যে, ইসলাম খানের মৃতদেহ ফতেহপুর সিক্রীতে নিয়ে আসা হয়।[৭] হতে পারে এ স্থানে সাময়িকভাবে ইসলাম খানের মৃতদেহ প্রথম সমাধিস্থ করা হয় এবং পরে তা নিয়ে যাওয়া হয়, তবে চিশতী বেহেশতির নামটা মানুষের স্মৃতিতে বেশ কিছুকাল জাগরুক থাকে।

৬. আরমানিটোলার মসজিদ : মসজিদটি অবস্থিত সতিশচন্দ্র চক্রবর্তী রোডে। এটা খুবই ছোট আকারের একটা মসজিদ এবং রাস্তা থেকে মসজিদের পেছনের দিকটা দেখা যায়। মূল দরজার ওপর যে শিলালিপি আছে তা থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে খান জানি'র (Khan Jani) স্ত্রী নির্মাণ করেন।

খ. লালবাগ স্টাইলের স্মৃতিস্তম্ভ

এসব স্টাইলের স্মৃতিস্তম্ভ লালবাগ কেল্লা বা তার আশপাশের এলাকায় নির্মাণ করা হয় এসব স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয় ১৬৭৯ থেকে ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। মাত্র দুটো (ফররুখ সিয়রের মসজিদ ও খান মোহাম্মদ মির্ধার মসজিদ) ছাড়া এ স্টাইলের সব স্মৃতিস্তম্ভই শায়েস্তাখানি স্টাইলের সুন্দর নিদর্শন। এসব বিল্ডিং-এর নির্মাণ কাজ যদি পুরোপুরি রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো তাহলে বিল্ডিংগুলো উপমহাদেশের আকর্ষণীয় বিল্ডিংগুলোর সমপর্যায়ের বলে গণ্য হতে পারতো।

৭. আওরঙ্গবাদ দুর্গ : সাধারণভাবে লালবাগ দুর্গ হিসেবে পরিচিতি। এ দুর্গের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে; শাহজাদা মোহাম্মদ আজম বাংলায় তাঁর সুবাদারীর সময় এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। কিন্তু দুর্গের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে ডেকে পাঠান মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর সাথে যোগ দেয়ার জন্য।[৮] আউলাদ হাসান উল্লেখ করেন, 'তাঁর উত্তরাধিকার আমির-উল-উমারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবাব শায়েস্তা খান এর নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখেননি। আসল কথা হলো, এর নির্মাণ কাজ চলার সময় তাঁর মেয়ে বিবি পরী মারা যায়। তিনি এই নির্মাণ কাজকে অশুভ কাজ বলে গণ্য করেন এবং দুর্গ নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেন।[৯] এ দুর্গের টিকে থাকা নির্মাণ কাঠামো থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, দুর্গের নির্মাণ কাজ অসমাপ্তভাবেই রেখে দেয়া হয়। লালবাগের সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ইংরেজদের ফ্যাক্টরির ঢাকা ডায়েরি থেকে, তারিখ ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই। এখানে বলা হয়, নবাবের বাসস্থান ছাড়াও লালবাগ দুর্গে বন্দিদের আটক রাখার ব্যবস্থা ছিল; কয়েকজন ইংরেজকে তখন এখানে বন্দি করে রাখা হয়।[১০]

এই দুর্গ প্রাচীর নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরভাগে যে রাজকীয় অট্টালিকা ছিল তার নিরাপত্তা বিধান করা। এটা ছিল রাজপ্রাসাদ দুর্গ, অবরোধের সময় যে ধরনের দুর্গে আশ্রয় নেয়া হয় সে রকম দুর্গ নয়।

দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে টিকে থাকা প্রধান দু'টি গেট পৃথকভাবে প্রায় ৮শ' বর্গফুট চওড়া; এর সাথে আছে প্রায় ২ হাজার ফুট লম্বা দেয়াল।[১১] দুর্গের দক্ষিণ গেট ও উত্তর-পশ্চিম কোনার মধ্যে, বিশেষ করে পশ্চিম এলাকায় বেশ কয়েকটি বুরুজ ছিল। উত্তর গেট ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোনার মধ্যে একটা ছোট গেট ছিল; তবে সংযুক্ত দেয়াল নির্মাণের কাজ কখনো এপাশে শুরু হয়েছিল কিনা তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনার বিপরীতে দেখা যায় নগর-প্রবেশদ্বারের (সিটি গেট) ধ্বংসাবশেষ। কোনার এলাকা আগেই বুড়িগঙ্গার স্রোতে বিলীন হয়ে যায়; ওই এলাকায় চর জেগে ওঠে এবং বর্তমান নদীতীর থেকে বস্তি গড়ে ওঠে। সারিবদ্ধ দেয়াল তুলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় – এর মধ্যদিয়ে একাধিক চতুষ্কোণ প্রবেশ পথ তৈরি করা হয়। এসব প্রবেশ পথের অভ্যন্তরভাগ মিশে যাওয়া প্যানেল দ্বারা কারুকার্যমণ্ডিত। সম্ভবত মাটির বাঁধ দিয়ে তার পাশে ইটের দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা দেয়াল গড়ে তোলাই উদ্দেশ্য ছিল, যার কিছু অংশ এখনো দক্ষিণ-পশ্চিম কোনার পূর্বাংশে দেখতে পাওয়া যায়। ওই মাটির বাঁধের নিচে একটা ভূগর্ভস্থ কামরা, সম্ভবত এটা গরমকালে ব্যবহার করার জন্য নির্মিত হয়। প্লাস্টারের জাল বুনন দ্বারা কারুকার্যমণ্ডিত অর্ধাকৃতি গম্বুজের নিচ দিয়ে তৈরি একটা পথ দিয়ে ওই কামরায় প্রবেশ করা যায়। মাটির বাঁধের পূর্বদিকে আছে তোরণ শোভিত ইটের অট্টালিকা – এসব অট্টালিকা প্লাস্টার করা প্যানেল দ্বারা শোভিত ছিল এবং দক্ষিণ গেট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ গেট ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোনার মধ্যে দেখা যায় ৫টা অর্ধবৃত্তকার অষ্টকোণী বুরুজ, যার মধ্যে ছিল মাটি ভর্তি ও মাটির সাথে সমতল (সাধারণত, দুর্গের ওপর আত্মরক্ষার্থে নির্মিত সমতল উপরিভাগযুক্ত ঢিবি) স্থান। সদর দরজার পাশে যে বুরুজটি ছিল তার আকার অস্বাভাবিক বড় – ওই বুরুজের সাথে সমান্তরালভাবে ১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুট চওড়াবিশিষ্ট একটা প্লাটফরম ছিল বন্দুক রাখার জন্য। প্লাটফরমের ওপরের টাওয়ার ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে স্বাভাবিক আকারে তৈরি করা হয়। প্লাটফরমের দেয়াল ছিল ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি পুরু এবং এর প্রত্যেক দিকে একটা করে চতুষ্কোণী প্রবেশ পথ ছিল – এই প্রবেশ পথগুলো প্যানেল দ্বারা কারুকার্যমণ্ডিত ছিল বলে পূর্বে লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় নির্মিত টাওয়ারের সাথেও একটা প্লাটফরম ছিল, এই প্লাটফরমটি অবশ্য ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া। এসব বুরুজ ও প্রতিরক্ষা দেয়াল বাইরের দিক থেকে কারুকার্যখচিত এবং উপরের দিকটি সমতলভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। পাকিস্তান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দক্ষিণ গেট ও নিকটবর্তী বুরুজ বা আত্মরক্ষার্থে নির্মিত প্রাচীরের মধ্যে নতুন করে নির্মাণ কাজ শুরু করে; এর ফলে এই স্মৃতিস্তম্ভের প্রাচীন নিদর্শনের সৌন্দর্য হারিয়ে যায়।

দক্ষিণ গেট : লালবাগ দুর্গের স্থাপত্য শিল্পের মূল আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো দক্ষিণ গেট। নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকলেও এর স্বাভাবিক সৌষ্ঠব ও মার্জিত সৌন্দর্য দর্শকদের আকৃষ্ট করে। এর কাঠামো তিন তলাবিশিষ্ট, সামনের দিকের সব প্রান্তে সরু মিনার। উপরের তলার নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ; সম্মুখভাগের নিচের অংশ খোলার পর দেখা যায় চারটি মূলকেন্দ্রবিশিষ্ট খিলান – ইটের তৈরি অর্ধবৃত্ত গম্বুজের নিচে এ খিলানে ছিল পাথরের কাজ; গম্বুজে ছিল জাল প্যাটার্নের প্লাস্টার। সম্মুখভাগের তিনটি অস্থায়ী দুর্গের মধ্যে সবচেয়ে ছোট দুর্গটি চারটি মূলকেন্দ্রবিশিষ্ট অর্ধগম্বুজাকৃতির; এর মধ্যে ছিল প্যানেল দ্বারা সজ্জিত চোর-কুঠরি বা একান্ত স্থান। অপর দু'টো অস্থায়ী দুর্গের সামনের চতুর্দিকে ছিল দু'ভাগে বিভক্ত অলিন্দ জানালা; এই জানালার প্রান্ত শেষ হয় অর্ধবৃত্ত গম্বুজের সাথে। খোলা জানালার চারপাশে পিলারের ফ্রেম – ব্রাকেটের ছাঁচে ওই ফ্রেম সুরক্ষিত থাকে। অভ্যন্তরভাগের উঁচু স্থানের দু'টো কোনায় সজ্জিত ক্ষুদ্র গম্বুজাকৃতির সামিয়ানা। নিচের তলার গেট প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরভাগ গম্বুজাকৃতির – এর ছাদের নিচের দিক জাল-প্যাটার্নের প্লাস্টার ও অন্যান্য লতাপাতার ডিজাইন। গেটের সামগ্রিক বিবরণ থেকে এর অনুপম সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যের ধারণা পাওয়া যায় – এ সময়ে নির্মিত ঢাকার প্রায় সব বিল্ডিং-এ অনুরূপ সৌন্দর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

৯. ট্যাঙ্ক ও অডিয়েন্স (Audience) হল : উত্তর ও দক্ষিণ গেটের মাঝখানে একটা সুন্দর ট্যাঙ্ক আছে যা স্থাপত্য শিল্পের সুন্দর নিদর্শন – ট্যাঙ্কটি ২৩৫ ফুট সমচতুর্ভূজ আকারের। বর্তমানে (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে) ট্যাঙ্কটি ধ্বংস হওয়ার পথে। ট্যাঙ্ক থেকে ১৩০ ফুট পশ্চিমে একটা দোতলা বিল্ডিং আছে – ওই বিল্ডিং-এ একটা অতিরিক্ত গম্বুজের কাঠামো আছে যা বিল্ডিং-এর লাগোয়া। এটা অডিয়েন্স হল নামে পরিচিত। এর দ্বিতীয় তলা সম্ভবত অডিয়েন্স হল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এর স্নানাগার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে ব্যবহৃত স্থানটি ধ্বংস হয়ে গেছে; এখন আর তা চেনা যায় না। এসব স্থানে এমনভাবে সংস্কার করা হয়েছে যে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এ স্থান থেকে আরো ২৭৫ ফুট পশ্চিমে আছে বিবি পরীর সমাধি; এই সমাধি থেকে আরো ১৭০ ফুট পশ্চিমে আছে তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটা ছোট মসজিদ। এই মসজিদ দিয়েই আমাদের বর্ণনা শুরু করবো; কারণ এই মসজিদ ও দক্ষিণ প্রবেশ পথের স্টাইল এবং নির্মাণ সময় একই।

১০. লালবাগ মসজিদ : কথিত আছে যে, শাহজাদা মোহাম্মদ আজম এই মসজিদ নির্মাণ করেন; মসজিদের নির্মাণ কৌশল বা স্টাইল থেকে অবশ্য এ সত্য প্রমাণিত হয়। মসজিদটি দাঁড়িয়ে আছে একটা নিচু প্লাটফরমের ওপর – এর পরিকল্পনা কাঠামো এমন যে, এর প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য বেশি। এর দৈর্ঘ্য ৬৫ ফুট এবং প্রস্থ সাড়ে ৩২ ফুট; প্রতিটি কর্ণারে আছে প্লাস্টারের শামিয়ানাবিশিষ্ট মিনার। মসজিদে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে আছে তিনটি দরজা – মূল দরজাটি আকারে বেশ বড়। মূল দরজার দু'পাশে আছে সরু বা চিকন মিনার – কিছুটা প্রকাশযোগ্যভাবে উপস্থাপনের জন্য। প্রতিটি দরজার ওপরটা চতুষ্কোণবিশিষ্ট এবং এর নিচের দিকে অভ্যন্তরভাগে জাল প্যাটার্নবিশিষ্ট অর্ধ গম্বুজাকৃতিসহ একাধিক চূঁড়াবিশিষ্ট খিলান বিদ্যমান। এ ছাড়াও আছে দেয়ালে একাধিক প্যানেল, যার ওপরে আছে সচ্ছিদ্র প্রাচীর (ছিদ্রের ভেতর থেকে তীর, গোলাগুলি ইত্যাদি ছোঁড়া হয়) – সবকিছু মিলিয়ে বিল্ডিং-এর বাইরের দিকটা বেশ মুগ্ধকর। তিনটা গম্বুজ দিয়ে ছাদ আবৃত – মূল গম্বুজটা অন্য দুই গম্বুজ থেকে বেশ বড়। অষ্টকোণী ড্রাম বা ঢক্কাকার বস্তুর ওপর গড়ে তোলা হয়েছে এসব কারুকার্যখচিত উজ্জ্বল গম্বুজ। উভয় পার্শ্বের গম্বুজগুলো কিছুটা স্ফীত এবং একেবারে নিচু থেকেই লতাপাতা প্যাটার্নের কারুকার্যখচিত। এসব কারুকাজ অত্যন্ত স্বাভাবিক বা মূল অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। অভ্যন্তরীণভাবে তিনটি স্তম্ভের মধ্যকার দূরত্ব ও আকার সমান; বাইরের দিকে গম্বুজের ব্যাসার্ধ ওপর থেকে আনত অর্ধগম্বুজের সমান করতে গিয়ে হোট করতে হয়েছে – গম্বুজের এই ব্যাসার্ধ থেকেই মূল গম্বুজের কাঠামো শুরু হয়। মূল কাজের প্রক্রিয়া শুরু এখান থেকেই এবং মূল গম্বুজটা কতো বড় করা হবে তা ঠিক করা হয়। প্রয়োজনবোধে মসজিদের দীর্ঘতা কমিয়ে এনে পার্শ্ববর্তী গম্বুজের পরিকল্পনা করা হয়। মসজিদের চওড়া যতোটা তার তিনগুণ বেশি দীর্ঘ করা হয় – তবে মূল গম্বুজের ব্যাসার্ধ প্রশস্ত বা চওড়া অংশের সমান রাখা হয়। ফলে পার্শ্ববর্তী গম্বুজগুলো ছোট করতে হয়।

১১. বিবি পরীর সমাধি : নবাব শায়েস্তা খানের মেয়ে বিবি পরীকে (আসল নাম ইরান দুখত) শাহজাদা মোহাম্মদ আজমের সাথে বিয়ের জন্য বাগদান করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিবি পরী ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যায়।[১২] তাঁর মৃতদেহের ওপর এই সমাধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মাণ করেন শায়েস্তা খান। এ জন্য তিনি উত্তর ভারত থেকে নির্মাণ সামগ্রী আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি রাজমহল থেকে কালো পাথর, চুনার থেকে বেলে পাথর এবং জয়পুর থেকে সাদা মার্বেল পাথর আনার ব্যবস্থা করেন। সমাধিটি ঠিক আগের মতোই আছে, তবে এর দক্ষিণ গেটের সৌষ্ঠব ম্লান হয়ে গেছে।

একটা প্লাটফর্মের মাঝখানে সমাধিটি অবস্থিত – প্রথমে ওই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করা হয় পাথর দিয়ে। সমাধির বাইরের দিকটি ৬০ ফুট আয়তাকারবিশিষ্ট – এর কোনায় কোনায় যে মিনার আছে তার গম্বুজ অষ্টকোণী। এর প্রধান প্রবেশ দ্বারে আছে চারটি কেন্দ্রবিন্দুবিশিষ্ট উঁচু অলঙ্কারপূর্ণ খিলান, যা উন্মুক্ত হয়েছে একটা অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজের নিচে। এই অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ স্থাপিত হয়েছে প্রসারিত ভর-এর ওপর, যার প্রান্তে আছে সরু খাঁজকাটা মিনার। পাশের প্রবেশ পথগুলো সাধারণ সমান্তরাল খিলানবিশিষ্ট – এর ওপরে আছে অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ। এই খিলানের ওপরে আছে বাড়তি খিলানবিশিষ্ট জানালা। দেয়াল ও টাওয়ারে কোনো প্যানেল নেই। ছাদের কিনারার নিচের দিকে আছে সমতল কার্নিস – মধ্যখানের দিকে কিছুটা উঁচু। ছাদের ওপর আছে তাম্রনির্মিত গম্বুজ, কিছুটা স্ফীতাকার; একটা অষ্টকোণী ড্রামের ওপর ওই গম্বুজটি স্থাপিত। এই গম্বুজের ওপর আছে পদ্মফুলের কারুকাজ – আগে এটা জ্বলজ্বল করতো। সমাধির অভ্যন্তরে আছে ৯টি ভাগ – মূল সমাধি অংশ, ১৯ ফুট ২ ইঞ্চি বর্গাকৃতি, ৪টি কোনার কামরা, প্রতিটি কামরা ১০ ফুট সাড়ে ৩ ইঞ্চি এবং চারপাশে আয়তক্ষেত্রের মতো চারটি যাতায়াতের স্থান, প্রতিটি স্থান ২৪ ফুট সাড়ে ৮ ইঞ্চি×১০ ফুট সাড়ে ৮ ইঞ্চি পরিমাণ।

সমাধিটির মধ্যে প্রবেশের জন্য চারটি দরজা আছে; কিন্তু তিনটি দরজা মার্বেল আবরণ দিয়ে বন্ধ করা আছে; দক্ষিণ দিকের দরজা তৈরি চন্দন কাঠের – এতে আছে আড়াআড়িভাবে রেখার সুন্দর ডিজাইন, যাকে বলা হয় চীনা ক্রসের কারুকাজ। সমাধির দেয়ালের ভেতরের দিকটা সাদা মার্বেল; ওই সাদা মার্বেল দিয়ে একই প্যাটার্নে তৈরি করা হয়েছে সমাধির মেঝে। মধ্যস্থলে আছে মার্বেলের স্মৃতিস্তম্ভ। এটা তৈরি হয়েছে তিনটি ধাপে। এ ধাপের সম্মুখভাগে বৃক্ষপাত্রের কোনো ডিজাইন নেই, তবে এর কোনা খুবই সরু। বিস্ময়কর বিষয় যে, এর ছাদ তৈরি করা হয়েছে প্রাচীন হিন্দু স্টাইলে – একটার ওপর একটা পাথর বসিয়ে স্তর সৃষ্টি করে; এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ সোজা লাইনের অষ্টকোণী পিরামিড। একেবারে শীর্ষে আছে তামা দিয়ে তৈরি গম্বুজ।

যাতায়াত পথের পাশের কামরাগুলোর অভ্যন্তর দিকে কিছুটা পরিমাণ উঁচু এলাকা জুড়ে আছে মার্বেল পাথর; কোনার কামরাগুলোতে উজ্জ্বল টাইল ছিল (এখন আর ওই উজ্জ্বল টাইল নেই, শুধুমাত্র সাদা চুনকাম করা আছে)। কানিংহাম বর্ণনা করেন যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলুদ রঙের ওপর স্থাপিত প্যানেলের রং ছিল ঘন নীল, কমলা, সবুজ ও রক্তবর্ণ। এসব কামরার ছাদ তৈরি করা হয় একইভাবে, অর্থাৎ একটার ওপর একটা পাথর বসিয়ে পিরামিড আকারে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কোনার কামরায় শায়িত আছে বিবি পরীর এক আত্মীয়, তাঁর নাম শামশাদ বেগম। বিবি পরীর সমাধির দক্ষিণ দিকে সমতল স্থানে দেখতে পাওয়া যায় বুলন্দ খানের সমাধি – বুলন্দ খান ছিলেন হক বন্দে খানের পুত্র, হক বন্দে খান ছিলেন খোদাবন্দে খানের পুত্র। কথিত আছে যে, বুলন্দ খান ছিলেন শায়েস্তা খানের পৌত্র।[১৩]

একটা সমাধির অভ্যন্তরে একাধিক কামরা নির্মাণ করার ধারণা নিঃসন্দেহে তাজমহল ও হুমায়ুনের সমাধি নির্মাণের ধারণা থেকে আসে। মার্বেল ব্যবহারের ধারণা সম্ভবত একই সূত্র থেকে আসে। কিন্তু বিবি পরীর সমাধি বাংলার একটি সমৃদ্ধ সাফল্যমণ্ডিত অর্জন হলেও তা তাজমহল বা হুমায়ুনের সমাধির সমকক্ষ নয়। বিবি পরীর সমাধি নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হলেও এর স্থাপত্য শিল্পে সৌষ্ঠবের চিহ্ন খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

১২. ফররুখ সিয়রের মসজিদ : এই মসজিদটি অবস্থিত লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ গেটের দক্ষিণ দিকে। এই মসজিদটি নির্মাণ করেন শাহজাদা ফররুখ সিয়র (পরে সম্রাট) – তিনি তাঁর পিতা শাহজাদা আজিম-উশ-শানের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকায় দায়িত্ব পালনকালে (১৭০৩-১৭০৬ খ্রিস্টাব্দ) এই মসজিদ নির্মাণ করেন।

এই মসজিদটি অত্যন্ত বড় এবং বেশ প্রশস্ত – ১৬৪ ফুট×৫৪ ফুট; ঢাকার বড় মসজিদগুলোর মধ্যে একটি। কিন্তু এ মসজিদের স্থাপত্য শিল্পবিষয়ক কোনো সৌন্দর্য প্রায় নেই। প্রথমে এই মসজিদের ছাদ তৈরি করা হয় কাঠ ও কাঠের তক্তা দিয়ে। কিন্তু এই ছাদ ধ্বংস হওয়ার পর ঢাকার নবাব স্যার আবদুল গনি বাহাদুর প্রায় আশি বছর পূর্বে (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে একথা বলা হয়) এর ছাদ নির্মাণ করেন।[১৪] এ সময় ওই মসজিদের সাথে আজান দেয়ার জন্য একটা মিনার নতুনভাবে সংযোজন করা হয়। এটা একটা বিশেষ ধরনের মিনার, যা দেশের অনেক মসজিদে দেখতে পাওয়া যায়।

১৩. খান মোহাম্মদ মির্ধার মসজিদ মসজিদটি আতিশখানা মহল্লায় অবস্থিত – লালবাগ থেকে যে রাস্তাটি পশ্চিম দিকে গেছে, সেই রাস্তা দিয়ে ওই মসজিদে যাওয়া যায়। শায়েস্তা খান-পরবর্তী যুগের স্টাইল এই মসজিদের নির্মাণ কৌশলে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। প্রধান দরজার ওপর যে স্মৃতিফলক আছে তা থেকে জানা যায় যে, কাজী ইবাদুল্লাহর নির্দেশে খান মোহাম্মদ মীর্ধা এই মসজিদ নির্মাণ করেন ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে (১১১৬ হিজরি সাল)।[১৫] মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে সাড়ে ১৬ ফুট উঁচু প্লাটফরমের ওপর – মসজিদের নিচে আছে একাধিক কামরা; ওই কামরার ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে ধনুকাকৃতি খিলান। আসল মসজিদটি খুবই ছোট – মাত্র ৪৮ ফুট লম্বা এবং ২৪ ফুট প্রশস্ত; কোনার মিনারগুলো ছাদের কার্নিস থেকে বেশ উঁচু এবং তার প্রান্তসীমায় আছে শোভা বর্ধনের জন্য গম্বুজ। পূর্বদিকে আছে তিনটি প্রবেশ পথ – প্রত্যেকটি প্রবেশ পথের ওপরে আছে প্রসারিত মিনারসহ অর্ধ-গম্বুজ। দেয়ালে আছে একাধিক প্যানেল। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথের পাশ থেকে আংশিক প্রলম্বিত চতুষ্কোণ স্তম্ভ বা মিনার আছে। পশ্চিম দিকের দেয়ালের সাথে আছে তিনটি মেহরাব। সচ্ছিদ্র দেয়ালের ওপরে আছে তিনটি গম্বুজ; মাঝখানের মূল গম্বুজটি অন্য দু'টির চেয়ে বড়। গম্বুজগুলো কারুকার্যমণ্ডিত এবং তার অবস্থান অষ্টকোণী ড্রামের ওপর। মসজিদের অভ্যন্তরভাগে আছে স্তম্ভের মধ্যবর্তী তিনটি স্থান এবং পশ্চিম দিকে আছে কারুকার্যখচিত তিনটি মেহরাব।

মসজিদের উত্তর-পূর্ব দিকে ওই একই প্ল্যাটফরমের ওপর আর একটা বিল্ডিং আছে; বিল্ডিংটি মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহৃত হয় – এখানে মূলত কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়। এ বিল্ডিংটির নিচে দুটো সমচতুর্ভূজ আকারের দু'টো হল ঘরের মতো কামরা আছে – মূল হল ঘরে চূঁড়াবিশিষ্ট তিনটি উন্মুক্ত খিলানের মধ্যদিয়ে প্রবেশ করা যায়; এই উন্মুক্ত স্থানের ওপরে আছে ছাউনি। আইয়ুবী ও মামলুক যুগে (এগারো থেকে পনেরশ' শতাব্দী পর্যন্ত) মিসরে মুসলমানদের জন্য ব্যাপকভাবে নির্মিত মাদ্রাসা-বিল্ডিং-এর অনুরূপ ছিল এই বিল্ডিংটা।

গ. চকে নির্মিত ও সমজাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ

চার্লস ডি'ওলি ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে লেখেন 'চক বা ঢাকার বাজার এলাকা খুবই প্রাচীন এবং শহরের যে এলাকায় বাজারটি অবস্থিত তা এখনো প্রাচীন সেই নাম অর্থাৎ চকবাজার নামেই পরিচিত। এই বাজারটি প্রতিষ্ঠা করেন মুর্শিদ আলী খান (Moorshed Ally Khan); এর আয়তন প্রায় ২শ' বর্গগজ। এখানে প্রতিদিন বিক্রির জন্য ফল, শাক-সবজি, সাধারণ জিনিসপত্র, খেলনা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি আনা হয়। সন্ধ্যার সময় এখানে দলে দলে লোক জড়ো হয়।'[১৬] ড. টেলর (Dr. Taylor) ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে লেখেন 'এলাকাটি বর্গাকারবিশিষ্ট এবং এর চতুর্দিক মূলত মসজিদ ও দোকান দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাজার বসে খোলা জায়গায়; জায়গাটি নিচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আছে। বাজার প্রাচীরের চারপাশ দিয়ে গাড়ি চলাচলের রাস্তা আছে। বাজারের কেন্দ্রস্থলে একটা বড় কামান রক্ষিত আছে – কয়েক বছর আগে ওই কামানটি নদীর তীরে পাওয়া যায়।'[১৭] ডি'ওলি লেখেন মুর্শিদ আলী খান – এটা ভুল। আসলে তাঁর নাম মুর্শিদ কুলী খান – তিনি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা স্মৃতিফলক থেকে জানা যায়, তিনি ১১১৪ হিজরি সালে (১৭০২ খ্রিস্টাব্দে) চক নির্মাণ করেন।[১৮] কিন্তু ড. টেলর উল্লেখ করেন যে, চক নির্মাণ করেন মি. ওয়ালটার্স – তিনি কিছুকাল ঢাকার কালেক্টর ছিলেন। এখনো চকবাজার একটি ব্যস্ত ও কর্মমুখর এলাকা।

১৪. চক মসজিদ : চকবাজারের পশ্চিম পার্শ্বে এই মসজিদটি অবস্থিত। মূল বিল্ডিং-এর প্রধান প্রবেশ পথের ওপরে রক্ষিত একটা নামফলক থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি নির্মাণ করেন নবাব শায়েস্তা খান, হিজরি ১০৮৬ সালে (১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে)। এর নির্মাণ কৌশল ও স্থাপত্য শায়েস্তাখানি স্টাইলের এবং চকবাজার এলাকায় তা এখনো লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান আছে।

মসজিদটি ১০ ফুট উঁচু একটা প্লাটফরমের ওপর অবস্থিত – এর আয়তন ৯৪ ফুটx৮০ ফুট। প্লাটফরমের নিচে আছে একাধিক কামরা – এসব কামরা দোকানদারদের কাছে ভাড়া দেয়া হয়েছে – ভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয় থেকে মসজিদের সংস্কার কাজ ভালোমতো চলে যায়। এই আয় থেকে মসজিদের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ কাজ করাও মসজিদের তত্ত্বাবধানকারীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। মূল মসজিদের আয়তন ছিল ৫০ ফুটx২৬ ফুট – এর ছাদের ওপর ছিল তিনটি গম্বুজ। মসজিদের পূর্ব দিকের বাইরের অংশটি ছিল প্যানেল দ্বারা সুসজ্জিত। মূল প্রবেশ পথের সম্মুখভাগ ছিল সুন্দর ও দর্শনীয়। মসজিদের কোনার মিনার এবং আজান দেয়ার মিনার সার্বিক সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে। মসজিদের অভ্যন্তর হল ঘরটি সম্পূর্ণভাবে সংস্কার করা হয়েছে। মেহরাবগুলোতে ইনামেলের দীপ্তিপূর্ণ খণ্ড লাগিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ করা হয়েছে এবং মেঝেয় মার্বেল লাগানো হয়েছে।

১৫. করতলব খানের মসজিদ এই মসজিদটি অবস্থিত বেগমবাজার রোডে; জেলখানা বা চকবাজারের দিক থেকে এই মসজিদে যাওয়া যায়। করতলব খান হলো মুর্শিদ কুলী খানের পদবি – তিনি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে (১৭০০-১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ) মুর্শিদ কুলী খান এই মসজিদ নির্মাণ করেন।[১৯] শায়েস্তাখানি আমলের পর যে স্থাপত্য শিল্পের অগ্রগতি ঘটে তার ব্যাপক প্রকাশ ঘটে এই মসজিদের নির্মাণ কৌশলে।

মসজিদটি একটি উঁচু প্লাটফরমের ওপর অবস্থিত – এর নিচে আছে একাধিক কামরা, যা এখন দোকান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্বদিকে তৈরি সিঁড়ি দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। এখন একটা আধুনিক প্রবেশ পথ এবং আজান দেয়ার জন্য একটা ফাঁপা মিনার তৈরি করা হয়েছে। এই মসজিদের নির্মাণ কৌশলে বেশকিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, প্রাথমিক পর্যায়ের তিন গম্বুজ মসজিদের পরিবর্তে এটা তৈরি করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে পাঁচ গম্বুজ মসজিদ হিসেবে। দ্বিতীয়ত, মসজিদের উত্তর পাশে সংযুক্ত আছে একটা কামরা, যার ছাদ বাঙলা ছাদের মতো – এর পঞ্চকোণী জোড়া দৃশ্যমানভাবে বাঁকা ও নিম্নাভিমুখী; ঠিক যেন বাঙলা দোচালা ঘরের ছাদের মতো। আর ডি ব্যানার্জি মনে করেন, ঐ কামরাটি তৈরি করা হয় ইমামের বসবাসের জন্য।[১০] তৃতীয়ত, মসজিদের পূর্বপার্শ্বে একই সময় একটা কুয়া নির্মাণ করা হয়; ঐ কুয়ায় নিচের দিকে নামার জন্য সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়। এ ধরনের সিঁড়িযুক্ত কুয়া বাংলায় আর নেই; কিন্তু মুসলিম আমলে উত্তর ভারতে এ ধরনের কুয়া যথেষ্ট ছিল।

মূল মসজিদের পূর্বদিকে পাঁচটি বড় খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে – প্রতিটি খিলানই একটা অর্ধগম্বুজের নিচে অবস্থিত; প্রতিটি খিলানের সাথে আছে প্রলম্বিত সরু মিনার, যার চূঁড়া অলঙ্কারপূর্ণ ছাদের কিনারার উপরে প্রসারিত। পশ্চিম দিকের দেয়ালের অভ্যন্তরভাগ নির্মিত মেহরাবের কিনারা মিনার দ্বারা সুসজ্জিত। অলঙ্কারপূর্ণ অষ্টকোণী ড্রামের ওপর নির্মিত গম্বুজগুলো পদ্মফুলের স্থাপত্য দ্বারা শোভিত। অভ্যন্তর হলটি পাঁচটি স্তম্ভ দ্বারা বিভক্ত, প্রতিটি ভাগের পশ্চিমদিকে আছে জাঁকজমকপূর্ণ মেহরাব এবং ছাদের নিচে অলঙ্কারপূর্ণ গম্বুজ। অলঙ্কারপূর্ণ কাজের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ এবং স্থাপত্য কাজের বিস্তৃতি থাকা সত্ত্বেও মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়নি। এতে শুধু অতিরিক্ত সম্পদের কথা প্রকাশ পায়।

১৬. হোসাইনী দালান : জেলখানা থেকে স্যার নাজিমউদ্দিন রোড দিয়ে রমনার দিকে যাওয়ার সময় রেলক্রসিং-এর আগেই পশ্চিমদিকে একটা রাস্তা গেছে – ওই রাস্তাটির নাম হোসাইনী দালান রোড (বর্তমানে ওই রেলক্রসিং নেই – রেল রাস্তাটি তুলে দেয়া হয়েছে)। ওই রাস্তা দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ইমামবাড়া (ধর্মীয় স্মৃতিসৌধ) হোসাইনী দালানে যাওয়া যায়। একটা জাঁকজমকপূর্ণ তোরণের মধ্যদিয়ে প্রাচীরবেষ্টিত এলাকার মধ্যে প্রবেশ করতে হয় – ওই এলাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই দালানটি। একটা পুকুরের উত্তর পার্শ্বে এই দালানের অবস্থান। অত্যন্ত ধুমধামের সাথে এখানে প্রতিবছর মুহররম পালিত হয়।

হোসাইনী দালান নির্মাণের তারিখ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এ দালানের পূর্ব দেয়ালে সংযুক্ত লালচে বেলে পাথরের নামফলকে বিল্ডিং নির্মাণের সাল লেখা ছিল ১০৫২ হিজরি সাল (১৬৪২ খ্রিস্টাব্দ)। হাকিম হাবীবুর রহমান ওই তারিখের সত্যতা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, উল্লেখিত ওই নির্মাণ তারিখ সঠিক নয়। তিনি মনে করেন না যে, মীর মুরাদ ওই ইমামবাড়ার নির্মাতা। তাঁর মতে, প্রাচীনকাল থেকেই (তারিখ জানা যায় না) এখানে একটা ছোট তাজিয়াখানার অস্তিত্ব ছিল এবং নবাব নসরত জঙ্গ (মৃত্যু ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ) জাঁকালো এই বিল্ডিং নির্মাণ করেন। ১৮৯৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পের পর নবাব স্যার আহসানউল্লাহ এর সংস্কার কাজ করেন। চার্লস ডি'ওলি ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে বেশকিছু নকশা প্রণয়ন করেন; তিনি চক মসজিদের নকশা প্রণয়ন করেন এবং লেখেন 'বাজারের অপরদিকের এই সরকারি মসজিদটি হলো বর্তমান নবাবের ইবাদতের প্রধান স্থান – তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। মসজিদটি নির্মাণ করা হয় ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে এবং একে বলা হয় হোসাইনী দালান।'[২২] ডি'ওলি নিশ্চিতভাবে ভুল করেন; তিনি চক মসজিদকে বর্ণনা করেন হোসাইনী দালান হিসেবে – হোসাইনী দালানের নকশাও তিনি প্রদান করেননি। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ড. টেলর লেখেন 'মুসলমানদের প্রধান ইবাদতের স্থান হলো ঈদগাহ ও হোসাইনী দালান; মীর মুরাদ হোসাইনী দালান নির্মাণ করেন বলে কথিত আছে। এই মীর মুরাদ ছিলেন নওয়ারা মহলের দারোগা এবং সুলতান মোহাম্মদ আজিমের সময় তিনি সরকারি বিল্ডিং-এর দায়িত্বে ছিলেন। এই দালান সম্পর্কে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে যে, মীর মুরাদ স্বপ্নে দেখেন ইমাম হোসাইন একটা তাজিয়াখানা বা শোকগৃহ নির্মাণ করছেন এবং তাঁকে পরে এই দালানটি নির্মাণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়; তিনি ওই বিল্ডিং-এর নামকরণ করেন হোসাইনী দালান হিসেবে। মুহররমের সময় এই দালানের আলোকসজ্জা ও এই উৎসবের সময় গরীবদের খাওয়ানোর খরচ তিনি নিজে বহন করতেন; এ জন্য তিনি যে ভাতার ব্যবস্থা করেন তা প্রদেশের গভর্নরগণ অব্যাহত রাখেন। এই উদ্দেশে সরকার বছরে নবাবকে আড়াই হাজার টাকা প্রদান করেন।'[২৩] ডি'ওলি ছিলেন নসরত জঙ্গের সমসাময়িক; টেলর আসেন আরো কিছু পরে। নসরত জঙ্গ হোসাইনী দালান নির্মাণ করেছেন, একথা তাঁদের কেউ বলেননি। সুতরাং হাকিম হাবীবুর রহমানের বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না। কিছু নির্মাণ কাজ মীর মুরাদ নিশ্চয়ই করেছিলেন; কিন্তু ওই নির্মাণ কাজের সময় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। টেলর বলেন যে, মীর মুরাদ ছিলেন মোহাম্মদ আজমের সময়কালে অর্থাৎ ১৬৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে। অথচ এখানে প্রাপ্ত এক স্মৃতিফলক থেকে দেখা যায়, মীর মুরাদ মারা যান ১১৩১ হিজরি সালে (১৭১৮ খ্রিস্টাব্দ)। মূল বিল্ডিং কেমন ছিল তা এখন আর নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কারণ এ সম্পর্কে কেউ কোনো বিবরণ উল্লেখ করেননি। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায়, নবাব জেসারত খান অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে হোসাইনী দালান পুনঃনির্মাণ করেন; হাকিম হাবীবুর রহমান এই দালানের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন তাতে ওই কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়।

একটা উঁচু প্লাটফরমের ওপর নির্মিত হয় হোসাইনী দালান। এর নিচে আছে বেশ কয়েকটা কামরা, ওইসব কামরায় আছে বেশ কয়েকটি সমাধি। প্লাটফরমের ওপর নির্মিত অট্টালিকায় ওঠার জন্য পূর্বদিকে সিঁড়ি আছে। প্লাটফরমের ওপরে আছে মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দালান (আয়তাকার হল), এর মাঝখানে ছোট একটা বদ্ধজলাশয়, উত্তর ও দক্ষিণদিকে ঝুলন্ত বারান্দা এবং পূর্ব ও পশ্চিমদিকে পাশাপাশি তিনটি করে কামরা। একমাত্র উত্তরদিকের কামরাটি ছাড়া দোতলা বিল্ডিং-এর পার্শ্ববর্তী সব কামরাতেই লম্বা বারান্দা বা দরদালান আছে। উত্তরদিকে একটা অতিরিক্ত বারান্দা নির্মাণ করা হয়। বিল্ডিং-এর দক্ষিণদিককার উন্মুক্ত অংশের দৃশ্য খুবই আকর্ষণীয়। তিনটি স্তরে অষ্টকোণী কক্ষদ্বারা বেষ্টিত খিলানের একটা আবরণ (বর্তমানে খিলানের পরিবর্তে নির্মাণ করা হয়েছে আধুনিক পিলার বা স্তম্ভ এবং লম্বা কড়ি দিয়ে বীম বা আলম্ব) – প্রতিটি স্তরেই আছে দৃশ্যযোগ্য সমতল স্থান ও কক্ষের জানালা; এর ওপরে শোভিত আছে একটা করে গম্বুজ। ছাদের কিনারায় আছে অস্পষ্ট রঙ এবং ওপরের চারটি কোনায় আছে পিলার করা শামিয়ানা। বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরভাগ দেখতে অনেকটা আধুনিক ধরনের। এটা যে কতোটা প্রাচীন তা বলা বেশ কঠিন। একটা বিল্ডিং-এ সমাহিত আছেন ঢাকার সর্বশেষ নায়েব নাজিম।

১৭. বড় কাটরা : চক-এর দক্ষিণদিকে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত বড় কাটরা; এটা অত্যন্ত উঁচুস্তরের জাঁকজমকপূর্ণ একটা বিল্ডিং এবং ঢাকায় মোগল যুগের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এই বিল্ডিং-এর বৈশিষ্ট্য কাটরা বিল্ডিং (চতুর্দিকে ঘেরা চতুষ্কোণ সমতল ক্ষেত্রবিশিষ্ট)-এর মতো; নদীর দিকে সম্মুখভাগ বিশাল আকারের। এটা সফরকারীদের সরাইখানা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। আউলাদ হাসান এই বিল্ডিং-এর সাথে সম্পর্কিত দু'টো স্মৃতিফলকের কথা উল্লেখ করেন। প্রথম স্মৃতিফলকে এই প্রকাণ্ড বিল্ডিং-এর প্রশংসা করা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১০৫৩ হিজরি সালে (১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ) এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আবুল কাসিম। দ্বিতীয় স্মৃতিফলকে লেখা আছে 'সুলতান শাহ সুজা বাহাদুর তাঁর পরহিত কাজের জন্য প্রসিদ্ধ; এ ধরনের কাজের জন্য তিনি আল্লাহর দয়া পাবেন বলে আশা করা যায়। তাঁর ভৃত্য আবুল কাসিম আল-হোসাইনী, আত-তাবতাবা, আস-সিমনানি, এই পবিত্র অট্টালিকা নির্মাণ করেন – এই অট্টালিকার সাথে তিনি বাইশটি দোকান নির্মাণ করেন, যেন এই অট্টালিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তারা যথার্থ ও আইনগতভাবে ওইসব দোকান থেকে প্রাপ্ত আয় দ্বারা অট্টালিকার সংস্কার কাজ সমাধা করতে পারেন এবং গরিবদের সাহায্য করতে পারেন; এই অট্টালিকায় যারা আশ্রয় গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে যাদের ভাড়া দেয়ার সামর্থ্য নেই তাদের কাছ থেকে তারা ভাড়া গ্রহণ করবে না। ফলে এই পবিত্র কাজ যেন সম্রাটের ওপর এই দুনিয়ায় প্রতিফলিত হতে পারে। এর বিপরীত অর্থাৎ তারা যেন কোনো অন্যায় কাজ না করে, অন্যথায় শেষ বিচারের দিন তাদেরকে হিসাব দেয়ার জন্য ডাকা হবে। এই স্মৃতিফলক ১০৫৫ হিজরি সালে (১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ) লেখেন সাদউদ্দীন মোহাম্মদ শিরাজী।'[২৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় কাটরা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর উত্তর অংশ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; পূর্ব ও পশ্চিম অংশ কিছুটা সংরক্ষিত আছে। দক্ষিণ অংশ মোটামুটি এখনো সংরক্ষিত আছে। তবে মূল প্রাঙ্গণে নতুন বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে এবং বর্তমান কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। রেনেলের ম্যাপ থেকে এই বিল্ডিং-এর মূল পরিকল্পনার ধারণা পাওয়া যায়। ওই ম্যাপ থেকে ধারণা করা যায় যে, একটা উন্মুক্ত চতুষ্কোণবিশিষ্ট সমতলক্ষেত্র; এর চতুর্দিক তোরণশোভিত কামরা দ্বারা পরিবেশিষ্টত – এর উত্তর ও দক্ষিণদিকে প্রধান প্রবেশ পথ।

বিল্ডিং-এর দক্ষিণদিক অর্থাৎ নদীরদিকের দৃশ্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় – বিল্ডিং-এর এই দিকটা লম্বা ২২৩ ফুট। এই বিল্ডিংটি যখন প্রসিদ্ধি লাভ করে তখন বুড়িগঙ্গা নদী দিয়ে নৌকায় আগত ভ্রমণকারীদের দৃষ্টিতে এর দক্ষিণ অংশ ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মুগ্ধকর। বিল্ডিংটির এই অংশের মাঝখানে ছিল তিন তলাবিশিষ্ট বিরাট প্রবেশ পথ – ওই প্রবেশ পথের দু'পাশে ছিল দ্বিতলবিশিষ্ট অট্টালিকা; ওই দ্বিতলবিশিষ্ট অট্টালিকার দুই প্রান্তে ছিল ফাঁপা অষ্টকোণী টাওয়ার, যার উচ্চতা ছিল তিনতলা অট্টালিকার সমান। মূল প্রবেশ পথের দু'পাশে যে অট্টালিকা ছিল তাতে প্রবেশের জন্য ক্ষুদ্র ধনুকাকৃতির তোরণ ছিল, আর নিচতলায় ছিল বসবাসের জন্য কামরা; ওই কামরার জানালা ছিল নদীর দিকে। মূল প্রবেশ পথটি ছিল লক্ষণীয়ভাবে সামনের দিকে প্রলম্বিত; প্রবেশ পথের সম্মুখভাগ লম্বা মিনার দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। বাইরের দিক থেকে উঁচু অর্ধগম্বুজাকৃতির ধনুকাকৃতি খিলান দ্বিতীয় তলার ওপর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; ওই অর্ধ-গম্বুজের নিচের অংশ ছিল প্লাস্টার করা জাল বুনন-দ্বারা শোভিত। ধনুকাকৃতি খিলানের ওপরের জানালা তিনতলার – ওই জানালার দু'পাশে লম্বালম্বি যে প্লাস্টার করা প্যানেল আছে তাতে চতুষ্কোণবিশিষ্ট, চূঁড়া, ঘোড়ার পা ও সমান্তরাল ধনুকাকৃতি খিলানের চিহ্ন ছিল। ওই ধনুকাকৃতি খিলানের দরজা-পথ খোলার পর দেখা যায় গার্ড রুম। এখান থেকে একটা অষ্টকোণী গম্বুজের কামরায় যাওয়া যায়, ওই কামরার ব্যাসার্ধ হলো ২৭ ফুট ৩ ইঞ্চি। ওই কামরার ছাদের নিচের অংশ সুন্দরভাবে প্লাস্টার করা জাল-বুননের মতো; এতে ব্যাপকভাবে লতাপাতার ডিজাইনও ছিল। একাজে ব্যবহৃত মূল রঙের কিছু নমুনাও দেখতে পাওয়া যায়। মূল প্রবেশ পথের দু'পাশে যে নির্মাণ কাঠামো ছিল তা প্রথমে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয় সারিবদ্ধভাবে অস্পষ্ট চিহ্ন দ্বারা, যেন দুই স্তরের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা যায়। নিচের তলার অতিরিক্ত ধনুকাকৃতির প্রবেশ পথ থেকে শুরু দীর্ঘ পথ দিয়ে মাটির নিচে নির্মিত ঘরে প্রবেশ করা যায়। দুই প্রান্তের টাওয়ার সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয় প্যানেল দ্বারা; বাইরের অংশের নিচের দুই স্তরে। তৃতীয় স্তরে আছে জানালার জন্য উন্মুক্ত স্থান। আঙ্গিনার দিক থেকে প্রবেশপথের দুই দিকের যে কোনো দিকের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যাওয়া যায়। দোতলায় সিঁড়ির কাছে একাধিক সারিবদ্ধ কামরা আছে, যা প্রস্থ অপেক্ষা অধিকতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এবং যার উত্তর দিকে আছে লম্বা বারান্দা। মূল প্রবেশ পথের ওপর তৃতীয় তলায় ঠিক একই রকম একটি কামরা ও বারান্দা আছে। ওপরতলার কামরাগুলো সম্ভবত উচ্চশ্রেণীর দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

মোট কথা, প্লাস্টার করা ইটের কাজের ওই স্মৃতিসৌধটি তৈরি করা হয় অত্যন্ত শক্তভাবে। আরামদায়কভাবে বসবাস করার সুন্দর ব্যবস্থাও এরমধ্যে ছিল। এই বিল্ডিংটি যিনি নির্মাণ করেন তাঁর একথা বলার অধিকার আছে –
'অত্যুচ্চ এই বিল্ডিং উচ্চ আকাশের অবলম্বন
ভৃত্য আবুল কাসিম এর ভিত্তি স্থাপনকারী। কেমন সুন্দর এই বিল্ডিং!
এই বিল্ডিং উচ্চ আকাশের মহিমাকেও ম্লান করে
এই বিল্ডিংকে আপনি বলতে পারেন –
বেহেশতের একটা নমুনা কপি।'

কিন্তু বর্তমানে অতীতের গৌরব অতিমাত্রায় ভিড়, কুঁড়েঘর ও দোকান এবং স্থানীয় লোকদের অমার্জিত আচরণের মাঝে হারিয়ে গেছে; ওই গৌরব এখন অন্ধকার কামরা ও জঙ্গলপূর্ণ কুলুঙ্গির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। মানুষ তার অবহেলার কারণে তাদের মহান ঐতিহ্যের মূল্য বিস্মৃত হয়েছে।

১৮. ছোট কাটরা : বড় কাটরা থেকে প্রায় দু'শ গজ পূর্বে ছোট কাটরা অবস্থিত। বড় কাটরা থেকে একটা ছোট গলিপথে ছোট কাটরায় যাওয়া যায়। মিটফোর্ড থেকে হাকিম হাবীবুর রহমান রোড দিয়ে ছোট কাটরায় যাওয়া যায়।

নবাব শায়েস্তা খান ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে ছোট কাটরা নির্মাণ করেন। সম্ভবত অন্যান্য বড় বড় বিল্ডিং প্রজেক্টের সাথে ছোট কাটরা প্রজেক্টের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। অন্যান্য প্রজক্টের মধ্যে ছিল – একটা প্রাসাদ, একটা মসজিদ ও পোস্তা নামের একটা বড় বাঁধ। ওই বাঁধটি ছিল মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে লালবাগ পর্যন্ত বুড়িগাঙ্গা নদী বরাবর।[৫] বড় কাটরার মতো একই উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনায় ছোট কাটরা নির্মাণ করা হয়, তবে এর আকার ছোট। অবহেলা এবং পরবর্তীকালে সংস্কারের ফলে ছোট কাটরার মূল নকশার ব্যাপক ক্ষতি হয়। এর দু'টো প্রবেশ পথ পরিবর্তন করা হলেও এখনো বিদ্যমান আছে। নদীমুখী এই বিল্ডিংটি তিন তলাবিশিষ্ট। সম্মুখভাগের ধনুকাকৃতি খিলান দ্বিতীয় তলার ওপর পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয় তলায় আছে তিন পাটাবিশিষ্ট জানালা এবং চূঁড়াবিশিষ্ট মিনার। এ সবই আধুনিক, এমনকি ছাদের কিনারাও। পেছনের দিকে একটা নতুন বারান্দা নির্মাণ করা হয়। দ্বিতীয় গেটটি দোতলাবিশিষ্ট এবং তার বৈশিষ্ট্য বড় কাটরার মতোই। ডান ও বামদিকের কামরাগুলোর অস্তিত্ব এখনো আছে। কিন্তু উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ব্যবসায়ীদের বহু গুদামঘর বিদ্যমান থাকায় এই বিল্ডিং-এর অতীত জাঁকজমকের কিছুই দৃশ্যমান হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯. বিবি চম্পার সমাধি ছোট কাটরার প্রাঙ্গণে উভয়পার্শে ২৪ ফুট মাপবিশিষ্ট প্লাস্টার করা ইট নির্মিত একটা এক গম্বুজ প্রাচীন সমাধি আছে – সমাধিটি চতুর্ভূজ আকারের। এর চারটি প্রবেশ পথের ধনুকাকৃতির খিলানের দু'পাশে আছে ক্রমশ সরু হওয়া আকর্ষণীয় মিনার। ওই মিনার স্থাপন করা হয়েছে বিপরীতমুখী কলসের উপরে; আর গম্বুজ স্থাপন করা আছে ফোঁকরবিশিষ্ট অষ্টকোণী ড্রামের ওপর। অভ্যন্তরভাগের কবর মাটির সাথে সমতল অবস্থায় আছে। আউলাদ হাসানের মতে, 'এই সমাধিটি নির্মাণ করা হয় বিবি চম্পার কবরের ওপর। সমাধিটি নির্মাণ করেন আমীর-উল-উমারা। এলাকাটি চম্পাতলী নামে পরিচিত।'[২৬] হাকীম হাবীবুর রহমান স্থানীয় জনশ্রুতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, বিবি চম্পা ছিলেন নবাব শায়েস্তা খানের উপপত্নী। র‍্যাংকিন মত প্রকাশ করেন যে, বিবি চম্পা ছিলেন নবাব শায়েস্তা খানের কন্যা – হাকীম হাবীবুর রহমান এই মতের বিরোধিতা করেন।[২৭]

২০. নবাব শায়েস্তা খানের মসজিদ : মিটফোর্ড হাসপাতালের বিপরীত দিকে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এই মসজিদটি অবস্থিত (হাসপাতাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর বাসভবনের পশ্চিম দিকে)। মিটফোর্ড রোড থেকে যে গলিপথটি হাসপাতাল ও মেডিকেল স্কুলের মধ্যদিয়ে পাকা ঘাট পর্যন্ত গেছে, সেই পথ দিয়ে এই মসজিদে যাওয়া যায়; এই পাকা ঘাটে নৌকা থেকে নেমে ওই মসজিদে যাওয়া যায়। মসজিদের মূল দরজার ওপরে একটা শিলালিপি থেকে জানা যায়, মসজিদটি নির্মাণ করেন নবাব শায়েস্তা খান; কিন্তু কোন সালে মসজিদটি নির্মিত হয় তা জানা যায় না। মসজিদটি নিশ্চিতভাবে তাঁর প্রথমবার গভর্নরের দায়িত্ব পালনকালে নির্মিত হয়। ওই সময় তিনি এই এলাকায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। বর্তমানে মসজিদটির যে কাঠামো আছে তা শায়েস্তাখানি বৈশিষ্ট্য থেকে একেবারে ভিন্ন। কথিত আছে যে, মসজিদটি আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়[২৮] এবং বর্তমান মসজিদটি নির্মাণ করে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট – স্থাপত্যের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রায় নেই। মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট; কোনায় মিনার আছে। ধনুকাকৃতির প্রবেশ পথ অর্ধ-গম্বুজের নিচে অবস্থিত। গম্বুজ স্থাপিত আছে ফোকরবিশিষ্ট ড্রাম-এর ওপর – প্রাচীন এই স্টাইল এখনও বিদ্যমান আছে।

২১. আমীর উদ্দিনের সমাধি ও মসজিদ বুড়িগঙ্গার তীরে একটা দেয়াল ঘেরা এলাকার মধ্যে ওই সমাধি ও মসজিদ অবস্থিত, বাবু বাজার ব্রিজ-এর সামান্য পূর্বদিক থেকে বাবু বাজার রোড থেকে বেরিয়ে যাওয়া গলিপথ ধরে ওই স্থানে যাওয়া যায়। ওই মসজিদটি নির্মাণ করেন দারোগা আমীর উদ্দিন; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি করতেন। মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট, সামনের দিকের বহিরাংশ প্যানেল করা এবং এতে বেশ কয়েকটি মিনার আছে। নদীর দিক থেকে মসজিদটি দেখতে খুবই আকর্ষণীয়। এটা শায়েস্তাখানি স্টাইলের পরবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগে নির্মিত স্টাইলের সুন্দর নিদর্শন। এই মসজিদের সাথে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে একটা বারান্দা নতুন করে নির্মাণ করা হয়। এই মসজিদের পাশে একটা একক গম্বুজবিশিষ্ট সমাধিতে মসজিদের নির্মাণকারী সমাহিত আছে।

২২. ইসলাম খানের মসজিদ : এই মসজিদটি অবস্থিত সৈয়দ আউলাদ হোসেন লেন-এ (সাবেক আশিক জমাদার লেন) এবং ইসলামপুর রোড থেকে ওই মসজিদে যাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, ঢাকার প্রথম মোগল গভর্নর ইসলাম খান এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।[৩০] মসজিদটি তিন-গম্বুজবিশিষ্ট এবং এর মাঝের গম্বুজটি অন্য দুই গম্বুজের চেয়ে আকারে অনেক বড়। মসজিদের সামনের বহিরাংশ এবং কোনার মিনারগুলো অলঙ্করণ ছাড়াই নির্মাণ করা হয়। প্রবেশ পথগুলো সাধারণ ধনুকাকৃতির এবং তা সুশোভিত করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। মসজিদটির এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য শায়েস্তাখানি স্টাইলের পূর্বে প্রচলিত স্টাইলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্প্রতি মসজিদটির সংস্কার করা হয় ব্যাপকভাবে।

ঘ. পুরনো শহরের স্মৃতিস্তম্ভ

পুরনো শহরটা দেখতে মোগল-পূর্ব ঢাকার মতো; পুরনো ঢাকার সীমানা সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমরা প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন বা অতীতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

২৩. বিনত বিবির মসজিদ : বিনত বিবির মসজিদ অবস্থিত নারিন্দায় – সূত্রাপুর থানা বা বলদা মিউজিয়াম (ওয়ারী) থেকে ওই মসজিদে যাওয়া যায়। নারিন্দা ব্রিজের উত্তর পার্শে অবস্থিত এই মসজিদটি। মূল প্রবেশ পথের ওপরে ঝুলিয়ে রাখা শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন মারহামাত-এর কন্যা বখত্ বিনত।[৩১]

ঢাকায় যে সব প্রাচীন মসজিদ এখনও বিদ্যমান আছে, তার মধ্যে এটা একটি। কিন্তু পরবর্তীকালে সংস্কার করার ফলে এর অনেক মোগল-পূর্ব বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রথমে এটা ছিল একটা এক-গম্বুজ বিশিষ্ট বিল্ডিং; এই বিল্ডিং-এ প্লাস্টার ছিল না। কোনায় ছিল অষ্টকোণী মিনার, ফোকরবিশিষ্ট বাঁকা প্রাচীর ও কার্নিস। মসজিদের তিনদিকে ছিল অতি সাধারণ খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ। পশ্চিম দিকের দেয়ালের বিপরীতে ছিল একটা প্রসারিত মেহরাব। গম্বুজটি এখনও অর্ধ-বৃত্তাকার অবস্থায় আছে এবং তা স্থাপিত আছে ছাদের ওপর। এরসাথে আছে একটা অতিরিক্ত প্লাস্টার রিং বা বৃত্ত; বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষার জন্য তা তৈরি করা হয় গম্বুজের গোড়ায়। কিন্তু এখন দেয়ালে প্লাস্টার করা হয়েছে, মসজিদের বাঁকা বহিরাংশ সোজা করা হয়েছে, দক্ষিণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে গম্বুজবিশিষ্ট একটা কামরা সংযুক্ত করা হয়েছে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে নতুন বারান্দা তৈরি করা হয়েছে। তবু মসজিদের উত্তর ও পশ্চিম দিকের বহিরাংশ এবং প্রথমে নির্মিত গম্বুজ থেকে এর প্রাচীন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

প্রাচীন এই গম্বুজটি ভেঙ্গে ফেলার এবং তার বদলে একটা নতুন বিল্ডিং তৈরি করার প্রস্তাব আছে। নতুন এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হলো, মসজিদে বর্তমানের চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের স্থান সংকুলান করা। আমার অনুরোধ সত্ত্বেও স্থানীয় লোক তাদের সিদ্ধান্তে অটল বলে মনে হয়। এই গ্রন্থখানি ছাপা হওয়ার আগেই ঢাকার একটি প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ তার আকার ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে। ঢাকায় টিকে থাকার যুদ্ধে প্রত্নতত্ত্ব আবার হেরে গেল।

২৪. নারিন্দা ব্রিজ : প্রথমদিকে (নির্মাণের সময়) এটা ছিল একক খিলানবিশিষ্ট ইটের তৈরি ব্রিজ – এর দু'পাশে ছিল পানির স্রোতকে বিদীর্ণ করার জন্য প্রসারিত অংশ। নারিন্দার একজন ব্যবসায়ী হায়াত ব্যাপারী ১০৭৪ হিজরি সালে (১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ) এই ব্রিজ নির্মাণ করেন।[৩২] কিন্তু এখন ওই খিলান ধ্বংস হয়ে গিয়েছে; খিলানের পরিবর্তে নির্মাণ করা হয়েছে লোহার গ্রাইডার। ঢাকায় ধোলাই খালের ওপর নির্মিত দশটি ব্রিজের মধ্যে এটা একটি।

২৫. হায়াত ব্যাপারীর মসজিদ : এই মসজিদটি অবস্থিত নারিন্দা ব্রিজের দক্ষিণ দিকে; ওই একই ব্যবসায়ী হায়াত ব্যাপারী ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং আয়তাকার; বিনত বিবি'র মসজিদের স্টাইলের অনুকরণে এই মসজিদটি নির্মাণের চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে মসজিদটি একেবারে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে।

২৬. গোলাম মোহাম্মদের তোরণ : শেখ গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন নবাব জেসারত খানের সময়কার খ্যাতনামা জমিদার শেখ গোলাম নবীর তৃতীয় পুত্র। তিনি ঢাকায় পর্তুগীজ ফ্যাক্টরির একজন এজেন্টও ছিলেন।[৩৩] নারায়ণগঞ্জের অপরদিকে নবীগঞ্জে অবস্থিত কদম রসূল বিল্ডিং-এর সংস্কার কাজ করার জন্য পিতা ও পুত্র উভয়ে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর গোলাম মোহাম্মদ সঙ্গতটোলায় পর্তুগীজদের বাসস্থান ক্রয় করেন এবং সেখানে নিজের বাড়ি তৈরি করেন।[৩৪] ওই বাড়ির দেয়াল তৈরি করা হয় প্রাচীন জাফরি ইট দিয়ে এবং এ থেকে ওই এলাকা যে কতটা প্রাচীন সে সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

লক্ষ্মীবাজার থেকে প্রাচীন এই এলাকায় একটা ছোট গলিপথ (গাড়ি চলাচলের উপযোগী) ধরে যাওয়া যায়। এই এলাকায় একমাত্র টিকে থাকা জাঁকজমকপূর্ণ ইটের তোরণ দেখার মতো। এই তোরণের উভয় পাশে এখন অনেক আধুনিক বিল্ডিং গড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠেছে। সৌভাগ্যবশত, কাঠের দরজার দু'টো পাল্লায় ক্রস করা ও সমকোণী ডিজাইনের চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। তোরণটি দোতলা বিশিষ্ট, উপরের তলাটি সম্প্রতি নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। নিচের অংশ উন্মুক্ত হয় পর পর তিনটি চূঁড়াবিশিষ্ট খিলান খোলার পর। প্রথম ও দ্বিতীয় খিলানের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র পার্শ-প্রকোষ্ট ছিল, এরপরই শুরু হয় প্রধান গেট-কামরা। এই কামরার ছাদ সমতল – ছাদের নিচে ছিল কাঠের বরগা বা গ্রাইডার।

ছোট কাটরা বিল্ডিং-এর প্রবেশ পথের স্টাইল এই বিল্ডিং-এ অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২৭. বিবি মেহার-এর মসজিদ ওই তোরণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সামান্য দূরে একটা মসজিদ আছে; মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং সমকোণী। মসজিদের গম্বুজটি বিনিষ্ট হওয়ার পর সমান্তরাল ছাদ তৈরি করে তা সংস্কার করা হয়। মূল প্রবেশপথের ওপর রক্ষিত শিলালিপি থেকে জানা যায়, গোলাম মোহাম্মদের কোনো এক আত্মীয় বিবি মেহার ১২৩০ হিজরি সালে (১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ) এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটি সাধারণ ধরনের – পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশপথ এবং পশ্চিম দিকে তিনটি ছোট মেহরাব আছে।

২৮. গুরু তেগ বাহাদুর-এর সঙ্গত : এই সঙ্গতটোলা লেন ধরে প্রায় একশ'গজ এগিয়ে যাওয়ার পর দেখতে পাওয়া যায় গুরু তেগ বাহাদুর-এর সঙ্গত। এই প্রতিষ্ঠানটির নামানুসারে মহল্লাটির নামকরণ করা হয় সঙ্গতটোলা। এই সঙ্গতটি অবস্থিত দ্বিতলবিশিষ্ট একটা সমকোণী বিল্ডিং-এ; তবে এর পূর্বদিক গোলাকার, যেন তা গম্বুজাকৃতি ছাদবিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার স্থানের মতো দেখা যায়। নির্ধারিত জমি বা এলাকার কারণেই সম্ভবত এই ধরনের বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছিল; এছাড়া ওই গম্বুজাকৃতি ছাদবিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার স্থানের আর কোনো গুরুত্ব নেই। বর্তমান এই বিল্ডিংটি নতুন, সম্ভবত পঞ্চাশ বছরের পুরাতন হতে পারে। এই বিল্ডিং-এর পশ্চিমদিকে ছোট একটা কামরা দেখা যায়, যেখানে গুরু তেগ বাহাদুর অবস্থান করেন বলে বলা হয়। বর্তমানে এই বিল্ডিং-এর নিচতলা হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন উকিলের কাছে ভাড়া দেয়া হয়েছে। (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে একথা বলা হয়)। দ্বিতীয় তলায় দেখতে পাওয়া যায় সত্যিকার সঙ্গত - এখানে একটা কামরা সুন্দরভাবে পরিপাটি ও সবকিছু বিন্যস্ত করে রাখেন একজন বৃদ্ধা মহিলা, তিনি সবার কাছে 'শিখ-এর মা' বলে পরিচিত। পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত এলাকায় শিখধর্মের জ্বলন্ত শিখাকে উড্ডীন করে রাখার জন্য তাঁর সতীর্থরা তাকে রেখে চলে গিয়েছে। দুঃখের মাঝেও ওই মহিলার প্রবল উৎসাহ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ একাগ্রতা সবার সহৃদয়তা পাওয়ার যোগ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরু তেগ বাহাদুর-এর আগমন সম্পর্কে গুরু বখশ সিং বলেন 'সুদূর পাঞ্জাবে তীর্থযাত্রায় যেতে অপারগ গরিব ভক্তদের বার বার কাতর অনুরোধ সবার দৃষ্টিতে আসে এবং ঘোষণা করা হয় যে, গুরু গোবিন্দ সিং-এর পিতা নবম গুরু তেগ বাহাদুর অবশেষে গরিব ভক্তদের ইচ্ছা পূরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উত্তরাধিকারী হিসেবে 'গদী'তে আসীন হওয়ায় তাঁর বিরোধিতা হয়, লোকে তাঁকে ঈর্ষা করে ও তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করে। এই অবস্থায় তিনি কিছুদিন পাঞ্জাব থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত হন। তাঁর আগমন সংবাদে ভক্তদের মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তাদের উৎসাহ এমন বৃদ্ধি পায় যে, পবিত্র ওই ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তারা অনেকে আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে – তিনি যাত্রা শুরু করেন ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে। পাটনায় তিনি সাময়িক যাত্রাবিরতি করেন। বাংলার শিখদের দেখার জন্য এ সময় গুরুর ইচ্ছার সাথে রাজপুত্র কমান্ডার রাজা সুবল সিং সেসোদিয়ার ঐকান্তিক আবেদনও যুক্ত হয়। তিনি ছিলেন পনেরশ' সৈন্যের কমান্ডার – তিনি অবিলম্বে চট্টগ্রাম অভিযানের নির্দেশ দেন। গুরু তাঁর পরিবারের সদস্যদের পাটনায় থাকার ব্যবস্থা করেন এবং রাজা সুবল সিং সেসোদিয়ার সাথে ঢাকায় আসেন। তিনি অবশ্য ঢাকায় বেশিদিন ছিলেন না। পুত্র গোবিন্দ সিং-এর জন্ম লাভের সংবাদ শোনার পর তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকায় আসার পর গুরুকে শহরের সঙ্গত-এ নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় মসন্দ বুলাকি সব শিখকে গুরুর আগমন সংবাদ জানিয়ে দেন। গুরুকে সম্মান জানানো এবং তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য দলে দলে শিখরা আসতে থাকে। শিখদের প্রবল উৎসাহ দেখে গুরু ঘোষণা করেন যে, ঢাকা হলো 'তাঁর ধর্মের মূল কেন্দ্র'। গুরুর প্রস্থানের সময় মসন্দ বুলাকির মাতা গুরুর একটা অঙ্কিত রঙিন চিত্র রাখেন। গুরুর বসার জন্য তিনি কয়েকটি চৌকি তৈরি করেন। ওই চিত্র এবং কয়েকটি চৌকি এখনও সঙ্গত-এ সংরক্ষিত আছে। ওই চিত্রখানি বেশ পুরাতন।

'কিন্তু এসব জিনিস আমাদের খুব বেশি আগ্রহের সৃষ্টি করে না... এখানে আরো কিছু সংরক্ষিত জিনিস আছে – এরমধ্যে আছে অর্ধ ডজন পুরাতন চিঠি; এসব চিঠি গুরু তেগ বাহাদুর ও গুরু গোবিন্দ সিং-এর নিজের হাতের লেখা। ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে সম্বত-এ লেখা গুন্থ সাহেব-এর একটা কপি – বলা যায়, এই কপিখানি অত্যন্ত প্রাচীন এবং জানা মতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ কপি। সুন্দরভাবে সাজানো বড় বড় টাইপে ছাপা; এই কপি সম্ভবত নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়কার। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের কিছু ছাপা বই আছে; যার নতুন সংস্করণ এখন পাওয়া যায়। এসব পুস্তকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।'[৩৫]

এসব পুস্তক এখানে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা আছে; পেইন্টিংগুলোও এখানে আছে। যে কোনো দর্শক এসব কিছু দেখতে পারেন এবং জিনিসগুলো সুন্দরভাবে সংরক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য ওই মহিলা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

২৯. সিঙ্গটোলায় সিতারা বেগমের মসজিদ ওই গলিপথ ধরে পূর্বদিকে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলে চারটি গলিপথের চৌমাথায় যাওয়া যায়; সেখান থেকে আরো পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণ দিকে মোড় নিলে সিঙ্গটোলা – এখানেই অবস্থিত সিতারা বেগমের মসজিদ।

সিতারা বেগম হলেন গোলাম মোহাম্মদের স্ত্রী। তিনি তাঁর মৃত স্বামীর স্মরণে হিজরি ১২৩১ সালে (১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে) এই মসজিদটি নির্মাণ করেন – মসজিদ নির্মাণের সাল সম্পর্কে জানা যায় মসজিদের মূল দরজার ওপরে সংরক্ষিত শিলালিপি থেকে। একটা উঁচু মাটির ঢিপের পশ্চিম দিকে মসজিদটি অবস্থিত এবং এর সম্মুখদিকের রঙিন বহিরাংশ আকর্ষণীয়ভাবে সুন্দর। এর সাদা প্লাস্টার করা দেয়ালের লাইন প্রসারিত বহিরাংশের মূল লাইনের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন আকারে তৈরি - এর দুই প্রান্তে আছে দুটো অষ্টকোণী মিনার। দেয়ালের মাঝখানে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ; এই প্রবেশপথের ওপরে আছে চূঁড়াবিশিষ্ট অর্ধগম্বুজ। সমকোণী প্যানেলের একটা কাঠামো এর সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে। মূল প্রবেশপথের দু'পাশে আরো দুটো খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আছে, এ দু'টো প্রবেশ পথ আকারে মূল প্রবেশপথের চেয়ে ছোট। তিনটি প্রবেশপথের বৈশিষ্ট্য মোগল যুগের। ছোট দু'টি প্রবেশপথের উভয় পার্শে আছে প্রাচীর থেকে আংশিক প্রলম্বিত চতুষ্কোণ স্তম্ভ। কালো রং দিয়ে স্পষ্ট করা নির্মিত একের পর এক সমান চিহ্ন বা মোল্ডার ছাদের কিনারাকে আরো উজ্জ্বল দেখায়, যার পেছনে কন্দযুক্ত তিনটি গম্বুজ উপরের দিকে প্রসারিত দেখা যায়। মূল গম্বুজটি অন্য দু'টি গম্বুজ থেকে আকারে বড়। প্রতিটি গম্বুজই স্থাপিত আছে অষ্টকোণী ড্রামের ওপর এবং গম্বুজের গোঁড়া স্পষ্টভাবে তৈরি চিহ্ন দ্বারা অলংকৃত করা আছে। মসজিদের অভ্যন্তরভাগে আছে একটা পরিচ্ছন্ন হল। শায়েস্তাখানি স্টাইলের স্থাপত্য এই মসজিদ নির্মাণে অনুসরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি মসজিদটির সংস্কার করা হয়েছে।

৩০. লক্ষ্মীবাজারে রাজা বাবুর গৃহ ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সিঙ্গটোলা থেকে 'রাজা বাবু কা ময়দান' যাওয়া যায়, লক্ষ্মীবাজার থেকেও শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন ধরে রাজা বাবুর গৃহে যাওয়া যায়।

রাজা বাবুর পুরো নাম কৃষ্ণ প্রসাদ; তিনি গৌড়ের ব্রাহ্মণ ভিকন লাল পান্ডের পৌত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভিকন লাল পান্ডে পাঞ্জাব থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী সার্ভিসে চাকরি করেন। পলাশী যুদ্ধের সময় (১৭৫৭) তিনি ইংরেজদের অনুকূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এর পুরস্কারস্বরূপ তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের নামে বংশপরম্পরায় ভূমি ও পেনশন লাভ করেন; এই লক্ষ্মীনারায়ণের নামেই তিনি নিজ গৃহে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৬]

রাজা বাবুর গৃহের মূল বিল্ডিংটা অবস্থিত একটা আয়তকার সমান্তরাল উন্মুক্ত স্থানের এক কোনায় – ওই স্থানকে বলা হয় 'রাজা বাবু কা ময়দান'। এই খোলা ময়দানে আগে হিন্দুদের হোলি উৎসব পালিত হতো অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে। মূল বিল্ডিংটি দোতলা – নিচের তলায় আছে দু'টো কামরা ও বেশ কিছু এলাকায় ইট বিছানো, যা নাচঘরের প্রথম সোপান পর্যন্ত বিস্তৃত। ইটের তৈরি বড় বড় ধাপবিশিষ্ট সিঁড়ি দিয়ে উপর তলায় যাওয়া যায়। নাচঘরটি বেশ প্রকাণ্ড, এর সম্মুখদিকে একটা বারান্দা এবং পেছনদিকে 'অন্তরাল' নামে একটা কামরা আছে। নাচঘরের মেঝেতে কাঠের তক্তা বিছানো এবং ছাদে আছে ঝালাই করা লোহার পাত। এ ঘরের সবচেয়ে জমকাল দৃশ্যমান দিকটি হলো দেয়ালে আঁকা ভাস্কর্য; সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে একাজ করা হয়েছে প্লাস্টার দিয়ে। 'অন্তরাল'-এ আছে আকর্ষণীয় একটা সিংহাসন – কাঠের তৈরি এ সিংহাসনে রূপার পাত বসানো আছে। এখানে সন্ধ্যার সময় ও উৎসবের দিনগুলোতে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি স্থাপন করা হয়; অন্য সময় মূর্তিটি এই কামরার এক পাশে তৈরি আধুনিক স্টাইলের এক মন্দিরে রাখা হয়।

রাজা বাবুর সময় এই নাচঘরে নাচের আসর বসতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুসৃত নির্মাণ স্টাইলের একটা সুন্দর নিদর্শন হলো এই বিল্ডিংটি-এর নির্মাণ স্টাইলে হিন্দু মুসলিম বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় লক্ষ্যণীয়। এখনও এই দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোক সন্ধ্যার সময় সমবেত হয়।

৩১. জয়কালী মন্দির : এই মন্দিরটি অবস্থিত ঠাঁটারী বাজার-এ। নবাবপুর রোড থেকে ফোল্ডার স্ট্রীট ধরে এই মন্দিরে যাওয়া যায়। রেলপথ ক্রসিং-এর দক্ষিণ দিক থেকে এই রাস্তাটি ওয়ারীর দিকে চলে গিয়েছে (বর্তমানে রেলপথটি তুলে দেয়া হয়েছে)।

মন্দিরটি দু'শ থেকে আড়াইশ' বছরের পুরনো।[৩৭] আসলে, এখানে দেয়াল ঘেরা প্রাঙ্গণের মধ্যে দুটো মন্দির আছে। একটা মন্দিরের ওপরের দিকে আছে মোচাকার চূঁড়া, ওই চূঁড়ায় আছে প্লাস্টারের কারুকাজ। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট আশ্রমের ওপর আছে সমান্তরাল মালার ভাস্কর্য যা অস্পষ্টভাবে নির্মিত চিহ্নের জন্য আরো উজ্জ্বল দেখায়। অন্য মন্দিরটি পঞ্চরত্ন টাইপের (বাঙলা টাইপের বিল্ডিং-এর ওপর পাঁচটি চূঁড়ার মতো)। মাঝখানের চূঁড়াটি অন্যসব চূঁড়ার চেয়ে লম্বা। মন্দিরের বাইরের অংশে আছে আয়তাকার বিশিষ্ট লম্বা প্যানেল – মধ্যে আছে কালীর মূর্তি।

৩২. পাগলা পুল : ঢাকা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল পূর্বে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রোডে পাগলা পুলের ধ্বংসাবশেষ আছে। ফরাসী পর্যটক টেভির্নিয়ার ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসেন; তিনি লেখেন : 'অর্ধ লীগ-এর কম দূরত্বে 'পাগালু' নামে একটা নদী আছে বলে মনে হয়; এই নদীর ওপর ইটের তৈরি একটা সুন্দর পুল আছে। এই পুলটি নির্মাণ করান মীর্জা-মোলা (মীর জুমলা)। এই নদীটি এসেছে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। এখান থেকে অর্ধলীগ উজানে 'কদমতলী' নামে আরো একটি নদী আছে বলে মনে হয়; ওই নদীটি এসেছে উত্তর দিক থেকে এবং ওই নদীর ওপরও একটা ইটের পুল আছে। এই নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক উঁচু আত্মরক্ষার স্থান আছে, সেখানে অনেক লোক থাকে – তারা রাজপথে ডাকাতি করে।'[৩৮] বিশপ হেবার ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে লেখেন 'অপর এক সন্ধ্যায় আমি মি. মিটফোর্ডের একটি সুন্দর নৌকায় 'পাগলা পুল'-এ যাই - এটা ঢাকা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত একটি ধ্বংসাবশেষ। এটা ঐতিহ্যবাহী টিউডর গথ-জাতির স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন। আমি এটাকে এশীয় কোনো বিল্ডিং হিসেবে অভিহিত করবো কিনা ভেবে পাচ্ছি না; কারণ নৌকার মাঝি বলে যে এটা একজন ফরাসী নাগরিক নির্মাণ করেন বলে জনশ্রুতি আছে।'[৩৯] এই পুলের নির্মাণকারীর নাম টেভির্নিয়ার আগেই উল্লেখ করেন; সুতরাং হেবার জনশ্রুতির যে কথা উল্লেখ করেন তার কোনো ভিত্তি নেই। হেবার টিউডর স্থাপত্যের যে কথা উল্লেখ করেন তা হলো চতুষ্কোণবিশিষ্ট খিলানের আকার সম্পর্কিত। এ সময় চার্লস ডি'ওলি তাঁর নকশা প্রণয়ন করেন – পুলটি সে সময় ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায়।[৪০]

নির্মাণের সময় এই পুলের তিনটি উন্মুক্ত খিলান ছিল – প্রতিটি খিলানের দু'পাশে ছিল ক্ষুদ্র বদ্ধ খিলান – এর ওপর দিয়ে ঢালুভাবে রাস্তা ছিল। দুই আলম্বের মধ্যখানে ছিল বাইরের দিকে প্রসারিত খোদাই করা গোলাপ। পুলের চারকোনায় ছিল অষ্টকোণি ফাঁপা টাওয়ার। এর সাথে ছিল উন্মুক্ত খিলান। এর ওপরে ছিল বেলনাকার ড্রামের ওপর দণ্ডাকার শিরাবিশিষ্ট গম্বুজ। আধুনিক কাঠামো এই পুলের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তবু এর ধ্বংসাবশেষের মাঝেও অনেক মূল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে।

৬. রমনা ধারার বৈশিষ্ট্যের স্মৃতিস্তম্ভ

মোগল যুগে রমনা এলাকা দু'মহল্লায় বিভক্ত ছিল – চিশতিয়া এবং সুজাতপুর। ইসলাম খানের সময়কার বিখ্যাত সামরিক কমান্ডার সুজাত খানের নামানুসারে মহল্লার নাম করা হয় সুজাতপুর। এই দুই মহল্লার মাঝখানে অবস্থিত 'কাঠ-ঘর' (Kat-ghar), এখানেই বর্তমানে আছে রমনা কালীমন্দির। মোগলদের পতনের পর এই এলাকাটি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং তা মুসলমানদের কবরখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়; এলাকাটি ক্রমে জঙ্গলে পরিণত হয়। প্রথম বাঙলা ভাগের সময় (১৯০৫) জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় এবং অনেক কবর সরিয়ে নেওয়া হয়। এখানেই গড়ে তোলা হয় রমনা (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৫. **হাজী খাজা শাহবাজ-এর সমাধি ও মসজিদ** রমনা রেসকোর্সের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় এবং হাইকোর্ট ভবনের (পুরাতন) ঠিক পেছনদিকে এই সমাধি ও মসজিদ অবস্থিত। হাজী খাজা শাহবাজ ঢাকার 'মার্চেন্ট শাহজাদা' ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ওই মসজিদ ও নিজের সমাধি নির্মাণ করেন। মসজিদের প্রধান দরজার ওপরে সংযুক্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি তিনি নির্মাণ করেন হিজরি ১০৮৯ সালে (১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে)।[৪১]

মসজিদ ও সমাধি উভয়ই উঁচু ভূমির ওপর অবস্থিত – সমাধি পূর্বদিকে এবং মসজিদ পশ্চিমদিকে। সমাধির পাশে নির্মিত স্থাপনা সম্ভবত কেয়ারটেকারের কোয়ার্টার ছিল। শায়েস্তাখানি স্টাইল স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন হলো এই সমাধি ও মসজিদের নির্মাণ কাঠামো।

মসজিদটি চওড়ার চেয়ে লম্বা বেশি – বাইরের দিক থেকে এর পরিমাপ হলো ২৮ ফুট×২৬ ফুট। চারকোনায় চারটি টাওয়ার আছে যা ছাদের কিনারা পর্যন্ত অষ্টকোণী এবং ছাদের ওপরের অংশ গোলাকার, এর শেষ অংশে আছে একাধিক দন্ডের ওপর স্থাপিত গম্বুজ। বিল্ডিং-এর সামনের দিকে মাঝখানে দেখা যায় প্রসারিত অংশ যা সরু মিনার দ্বারা বর্ডার করা – এর মধ্য দিয়ে খোলা যায় প্রধান দরজা। ওই মিনারগুলোতে আছে একাধিক চূঁড়াবিশিষ্ট ধনুকাকৃতির খিলান, যার প্রান্ত কিছুটা সূচাল। প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে খাড়াভাবে তিনস্তর বিশিষ্ট কুলুঙ্গির পাঁচটি সারি আছে। মূল দরজার উভয় পার্শ্বে একটি করে ধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আছে। কোনার টাওয়ারের পাশে মিনার আছে এবং বাইরের অংশের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করা আছে ডিজাইন মোল্ডিং করে। ছাদজুড়ে আছে তিনটি গম্বুজ। তিনটি গম্বুজের ফাঁকা অংশসহ বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরভাগ সৌষ্ঠবপূর্ণ। কোনা ও ধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত প্যানেলের পাশে এবং তার নিচে ফাঁকাস্থানে সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য ডিজাইন মোল্ডিং স্থাপন করা হয়েছে আড়াআড়ি এবং সুবিন্যস্তভাবে। এসব ফাঁকা স্থান পরস্পর থেকে পৃথক আছে সৌষ্ঠবপূর্ণ পার্শ্ববর্তী ধনুকাকৃতি খিলানের চূঁড়া দ্বারা; ওই চূঁড়া স্থাপিত আছে দু'টো অবলম্বনের ওপর। সম্মুখভাগের সাজসজ্জাহীন উপরিভাগ একাধিক দেয়াল-খিলান সংযুক্ত আছে পরিচ্ছন্নভাবে। পশ্চিমদিকে আছে একাধিক আকর্ষণীয় মেহরাব। প্রধান মেহরাবের বাইরের খিলান উত্থিত হয়েছে আকর্ষণীয় চিকন স্তম্ভ থেকে এবং আলম্ব স্তম্ভে আছে লতাপাতার ডিজাইন। স্থাপত্যের সব নমুনা ও সাজ-সজ্জা এমন সুন্দর ও যথাযথভাবে করা হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে তা আকর্ষণীয়।

সমাধিটি এক গম্বুজবিশিষ্ট; এর গঠন কাঠামো চতুষ্কোণ বিশিষ্ট – প্রত্যেক পার্শ্বেই এর আয়তন ২৬ ফুট। কোনার টাওয়ার অষ্টকোণী গম্বুজবিশিষ্ট। এর দক্ষিণদিকে একটা বারান্দা আছে, যার আয়তন এগার ফুট দু'ইঞ্চি। প্রত্যেক পাশেই ধনুকাকৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আছে এবং ওই প্রবেশপথের ওপরে আছে কিছুটা প্রসারিত অর্ধ-গম্বুজ। সজ্জাহীন সম্মুখভাগে আছে একাধিক প্যানেল। বাইরের অংশে যে ডিজাইন মোল্ডিং ছিল তা সাম্প্রতিক সংস্কারের সময় পুনঃস্থাপন করা হয়নি। ছাদ জুড়ে আছে দেয়ালের সাথে সংযুক্ত গম্বুজ দ্বারা – গম্বুজের গোঁড়ায় আছে লতাপাতার নকশা; আর শীর্ষে আছে পদ্মপাতার নকশা। দক্ষিণদিকের বারান্দা ধ্বংস হওয়ার পথে – এর ছাদ ও সামনের ধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত বেষ্টনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ফলে বাইরে থেকে এখন অভ্যন্তরভাগের সবকিছু দেখা যায়। এই পাশ থেকে সমাধির অভ্যন্তরে যাওয়ার ধনুকাকৃতির তিনটি প্রবেশ পথ আছে, এর মধ্যে দু'টো প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ধনুকাকৃতি খিলানের ওপরে আছে চূঁড়া, যার উৎপত্তি হয়েছে আকর্ষণীয়ভাবে সুন্দর স্তম্ভ থেকে। অভ্যন্তরভাগের কোনায় আছে আড়াআড়িভাবে অবলম্বন এবং তার পাশাপাশি আছে ধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত প্যানেল। গম্বুজে আছে মোল্ডিং ও আরবীয় ডিজাইন। মেঝের ওপর আছে হাজী সাহেবের স্মৃতি চিহ্ন।

৩৪. মূসা খান-এর মসজিদ : ঢাকা হল এলাকার উত্তর পশ্চিম কোনায় এই মসজিদটি অবস্থিত। এই এলাকাটি আগে পরিচিত ছিল 'বাগ-এ মূসা খান' নামে। বিখ্যাত বারভূঁঞা জমিদার ঈশা খানের পুত্র মূসা খান আত্মসমর্পণ করেন ইসলাম খানের কাছে; পরে তাঁকে শান্তিতে জীবন-যাপন করার অনুমতি দেয়া হয়। এই মসজিদটি তিনি নির্মাণ করেন বলে জানা যায়।[৪২] কিন্তু এর স্থাপত্য শিল্পের স্টাইল শায়েস্তাখানি, এই মসজিদের মূল নির্মাতা মনোয়ার খান বলে মনে হয়। মনোয়ার খান হলেন মূসা খানের পুত্র এবং তিনি সম্ভবত শায়েস্তা খানের আমলে মসজিদটি নির্মাণ করেন।

মসজিদটি একটা উঁচু প্লাটফর্মের ওপর অবস্থিত; এর নিচে আছে বসবাসের কামরা। এর তিনটি ধনুকাকৃতি খিলানের প্রবেশপথের সাথে আছে প্যানেল করা বহিরাংশ, প্রতিটি প্রবেশপথের ওপরে আছে অর্ধগম্বুজ, অলঙ্কারপূর্ণ ছাদের কিনারা, ছাদের সাথে সংযুক্ত গম্বুজ; প্রতিটি গম্বুজই অবস্থিত ফোকরবিশিষ্ট ড্রামের ওপর। মসজিদের কোনায় আছে মিনার, এই মিনারের সাথে আছে আরো মিনার – এসব নিদর্শন হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদের স্থাপত্য ও নির্মাণ কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই দুই মসজিদের নির্মাণকালের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। একমাত্র পার্থক্য হলো উঁচু প্লাটফরম এবং অভ্যন্তরভাগে পার্শ্বস্থ ধনুকাকৃতি খিলান ও এর উপরকার সুন্দর চূঁড়া। মসজিদটি সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে এবং বহিরাংশের অলঙ্কারপূর্ণ প্যানেলের পরিবর্তন করা হয়েছে ব্যাপকভাবে। মসজিদের উত্তর-পূর্ব দিকে মূসা খানের সমাধি আছে।

৩৫. রমনা কালী বাড়ি রমনা রেস কোর্সের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মাঝখানে অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়ভাবে অবস্থিত আছে রমনা কালী বাড়ি মন্দির। বিখ্যাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্করাচারিয়া ধারার গিরী উপাধিধারী দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মন্দির এটা। মন্দিরের রেকর্ড থেকে জানা যায়, বদ্রিনারায়নের কাছে জোশী মঠ থেকে গোপাল গিরী নামে এক ব্যক্তি এখানে প্রথম আসেন এবং প্রায় চারশ' পঞ্চাশ বছর আগে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই এলাকা তখন 'কাঠ-ঘর' নামে পরিচিত ছিল। প্রধান মন্দির নির্মাণ করেন হরচরণ গিরী, প্রায় দু'শ' পশ্চাশ বছর আগে। এরপর মন্দিরের অনেক সংস্কার করা হয় এবং কিছু নতুন স্থাপনাও সংযুক্ত করা হয়।[৪৩]

এই মন্দিরের বেষ্টনী প্রাচীর তৈরি করা হয় প্রাচীন কালের ইট দিয়ে - এর দক্ষিণদিকে তৈরি করা হয় আধুনিক প্রবেশপথ। প্রবেশপথের সামনের পুকুরটি খনন করান ভাঁওয়ালের রানী বিলাসমনী দেবী। প্রবেশপথ দিয়ে ঢোকার পর বামদিকের মাঝখানে দেখা যায় একটা বেদীসহ চতুষ্কোণ-সমান একটা নির্মাণ কাঠামো। এটাই হলো পুরনো মন্দির। এর পাশেই আছে দ্বিতীয় মন্দিরটি – এই মন্দিরটি নির্মাণ করা হয় হিন্দু স্থাপত্য শিল্পসহ একেবারে বাঙালি স্টাইলে। অবশ্য মুসলিম ধনুকাকৃতি খিলানের প্রবেশপথ ও প্যানেল এই মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। এটা একটা সমচতুর্ভূজ আকারের বিল্ডিং, এটা নির্মিত হয়েছে স্তম্ভমূলস্থ চতুষ্কোণ উঁচু কাঠামোর ওপরে। এর কোনায় সম্মুখভাগে আছে খাট ও মোটা প্রলম্বিত বহিরাংশ; এর ছাদ গম্বুজের মতো, তবে তা পুরোপুরি স্থানীয় বাঁশের তৈরি চৌচালা ঘরের ছাদের মতো দেখতে। বাইরের দিকে আছে ধনুকাকৃতি খিলানের প্যানেল এবং প্রতিটি প্যানেলে আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনুকাকৃতি খিলানের জানালা। বিল্ডিং-এর গঠন-কাঠামো অত্যন্ত পুরু এবং সম্মুখভাগে প্লাস্টার নেই (পরে প্লাস্টার করা হয় এবং তা অতি সম্প্রতিকালের) – এ থেকে ধারণা করা যায় যে, বিল্ডিংটি অত্যন্ত প্রাচীন। মন্দিরের রেকর্ডে যে তথ্য পাওয়া যায় তা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয় একজন খ্যাতনামা বারভূঁঞা জমিদার কেদার রায়ের গুরুর জন্য। এর উত্তর দেয়ালের মাঝ বরাবর গোপাল গিরীর সমাধির স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায়; আশপাশে আরো অনেক সমাধির স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায়। একটু দূরে দেখা যায় অমসৃন একটি পাথর খন্ড; এই পাথর খন্ড সম্পর্কে পূজারীদের কাছ থেকে অনেক রহস্যপূর্ণ কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। এখানে একটা বড় সমচর্তুভূজ আকারের প্লাটফরম দেখা যায়; পূর্বকালে এখানে চৈত্র মাসে বহু লোক সমবেত হতো। এই প্লাটরমের কাছে আছে হরচরণ গিরীর সমাধি – এটা নির্মাণ করা হয় পেঁচান বা সর্পিল মন্দিরের মতো করে। এর নিচের ক্ষুদ্র কক্ষ অষ্টকোণ বিশিষ্ট এবং উঁচু অংশ সর্পিল মোচাকার লম্বা বস্তুর মতো। মন্দিরের দু'অংশ পৃথক হয়ে আছে গভীরভাবে বাঁকা ছাজ্জার (Chhajjas) কারণে। মন্দিরটি উজ্জ্বল দেখায় এর ধনুকাকৃতি খিলানের চূঁড়া প্যানেল ও কোনার সরু বুরুজের জন্য।

প্রধান মন্দিরটিও সর্পিল মোচাকার লম্বা বস্তুর মতো; এটা স্থাপিত হয়েছে কয়েকটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট কক্ষের ওপর একটা অবকাঠামোর ওপর। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পাথর নির্মিত সিঁড়ি দিয়ে এর ওপরে যাওয়া যায়। এই মন্দিরের নির্মাণ পরিকল্পনা করা হয় তান্ত্রিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে – এতে আছে একটা ক্ষুদ্র কক্ষ ও চতুষ্পার্শ্বে বারান্দা, চারকোনায় আছে উন্মুক্ত প্লাটফরম। বারান্দার ওপর চারপাশে ঘেরা খিলানসহ ধনুকাকৃতির ছাদ। প্রত্যেক দিক থেকে একাধিক চূঁড়াবিশিষ্ট ধনুকাকৃতির খিলানবিশিষ্ট প্রবেশ পথ আছে মন্দিরে যাওয়ার জন্য। অভ্যন্তরভাগের মেঝে বর্তমানে মার্বেল পাথরের – প্রথমে ছিল আটটি পদ্মপাতার নকশা। ছাদের নিচে আছে একটা গম্বুজ, ঝুলন্ত অবস্থায়। মধ্যখানে আছে একটা সিংহাসন; ওই সিংহাসনের ওপর স্থাপন করা হয়েছে কালীর মূর্তি। কালীর পায়ের কাছে স্থাপন করা আছে লিঙ্গমূর্তি।

এই স্থান থেকে প্রায় একশ' গজ উত্তর-পশ্চিমে আছে শিব মন্দির। এই মন্দিরের সাথে আনন্দময়ী নামের একজন সাধু মহিলার স্মৃতি জড়িয়ে আছে – ওই সাধু মহিলা জগতের সবকিছু ত্যাগ করে আত্মার মুক্তির পথে জীবনকে উৎসর্গ করেন।

৩৬. সুজাতপুরের শিখ মন্দির রমনা রেস কোর্স থেকে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যে রাস্তাটি নিলক্ষেতের দিকে গিয়েছে, সেই রাস্তার ডানপাশে এই শিখ মন্দিরটি অবস্থিত। নব-নির্মিত পাবলিক লাইব্রেরি বিল্ডিং-এর পরেই এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে গুরু বখশ সিং লেখেন 'কথিত আছে যে, ষষ্ঠ গুরু (সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়, সপ্তদশ শতাব্দী) আলমাসত্ নামের একজন পবিত্র শিখ ও অতি উৎসাহী ধর্মপ্রচারককে জাহাঙ্গীরাবাদ-এ (প্রকৃতপক্ষে জাহাঙ্গীরনগর) প্রেরণ করেন; তখন ঢাকা সরকারিভাবে পরিচিত ছিল জাহাঙ্গীরনগর হিসেবে। এই আলমাসত্ই উপরোক্ত মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। আলমাসত্-এর পর পর্যায়ক্রমে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন নাথি সাহেব; ওই নাথি সাহেবের নামানুসারে ওই সঙ্গতটি শিখদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। কুয়ার সাথে সংযুক্ত পাথরের স্মৃতিফলক থেকে ওই তথ্য পাওয়া যায় – ওই স্মতিফলকে লেখা আছে, 'সৃষ্টিকর্তা সত্যিকার খোদার নামে এবং গুরু নানকের নামে, আলমাসত্ রাজ-এ নানকমাতায় সংযুক্ত এই গুরু-গদী। সুজাতপুরে বাবু নাথা সাহেবের সঙ্গত; মহন্ত হলো প্রেমদাস। সুন্দরভাবে সংস্কার করা হয় বর্তমানে ১২৪০ শক সালে (১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে)।'[৪৪] বাংলা ভাষায় লেখা অপর একটি স্মৃতিফলক সংযুক্ত করা আছে কুয়ার ওপরে।

এই শিখ স্থাপনাটি বিরাট এলাকা নিয়ে পরিব্যাপ্ত – উত্তরদিকের ছোট পথ থেকে ধনুকাকৃতির প্রবেশপথ দিয়ে এর আঙ্গিনায় প্রবেশ করা যায়। এর অভ্যন্তর ভাগ দুই অংশে বিভক্ত – পূর্বদিকে আছে মন্দির ও আবাসিক কমপ্লেক্স এবং পশ্চিমদিকের অর্ধেক অংশে আছে পাকা জলাধার, কুয়া এবং একাধিক সমাধি। পূর্বদিকে আছে সমকোণী চতুর্ভূজ আকারের প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের উত্তর ও দক্ষিণদিকে আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবাসিক কামরা এবং এর পশ্চিমদিকে আছে মন্দির। মন্দিরের আঙ্গিনায় একটা বেদী (উঁচু আসন) আছে, ওই বেদীর ওপর আছে একখণ্ড কালো পাথর। ওই কালো পাথরের ওপর আছে পায়ের ছাপ (সম্ভবত কোনো গুরুর)। একটা সমকোণী চতুর্ভূজ আকারের মূল কামরার চর্তুদিকে একাধিক কামরাবিশিষ্ট এই মন্দিরে চারদিকে চারটি এবং চার কোনায় চারটি কামরাসহ মোট ন'টি কামরা আছে। একটা কামরার সাথে অন্য কামরার সংযোগ আছে ধনুকাকৃতির প্রবেশপথের মাধ্যমে। এর ছাদ সমান ও ধনুকাকৃতির মতো এবং পাশে আছে মোচাকার খিলান। মূল ঘরে একটা ছোট প্লাটফরম আছে, ঐ প্লাটফরমের ওপর রাখা আছে গুরু গ্রন্থ সাহেব।

এই মন্দিরের নিম্নতলার নকশা বিবি পরীর সমাধির কামরাগুলোর মতো অবিকলভাবে সাজানো।[৪৫] অন্যান্য বিষয়ে অবশ্য এ দুই স্থাপনার মধ্যে পার্থক্য আছে। মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সম্ভবত নাথ সাহেব কর্তৃক নির্মিত বলে মনে করা হয়।

এ সঙ্গতের সর্বশেষ প্রতিনিধি শ্রী চান্দ জ্যোতি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ভাগের পর চলে যান। উত্তরদিকের দেয়ালে একটা মার্বেল পাথরে তাঁর একটা স্মৃতিফলক আছে, ওই স্মৃতিফলক স্থাপনের সময় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ। মন্দিরটি এখন অবহেলিত অবস্থায় আছে। শিখদের পবিত্র গ্রন্থ আদ্রতা ও আবহাওয়ার কারণে প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

৩৭. ঢাকেশ্বরী মন্দির মন্দিরটি অবস্থিত ঢাকেশ্বরী রোডে, ঢাকেশ্বরী সরকারি কোয়ার্টারের পাশে। ঢাকেশ্বরী দেবীকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা ঢাকার তত্ত্বাবধায়ক বা প্রধান দেবী হিসেবে গণ্য করে।[৪৬] এই দেবীর নাম থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত কাহিনীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য এক কাহিনী থেকে জানা যায় যে, রাজা মানসিংহ এই মন্দির নির্মাণ করেন বা সংস্কার করেন। কোন্ সালে এই মন্দির নির্মাণ করা হয় তা উল্লেখ নেই। তবে এর নির্মাণ স্টাইলে মনে হয়, এটা সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত। তবে পরবর্তীকালে এর সংস্কারের দিকটি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। ব্রাডলি বার্ট উল্লেখ করেন 'মন্দিরটি দু'শ' বছরের পুরনো এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে নিয়োগকৃত একজন হিন্দু এজেন্ট ওই মন্দিরটি নির্মাণ করেন বলে কথিত আছে।'[৪৮]

প্রাচীরবেষ্টিত এলাকায় দু'ধরনের মন্দির আছে – ওই এলাকার মধ্যে যাওয়ার জন্য আধুনিক প্রবেশপথ আছে। একই এলাকার মধ্যে আছে রেস্ট হাউজ এবং এর বাইরে আছে জলাধার। এক ধরনের মন্দিরে আছে চারটি পেঁচনো মোচাকার চূঁড়া – সবকিছুই স্থাপিত একটা উঁচু স্তম্ভমূলক চতুষ্কোণ স্থানের ওপর। প্রতিটি স্থানই পবিত্র তীর্থস্থান – সব স্থানেই সমকোণী চতুর্ভূজ আকারের ক্ষুদ্র কক্ষ আছে। ওই কক্ষের ওপর আছে বাঙালি টাইপের গম্বুজ আকারের ছাদের ছ'টি অপসৃয়মান ধাপ। একটা পদ্মফুলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুঁড়ির মধ্যে আছে লতাপাতা শোভিত শস্যভরা কলস। সবদিকের দেয়াল প্লাস্টার করা এবং একমাত্র উত্তরদিক ছাড়া সবদিকেই ধনুকাকৃতির খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আছে – ওইসব প্রবেশপথের বাইরের দিকে চূঁড়া সন্নিবেশিত আছে। দরজার ওপরে আছে দৃঢ় সমতল মোল্ডিং এবং গম্বুজের মতো ছাদে আছে ধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত প্যানেলের অর্ধ-বৃত্তাকার চূঁড়া।

অন্য এক ধরনের মন্দির আছে পূর্বদিকে। উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত বিরাট এক প্রবেশপথ দিয়ে ঐসব মন্দিরে যাওয়া যায়। আধুনিক মন্ডপ হল থেকে মন্দিরের সম্মুখভাগ দেখা যায়, দেখা যায় এর তিনটি পিরামিড জাতীয় সিখারা (Sikhara) – মূল শিখারাটি অপরগুলো থেকে আকারে বড়, প্রত্যেক কোনার সিখারার ওপর আছে চূঁড়া। বস্তুত সিখারা হলো চারটি অপসৃয়মান ধাপ – প্রথমটি হলো বাঙালি গম্বুজ ধরনের ছাদ এবং বাকী তিনটি হলো উত্তর ভারতীয় চন্দ্রাতপ ধরনের – এর সবকিছুর ওপরে আছে লতাপাতা শোভিত পদ্মফুল। পরিকল্পনা অনুযায়ী মন্দিরে আছে তিনটি কামরা – মাঝের কামরাটি অন্য দুই কামরা থেকে বড় – একই সমান্তরালে; সামনে আছে ঝুলন্ত বারান্দা। তিনটি ধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ দিয়ে এখানে আসা যায় – প্রতিটি বারান্দার শুরু সরু গোলাকার স্তম্ভ থেকে। আলম্ভস্তম্ভের মাঝখানে অঙ্কিত আছে সিংহের মূর্তি; বাইরের অংশ লতা-পাতার নকশা দ্বারা শোভিত। খোদাই করা কার্নিস-এ আছে ডিজাইন মোল্ডিং।

তিন কামরাবিশিষ্ট মধ্যবর্তী স্থান, পিরামিড জাতীয় তিনটি সিখারা এবং এর সম্মুখভাগে বারান্দাসহ মন্দিরের নকশা নিঃসন্দেহে সমমায়িক কালের মোগল যুগের মসজিদের নকশার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দুই নকশার মধ্যে অনেক মুসলিম উপাদান থাকলেও উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। মন্দিরের সামগ্রিক নকশা আকর্ষণীয়।

চ. সাতমসজিদ যাওয়ার পথে

আজিমপুরের পর পিলখানা, এখানে পূর্বে সরকারি হাতী রাখা হতো। এরপরে আছে দীর্ঘ সবুজ এলাকা – ওই এলাকায় আগে মোগলদের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ছিল। নিউমার্কেট থেকে একটা পাকা রাস্তা সাত মসজিদের দিকে গিয়েছে; ওই রাস্তার পাশে এখনো অনেক পুরনো অস্তিত্বের নিদর্শন আছে।

৩৮. বাঙালি কুঁড়েঘর ধরনের নির্মাণ কাঠামো : পিলখানা থেকে প্রায় একশ' গজ দূরে একটা প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায় – এটা বাঙালি কুঁড়ে ঘরের মতো ক্ষুদ্র নির্মাণ কাঠামো। ইট ও প্লাস্টার দিয়ে তৈরি একটা ছোট সম-চতুর্ভূজ আকারের কামরার ওপর দোচালা ছাদ, ছাদের প্রান্তে আছে ত্রিকোণা অংশ – ছাদের সামনে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছনে ঢালু। বাংলায় বাঁশের তৈরি কুঁড়ে ঘরের মতো এটা দেখতে। এর নির্মাণকাল সপ্তদশ শতাব্দী হতে পারে। এই নির্মাণ কাঠামোর আশেপাশে বর্তমানে ঝোঁপ-জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। স্থানটি মূল রাস্তা থেকে বেশ দূরে এবং তা এখন সামরিক এলাকার (বাংলাদেশ রাইফেলস) মধ্যে পড়েছে।

৩৯. প্রধান ঈদগাহ : পিলখানা থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে রায়ের বাজার নামক গ্রামে একটা ঈদগাহের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এর প্রাচীর ইট দিয়ে নির্মিত, প্লাস্টার করা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডানদিকে ঈদগাহটি দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান মেহরাবের ওপর স্থাপিত নামফলক থেকে দেখা যায় ঈদগাহটি নির্মাণ করেন শাহজাদা শাহ সুজার দেওয়ান মীর আবুল কাশিম, ১০৫০ হিজরি সালে (১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ)।[৪৯] ঈদগাহটি মূলত একটি একক দেয়াল বিশিষ্ট মসজিদ; এতে বড় ধরনের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন থাকবে, এটা আশা করা যায় না। বর্তমান এই স্থাপনার প্রধান গুরুত্ব হলো এই যে, এই স্থাপনাটি ঢাকায় মোগল যুগের প্রথম দিককার নিদর্শন এবং এতে রাজকীয় মোগল স্টাইলের কোনো ছাপ নেই।

পুরো ঈদগাহটি মাটি থেকে প্রায় চার ফুট উঁচু; এর আয়তন ২৪৫ ফুট×১৩৭ ফুট। এর উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণদিকে প্রাচীর দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ – ওই দেয়াল ছ'ফুট উঁচু ছিল বলে কথিত আছে। পশ্চিম দিকের দেয়াল ছিল প্রায় পনের ফুট উঁচু – দেয়ালের মাঝখানে ছিল উঁচু চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ধনুকাকৃতির খিলানসহ অর্ধ-অষ্টকোণী মেহরাব। এর বাইরের দিকে একাধিক চূঁড়া সংযুক্ত করে তা আড়ম্বরপূর্ণ করা হয়। এর দু'পাশে ফ্রেমের মধ্যে ছিল একাধিক চূঁড়াবিশিষ্ট ধনুকাকৃতির খিলান। মূল মেহরারের দু'পাশে তিনটি করে অতিরিক্ত মেহরাব ছিল। এতে ছিল সাধারণ দেয়ালের ধনুকাকৃতি খিলান। দেয়াল ভেঙ্গে গেলেও ওই মেহরাবগুলোর অস্তিত্ব ছিল। মেহরাবের ওপর ছিল সমতল কার্নিসের বেড় - এর ওপর ছিল ছিদ্রযুক্ত চূঁড়া। দেয়াল ও পুরো এলাকায় ঝোপ-জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়। (একথা বলা হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে)।

৪০. শিখের মন্দির ও গুরু নানকের কূপ : ঈদগাহ থেকে প্রায় আধ মাইল উত্তরদিকে শিবপুর নামে একটা গ্রাম আছে। ওই গ্রামের প্রান্তে আছে শিখের মন্দির ও গুরু নানকের কূপ। এই স্থানে গুরু নানকের আগমন সম্পর্কে গুরু বখশ সিং-এর লেখা থেকে জানা যায় 'গুরু নানক তাঁর একজন সঙ্গীকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং সারা হিন্দুস্তান ও বিহার থেকে কামরূপ ভ্রমণ করেন পদব্রজে। তিনি তাঁর ভ্রমণের রাস্তায় হিন্দু ও মুসলমানের পবিত্র স্থানগুলো পরিদর্শন করেন। কামরূপ থেকে তিনি দক্ষিণদিকে যাত্রা করেন এবং সেখান থেকে তিনি কালীমন্দির ও জগন্নাথপুরীতে যান। প্রাচীনকালে ঢাকেশ্বরী মন্দির ছিল তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি পবিত্র স্থান। তাঁর যাত্রাপথে এই ঢাকেশ্বরী মন্দির পড়ে এবং তিনি তা পরিদর্শন করতে আগ্রহী হন। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে গুরু নানক তাঁর যাত্রাবিরতি করেন এবং রায়ের বাজারের উত্তরদিকের ঘাটে অবতরণ করেন। ওই স্থানটিতে গরিব লোকেরা সম্ভবত বসবাস করতো এবং তারা পেশায় ছিল কুম্ভকার; এখনও তারা ওই স্থানে বসবাস করে। এই লোকদের মধ্যে এখনও সেই মহান গুরুর আগমনের কথা স্মরণে আছে এবং তাঁর প্রতি তাদের গভীর ভক্তি এখনও অব্যাহত আছে; সেই স্মৃতি এখন তাদের মন থেকে আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখানকার একটা কূপ এখনও সেই আগমনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জাফরাবাদের জলাভূমির কাছে কাঁটা ঝোপের মাঝে প্রায় লুকায়িত অবস্থায় টিকে আছে একটি কূপ - এর আশপাশে একটা স্তূপ বা দু'টি ধ্বংসাবশেষ শিখ মঠ-এর অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওই স্থানটি এক সময় গড়ে ওঠে জাঁকজমকভাবে। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা হয় যে, একটা কূপসহ মন্দিরটি গড়ে ওঠে। একটা ধনুকাকৃতির খিলানযুক্ত প্রবেশপথসহ মন্দিরটি ছিল সমচতুর্ভূজ আকারের একটা বিল্ডিং; এরসাথে ছিল একটা ঝুলন্ত ছাদ। এই মন্দিরের সাথে পরবর্তীকালে একটি জলাধার ও জলাধারের কাছে একটা 'বেরাদারী' (Baradari) সংযুক্ত করা হয়। কূপটি গুরু নানকের কূপ বলে পরিচিত। স্থানীয়ভাবে এই কাহিনী প্রচলিত আছে যে, গুরু নানক ওই কূপের পানি পান করেন। শিখদের কাছে প্রচলিত কাহিনীটি কিছুটা যুক্তিনির্ভর। বলা হয়, পানি পান করার জন্য গুরু নানক তাঁর হাতের লাঠির অগ্রভাগ দিয়ে একটা গর্ত করেন। যা-ই হোক না কেন, স্থানটি শিখদের কাছে পবিত্র স্থানে পরিণত হয়। শিখ ধার্মিক ব্যক্তিরা সেখানে অনতিবিলম্বে একটা মঠ নির্মাণ করেন। গুরু নানকের আগমনের পর থেকে ওই কূপের পানির অদ্ভুত গুণের কথা বলা হতে থাকে। আশেপাশের গ্রামের লোকেরা বছরে একবার চৈত্রমাসে ওই স্থানে আসতো বনভোজন করার জন্য। কিন্তু পরে ওই স্থানে মানুষের সমবেত হওয়ার ধরন পাল্টে যায় – সঙ্গত উপলক্ষে শুরু হয় বার্ষিক মেলা ও যজ্ঞ।'[৫০]

গুরু নানকের আগমনের কথা আর কোনো প্রামাণ্য সূত্র থেকে জানা যায় না। এখন ওই স্থানে আর কোনো মেলা হয় না। জলাধারটি এখন মাঠের সমান্তরাল হয়ে গিয়েছে। ইট দ্বারা নির্মিত কূপটির ব্যাসার্ধ দশ ফুট ও ত্রিশ ফুট গভীর। এই কূপের পাশে আছে একটা আধুনিক বিল্ডিং – এটা সম-চতুর্ভূজ আকারের হলবিশিষ্ট এবং এরসাথে আছে ঝুলন্ত বারান্দা। বিল্ডিংটি আছে সরকারের তত্ত্বাবধানে।

৪১. দারা বেগমের সমাধি : গুরু নানকের কূপের প্রায় আধা মাইল দূরে আছে ধ্বংসপ্রাপ্ত দারা বেগমের সমাধি।[৫১] প্রধান রাস্তা থেকে সমাধিটি প্রায় দুই ফার্লং উত্তরে – একটা ফুটপাথ দিয়ে ওই স্থানে যাওয়া যায়। সমাধিটি একটা উঁচু স্থানে অবস্থিত এবং সেখান থেকে চতুর্দিকের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এই সমাধির উত্তর-পূর্ব দিকে, প্রায় পৌনে এক মাইল দূরে, আছে 'ময়লাখানা'– এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে রেডিও পাকিস্তানের ট্রান্সমিটার। এই ট্রান্সমিটারের স্থান ও মনিপুর এগ্রিকালচারাল ফার্মকে বিভক্ত করেছে মিরপুর রোড। (মনিপুর নামটি এসেছে মনিপুরী জনগণ থেকে – এই এলাকা থেকে ইংরেজদের ফ্যাক্টরি সরিয়ে নেওয়ার পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তারা এখানে বসতি স্থাপন করে – ফ্যাক্টরিটি যেখানে স্থাপন করা হয় সেখানে পরে স্টেট ব্যাংক (পরে বাংলাদেশ ব্যাংক) বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়)। মনিপুর এলাকার পরেই নতুন তেজগাঁও এরোড্রাম বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়।

ঢাকায় এ ধরনের সমাধি বিল্ডিং আর নেই। এর গম্বুজটি অত্যন্ত বড়, ২৫ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট – সম-চতুর্ভূজ আকারের একটি কামরা আছে যার প্রতিটি দিক ২৭ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা। এছাড়া এর দক্ষিণদিকে একটা ঝুলন্ত বারান্দা আছে যা ১৩ ফুট চওড়া। দক্ষিণদিকের সম্মুখভাগে আছে উন্মুক্ত ধনুকাকৃতির খিলানবিশিষ্ট চূঁড়া এবং দেয়ালে আছে পাতলা প্যানেল, যা দেখতে খুবই সাধারণ। সামনের দিকটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বিল্ডিং-এর বিভিন্ন কোনায় ৬টি সরু মিনার আছে। বারান্দার দেয়ালে আছে কুলঙ্গি আর ওপরে আছে ঝুলন্ত বারান্দা। অভ্যন্তরভাগের হলে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের তিনটি ধনুকাকৃতির খিলানযুক্ত প্রবেশপথ দিয়ে যাওয়া যায় – দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পশ্চিমদিকে আছে একটি অর্ধবৃত্ত অষ্টকোণী মেহরাব; এর পাশে সাম্প্রতিককালে একটা উঁচু স্থান নির্মাণ করা হয়েছে। গম্বুজের গোঁড়ায় আছে ডিজাইন মোল্ডিং, সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য।

বিল্ডিংটি কখন নির্মাণ করা হয় তার সাল-তারিখ জানা যায় না। তবে এর সাধারণ ধনুকাকৃতির প্রবেশপথ, মূল প্রবেশপথের ওপর গুরুত্ব না দেয়া এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অতি সামান্য প্রয়াস শায়েস্তাখানি-পূর্ব নির্মাণ কৌশলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বিল্ডিং তৈরির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা কঠিন। এর অভ্যন্তরে এখন কোনো কবর নেই; স্থানীয় লোকেরা বলে যে তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে মেহরাব-এর অস্তিত্ব দেখে সন্দেহ জাগে যে, এটা আদৌ সমাধি কিনা। কারণ, বাংলায় কোনো সমাধির মধ্যে এ রকম মেহরাব নেই; অবশ্য এ ধরনের মেহরাব উত্তর ভারতের সমাধির অভ্যন্তরে দেখতে পাওয়া যায়। দারা বেগমই বা কে ছিলেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। এই বিল্ডিং-এর আশপাশে ঝোঁপ-ঝাড় গজিয়ে উঠেছে।

৪২. কাটাজুর (Katajur)-এ আলাকুরীর মসজিদ : দারা বেগমের সমাধি থেকে প্রায় আধা মাইল দূরে কাটাজুর গ্রামের রাস্তার বাম দিকে ছোট একটা সুন্দর মসজিদ আছে – এই মসজিদটি শায়েস্তাখানি আমলের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। একটা উঁচু স্থানের পশ্চিম ধারে মসজিদটি অবস্থিত - এর দক্ষিণদিকে একটা কূপ আছে। মসজিদটি একগম্বুজ বিশিষ্ট এবং সম-চতুর্ভূজ আকারের বিল্ডিং; প্রতিটি দিকই (অভ্যন্তরভাগে) সাড়ে বারো ফুট লম্বা। এর কোনায় আছে অষ্টকোণী মিনার, মিনারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপরে আছে প্লাস্টার করা সামিয়ানা এবং তা সমানভাবে ঢালু। পূর্বদিকের বাইরের দিকটা খুবই আকর্ষণীয় – এদিকে আছে ধনুকাকৃতি খিলানের প্যানেল এবং প্রলম্বিত ধনুকাকৃতি খিলানের উন্মুক্ত স্থান। দুই স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে আছে বাঁশির ছেদার ন্যায় খাঁজ-কাটা চিকন প্রলম্বিত চতুষ্কোণ স্তম্ভের মিনার, যা প্রতিস্থাপিত আছে দুই কলসের স্তম্ভমূলের ওপর। একটা অর্ধ-গম্বুজের নিচে প্রবেশপথ খোলা যায় – ওই অর্ধ-গম্বুজের ওপরে একটা শিলালিপি সংযুক্ত ছিল। কথিত আছে যে, গত শতাব্দীতে ভাঁওয়ালের রাজা ওই শিলালিপি অপসারিত করেন। সম্মুখভাগের পেছনের অংশের অনেক কিছুই ভেঙ্গে গিয়েছে; এই অংশ থেকেই গম্বুজ গিয়েছে ওপরের দিকে। অভ্যন্তরভাগের হলটি বেশ আকর্ষনিয় – এর মধ্যে আছে অলঙ্কারপূর্ণ মূল মেহরাব এবং স্তম্ভের মাথার ওপর প্রতিস্থাপিত গম্বুজ, গম্বুজের গোঁড়ায় আছে ফুলের কারুকাজের ডিজাইন ও তার ওপর আছে লতাপাতার কারুকাজ। বর্তমানে গ্রামবাসীদের তত্ত্বাবধানেই মসজিদটি আছে।

৪৩. সাতগম্বুজ মসজিদ : আলাকুরীর মসজিদের প্রায় ৫০ গজ দূরে অবস্থিত ঐতিহাসিক সাতগম্বুজ মসজিদ। এটা অবস্থিত জলাভূমির উত্তর ধারে। এ স্থান দিয়েই আগে বুড়িগঙ্গা নদী প্রবাহিত হতো। বর্তমানে বুড়িগঙ্গা প্রবাহিত হয় আরো মাইলখানেক দূরে। বর্ষাকালে নৌকায় করে মসজিদের দিকে আসার সময় সবুজ ঝোঁপ-ঝাড় ও জঙ্গলের পেছন দিকে সাদা প্লাস্টার করা মসজিদকে খুবই সুন্দর দেখায়। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায়, এই মসজিদ নির্মাণ করেন নবাব শায়েস্তা খান।[৫২] এই মসজিদ নির্মাণে যে অলঙ্কারপূর্ণ স্টাইল অনুসরণ করা হয়েছে তাতে মনে হয়, এটা ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকেই নির্মাণ করা হয়েছে।

একটা আধুনিক ছোট প্রবেশপথ দিয়ে মসজিদে যাওয়া যায়। মসজিদটি প্রস্থের চেয়ে দৈর্ঘে বড় – বাইরের দিক থেকে এটা ৫৮ ফুট লম্বা এবং প্রস্থ ২৭ ফুট। চারটি কোনায় প্রচলিত মিনারের পরিবর্তে আছে বারো ফুট চওড়া বিশিষ্ট অষ্টকোণী ফাঁপা টাওয়ার। এই টাওয়ারগুলো দ্বিতলবিশিষ্ট; প্রতিটি তলায় আছে ধনুকাকৃতির খিলানযুক্ত প্যানেল ও জানালা। এর ওপর আছে পদ্মফুলের লতাপাতার কারুকাজ শোভিত গম্বুজ। সামনের দিকে মূল অংশে আছে তিনটি প্রবেশপথ, এতে আছে চারকোণা বিশিষ্ট ধনুকাকৃতির খিলান। মাঝখানের প্রবেশপথটি অন্য দুই প্রবেশ পথের চেয়ে বড় – সব প্রবেশপথের ওপরে আছে কৌণিক অর্ধ-গম্বুজসহ উঁচু ধনুকাকৃতির খিলান। মূল উঁচু ধনুকাকৃতির খিলানটি একাধিক চূঁড়াবিশিষ্ট; পাশের ধনুকাকৃতির খিলানের বাইরের দিকে আছে অলঙ্কারপূর্ণ চূঁড়া। মূল প্রবেশপথটি দেয়াল থেকে সামনের দিকে সামান্য প্রলম্বিত এবং তার চতুর্দিকে অলঙ্কারপূর্ণ মিনার দ্বারা বর্ডার করা। সামনের পুরো অংশটি কুলঙ্গিসহ প্যানেল করা এবং এর ওপরে আছে সচ্ছিদ্র প্রাচীরের মতো চূঁড়া; আধুনিক নীল রঙের গোলাকার বেড়-এর ওপর। কোনার টাওয়ারেও দুই স্তরে একই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের চূঁড়ার ঢাকনা আছে। পুরো ছাদটি ঢাকা আছে তিনটি গম্বুজ দ্বারা; এছাড়া টাওয়ারগুলোর ওপর আছে চারটি গম্বুজ। সব মিলিয়ে সাতটি গম্বুজের জন্য এই মসজিদকে বলা হয় সাত গম্বুজ মসজিদ। প্রধান গম্বুজটি অন্যসব গম্বুজ থেকে বড় এবং সব গম্বুজের গোড়ায় আছে ডিজাইন মোল্ডিং এবং তার শেষ হয়েছে পদ্মফুলের লতাপাতার কারুকাজ দ্বারা। অভ্যন্তরভাগে এসব আছে ঝুলন্ত অবস্থায় এবং বাহ্যিকদিকে তা আছে গম্বুজের গোড়ায়। পশ্চিমদিকে আছে তিনটি মেহরাব – দুই মেহরাবের মধ্যবর্তী স্থানে আছে কারুকাজমণ্ডিত চূঁড়া।

মসজিদ বিল্ডিং-এর সাথে পরিবেষ্টিত প্রবেশপথের ডানদিকে জনৈক ফকির-এর কবর আছে – ওই ফকির প্রায় ত্রিশ বছর আগে মৃত্যুবরণ করেন (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে একথা বলা হয়)। প্রাক্তন একজন মোতওয়াল্লীর কবরও এখানে দেয়া হয়। মসজিদ থেকে প্রায় একশ' গজ উত্তর-পূর্ব দিকে দু'টো ধ্বংসপ্রাপ্ত ইটের তৈরি কবর আছে – এই কবরের দরজার ফ্রেম ছিল কালো পাথরের মতো ও ছিল মার্বেলের জালি।[৫৩] কিন্তু বর্তমানে ওইসব নির্মাণ কাঠামো মাটির ওপর পড়ে আছে। আউলাদ হাসান বলেন, এখানে শায়েস্তা খানের দুই মেয়ের কবর দেয়া হয়।

সাতগম্বুজ মসজিদের পর আছে বুড়িগঙ্গা নদীর প্রশস্ত এলাকা – শীত ও বর্ষাকালে এখানে বহু ধরনের পাখি আসে। ঢাকায় আনন্দদায়ক নৌকা ভ্রমণের জন্য এটা একটা উত্তম স্থান।

ছ. তেজগাঁও যাওয়ার পথে

বর্তমানে ময়মনসিংহ রোড, যা তেজগাঁও-এর দিকে গিয়েছে, ছিল পুরনো মোগল ট্রাঙ্ক রোড। এ রাস্তাটি নির্মাণ করেন মীর জুমলা। এক সময় এই রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে মোগল ঘোড়সওয়ার বাহিনী পূর্বাঞ্চলের সীমান্তের দিকে যাতায়াত করতো। ওই সময় তেজগাঁও এলাকা ছিল ইউরোপীয়ানদের দখলে। এখানেই ইংরেজদের প্রথম ফ্যাক্টরি ও উদ্যান ছিল, যা এখন কৃষি ফার্মের দখলে। পর্তুগীজরা ছিল তাদের আগের স্থানে (এখন তা আমেরিকানদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে)। রাস্তার ডানদিকে ছিল ফরাসীদের গার্ডেন, আর বামদিকে প্রসারিত ছিল পর্তুগীজদের গার্ডেন।

৪৪. খাজা আম্বরের ব্রিজ : এই রাস্তায় প্রথম যে স্মৃতিস্তম্ভটি দেখা যায় তা হলো খাজা আম্বরের ব্রিজ – কারওয়ান নামে স্থানীয় একটা এলাকা থেকে সামান্য দূরে। খাজা আম্বর ছিলেন নবাব শায়েস্তা খানের খোজা পুরুষদের প্রধান। তিনি এই ব্রিজটি নির্মাণ করেন ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে।[৫৪] এই ব্রিজটি ছিল ইস্কাটন খালের ওপর। প্রথমে এই ব্রিজটি ছিল একক চতুষ্কোণ কেন্দ্রবিশিষ্ট সরু ধনুকাকৃতি খিলানের ওপর – এর দু'পাশে ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিজের অগ্রভাগ। ময়মনসিংহ রোড সম্প্রতি প্রশস্ত করার সময় ওই ব্রিজ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হয়।

৪৫. খাজা আম্বরের মসজিদ : কারওয়ান নামক স্থানে ময়মনসিংহ রোডের ডানদিকে অবস্থিত খাজা আম্বরের মসজিদটি। ইটের তৈরি একটা উঁচু প্লাটফরমের ওপর মসজিদটি স্থাপিত। পূর্বদিকে সামান্য কিছুটা এগিয়ে গেলে দেখা যায় পাথরের দরজার ফ্রেমের ধনুকাকৃতির খিলানের একটা প্রবেশপথ। সিঁড়ির ডানপাশে আছে একটা কূপ, যা খনন করান খাজা আম্বর। মসজিদটি সম্প্রতি সংস্কার করা হয় এবং এ সময় এর অনেক কিছু পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যেমন তিনটি গম্বুজ, এর অলঙ্কারপূর্ণ বহির্ভাগ এবং অভ্যন্তরভাগের আকর্ষণীয় হল অপরিবর্তিত রাখা হয় – এসব নির্মাণ কাঠামো শায়েস্তাখানি স্থাপত্যের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। মূল প্রবেশপথের ওপরে সংযুক্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়, শায়েস্তা খানের গভর্নরের আমলে খাজা আম্বর ওই মসজিদ, কূপ ও ব্রিজ নির্মাণ করেন।[৫৫] অন্য একটি শিলালিপি দেখতে পাওয়া যায় মেহরাবের সাথে সংযুক্ত – এতে আছে কুরআনের একটি আয়াত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই মসজিদের মেহরাব, খোতবা দেয়ার উঁচু স্থান এবং ধনুকাকৃতির খিলান নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে পাথর। এসব পাথর কালো রঙের এবং তা রাজমহল থেকে বাংলায় আনা হয়। মসজিদের দক্ষিণদিকে ইট দিয়ে নির্মিত একটা ফলক আছে একটা কবরের ওপরে – এখানেই শায়িত আছে ওই মসজিদের নির্মাতা।

৪৬. তেজগাঁও গীর্জা ঢাকায় বিদ্যমান গীর্জাগুলোর মধ্যে তেজগাঁও-এর গীর্জা সবচেয়ে প্রাচীন। এটা হলো পর্তুগীজ মিশনের গীর্জা, এর ইতিহাস আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ড. টেলর লেখেন : 'ঢাকার মধ্যে তেজগাঁও-এর গীর্জা ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সেন্ট অগাস্টাইন মিশনারীজ প্রতিষ্ঠিত করে বলে জানা যায়। তবে দক্ষিণ ভারতের নেস্টোরিয়ানদের উপাসনা স্থানের সাথে এই গীর্জার সম্ভবত যথেষ্ট মিল আছে; ভার্টোমানুস (Vertomannus) যে খ্রিস্টান ব্যবসায়ীদের কথা উল্লেখ করেন তারাই এই গীর্জাটি নির্মাণ করেন – পরে রোমান ক্যাথলিক মিশনারীজ এর সংস্কার বা পুনঃনির্মাণ করেন।' কিন্তু ড. টেলর প্রদত্ত এই সন ও মন্তব্য পূর্বে কথিত ইতিহাসের সাথে মিল নেই।

এই গীর্জাটি নির্মাণ করা হয় ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে – একাধিকবার এর সংস্কার করা হয়েছে; সর্বশেষ এর সংস্কার করা হয় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। এতে আছে সম-চতুর্ভূজ আকারের বড় একটা হল। নিভৃত গম্বুজাকৃতি ছাদবিশিষ্ট স্থান ব্যতীত বারান্দা ও স্তম্ভ পরিবেষ্টিত ঘুরানো স্থান এবং মহিলাদের জন্য বিশেষ স্থানসহ গীর্জার বড় হল ঘরের সব বৈশিষ্ট্য এতে আছে। পুরানো কাঠের ছাদ পরিবর্তন করে একেবারে নতুন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাদ দেয়া হয়েছে; তবে প্রাচীন গোলাকার ইটের কলাম বা স্তম্ভ এখনও আছে ছাদের ভার রক্ষার জন্য – সম্ভবত ওই কলাম বা স্তম্ভ নির্মাণ করা হয় ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে। পূর্বদিকের কোনায় আছে ফাঁপা মিনার, ভেতর দিক থেকে এর ছাদ বন্ধ করা আছে। প্রথমে এই মিনারগুলোতে মূর্তি খোদাই করা ছিল। পূর্বদিকের বহিরাংশে খ্রিস্টান ও মোগল উপাদানের সংমিশ্রণ আছে চমৎকারভাবে। চূঁড়া বিশিষ্ট ধনুকাকৃতি খিলানের প্রবেশপথ, এর দু'পাশে বাঁশির ছিদ্রের মতো স্তম্ভ, প্যানেল করা সম্মুখভাগ এবং প্রসারিত সমতলভাগে গভীর খোদাই – সবকিছুই শায়েস্তাখানি স্টাইলের স্থাপত্য শিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ছাদের ওপর ত্রিকোণী অংশসহ ছাদের প্রান্তস্থ দেয়ালের ত্রিকোণ অংশে আছে মেরী ও তাঁর শিশুর মূর্তি। আঁকাবাঁকা প্যাটার্নের যে স্তম্ভ আছে তা পুরোপুরি খ্রিস্টান বৈশিষ্ট্যের। ত্রিকোণা ছাদের প্রান্তে দেয়ালের ত্রিকোণা অংশ থেকে ধারণা করা যায় যে, প্রথমে বিল্ডিং-এর ছাদ ছিল তিন অংশে বিভক্ত; বর্তমানে ওই ছাদ একেবারে সমান।

৪৭. টঙ্গী ব্রিজ এই ব্রিজটি তৈরি করা হয় টঙ্গী নদীর ওপর, ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডে। স্থানটি ঢাকা থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। এই ব্রিজের নির্মাণ কাঠামো পাগলা পুলের মতো আকর্ষণীয় ও সুন্দর। কিন্তু এখন তা ধ্বংসপ্রাপ্ত – এ ব্রিজটিও নির্মাণ করেন মীর জুমলা।

AMARBOI.COM

জ. আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বিল্ডিং

৪৮. ঢাকা মিউজিয়াম : সেক্রেটারিয়েট রোডের উত্তর পার্শে সাবেক নিমতলী কুঠিতে অবস্থিত ঢাকা মিউজিয়াম। (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে একথা লেখা হয়। বর্তমানে শাহবাগ এলাকায় ঢাকা মিউজিয়াম অবস্থিত, এজন্য একটি সুন্দর ও সুপরিসর বিল্ডিং তৈরি করা হয়। পূর্বের মিউজিয়াম এলাকায় এখন অমর একুশে হল ও আনোয়ার পাশা ভবন অবস্থিত)।

ঢাকায় মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রথম নেওয়া হয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের শরৎকালে। এ সময় এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। ঢাকা মিউজিয়ামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট তারিখে। প্রথমে সেক্রেটারিয়েট ভবনের একটা কামরা (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ) মিউজিয়ামের জন্য সংগৃহীত বিভিন্ন জিনিস প্রদর্শনের জন্য বরাদ্দ করা হয়। নিমতলী কুঠির ওই বিল্ডিং ঢাকা মিউজিয়ামের জন্য পাওয়া যায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকা মিউজিয়ামের প্রথম কিউরেটর ছিলেন ড. এন.কে. ভট্টাশালী; তিনি একত্রিশ বছর ধরে এ দায়িত্বে থাকার সময় মিউজিয়ামকে গড়ে তোলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মারা যান। (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থখানি প্রকাশের সময় মিউজিয়ামের অবৈতনিক কিউরেটর ছিলেন এ গ্রন্থের লেখক ড. আহমদ হাসান দানী)। ওই সময়ে (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) ঢাকা মিউজিয়ামে প্রদর্শিত (নিমতলী কুঠিতে) বিভিন্ন জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মিউজিয়ামে প্রধানত হাতের কাজ, বস্ত্রশিল্প, ক্যালিওগ্রাফি, পেইন্টিং, আর্ট ও স্থাপত্য শিল্পের বিভিন্ন নমুনা প্রদর্শন করা হয়। প্রথম হলটি (নিমতলী কুঠির) সংরক্ষিত ছিল হাতের কাজ ও পেইন্টিং প্রদর্শনের জন্য। মহাভারত গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন দৃশ্য; ঈদ ও মহররম মিছিলের বিভিন্ন দৃশ্যের পেইন্টিং প্রদর্শিত ছিল – এসব পেইন্টিং সংগ্রহ করা হয় নবাব নসরত জঙ্গ বাহাদুর-এর সংগ্রহ থেকে। ঢাকার সমসাময়িক পেইন্টিং এখানে প্রদর্শন করা হয়। দ্বিতীয় হলটির নাম ছিল মুসলিম গ্যালারী। এই গ্যালারীতে প্রদর্শনের জন্য ছিল আরবি ও ফার্সি ভাষায় লিখিত কিছু শিলালিপি, সনদ, পবিত্র কুরআনের পাণ্ডুলিপি, ক্যালিওগ্রাফি, আরবি স্টাইলে লেখা বাংলা বই, ব্যবহারিক তৈজসপত্র ও অন্যান্য জিনিস। তৃতীয় বড় হলটি নির্ধারিত ছিল বৌদ্ধদের সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন - এর মধ্যে ছিল পাথর, ধাতু ও কাঠের নির্মিত অনুপম ভাস্কর্য। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর মঠ-এ প্রাপ্ত টেরোকোটার মূর্তি ছিল খুবই আকর্ষণীয়। কোনার দু'টো কামরা নির্ধারিত ছিল শিব ও সূর্য দেবতার মূর্তি প্রদর্শনের জন্য। তৃতীয় কোনার কামরায় প্রদর্শিত হতো বৈষ্ণবদের ভাস্কর্য। এছাড়া অনেক তামা, রূপা ও স্বর্ণমুদ্রা এবং তামার ফলক তালাবদ্ধ কামরায় রাখা আছে; কিউরেটরের পূর্বানুমতি নিয়ে তা দেখা যায়।

৪৯. বলধা মিউজিয়াম ও উদ্যান খ্রিস্টান সমাধিস্থানের বিপরীত দিকে ওয়ারীতে বলধা মিউজিয়াম অবস্থিত। ঢাকা জেলার এস্টেট বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় 'পারিবারিক মিউজিয়াম' হিসেবে এটা গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। ওই এস্টেটের নামেই এটা এখন বলধা মিউজিয়াম নামে পরিচিত। জমিদার তাঁর নিজের চেষ্টায় মিউজিয়ামের জন্য বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করেন এবং এর উন্নয়নে এস্টেট থেকে প্রাপ্ত আয় ব্যয় করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি একটা 'উইল' সম্পাদন করেন। মিউজিয়াম ও উদ্যানের যাবতীয় খরচ ওই এস্টেট-এর আয় থেকে নির্বাহের কথা তিনি 'উইল'-এ উল্লেখ করেন। মিউজিয়ামের বর্তমান (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে) সুপারিন্টেন্ডেন্টের নাম জনাব হান্নান।

মিউজিয়ামের জন্য কোনো পৃথক বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়নি। জমিদারের ব্যক্তিগত বাসস্থান বিল্ডিং-এর নিচতলার কামরাগুলো সংগৃহীত প্রাচীন নির্দশনগুলো প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়। কামরার সংখ্যা ছিল চার। গাড়ি বারান্দার বাইরে ছিল দু'টো বড় কড়াই। সমচতুর্ভূজ আকারের একটা বড় হলঘরে ছিল মুদ্রা, বস্ত্রশিল্প, ধাতু নির্মিত মূর্তি, গৃহসামগ্রী, খাট ও আর্টের বই। দ্বিতীয় কামরায় ছিল গ্রাম ও নগর জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মডেল, হাতির দাঁত ও রূপার জিনিসের ওপর কারুকাজ করা সামগ্রী। তৃতীয় কামরায় ছিল সবচেয়ে বেশি মূল্যবান সামগ্রী – অস্ত্রশস্ত্র। চতুর্থ কামরায় ছিল প্রবাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদ।[৫৭]

উদ্যানটিতে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা আছে। এটাকে উদ্যান না বলে দুষ্প্রাপ্য গাছপালার মিউজিয়াম বলা যায়। দু'টো বিরাট পরিবেষ্টনের মধ্যে এই উদ্যানটি অবস্থিত – একটার নাম 'কালচার' (Culture) এবং অপরটির নাম 'সাইবিলি ' (Cybele)। উদ্যান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় কিছুটা ত্রুটি আছে। উদ্যানে গিয়ে কেউ মনে করতে পারেন, তিনি বাংলার কোনো এক সুবিন্যস্ত বনের মধ্য দিয়ে হাঁটছেন। 'কালচার' এলাকাটি দু'ভাগে বিভক্ত – ক্ষুদ্র এলাকাটির নাম 'সাইকী' (Psyche)। এর একপাশে আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধার, এতে আছে 'ওয়াটার লিলি'। মাঝখানে আছে সমচতুর্ভূজ আকারের ঘাসযুক্ত একটি স্থান, এর তিনপাশে আছে বিভিন্ন ধরনের ফুলের গাছ। এখান থেকে বড় এলাকায় যাওয়া যায় – এ এলাকার মধ্যখানে আছে একটা গোলাকার পিরামিড। এই পিরামিডের প্রতিটি স্তরে আছে ক্যাকটাস। পিরামিডের মাথার ওপর আগে বিরাট একটা বাতি ছিল, যা পুনরায় স্থাপন করা প্রয়োজন। পিরামিডের উত্তর ও দক্ষিণে আছে গ্রীণহাউজ বা বৃক্ষচাষের জন্য কাচের ঘর এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে আছে নানা ধরনের গাছের চারা। পশ্চিম দিকে আছে ভিক্টোরিয়া-রেগিয়া (Victoria Regia) গাছ। ক্যাকটাসের জন্য একটা গোলাকার গ্রীণহাউজ সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে; সব উদ্ভিদ যেন পরস্পরের সাথে জড়াজড়ি করে আছে – মনে হয়, প্রশান্তির জন্য যেমন স্থান প্রয়োজন ছিল তা তারা খুঁজে পেয়েছে। আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলে দেখা যায় সমচতুর্ভূজ আকারের গ্রীণহাউজ – এর মাঝখানে ডিম্বাকৃতির মতো করে সব ধরনের উদ্ভিদ সাজানো আছে। একেবারে শেষদিকে আছে পর্বতে ওঠা-নামার মতো পথ। উদ্যানের মধ্যে অনেক স্থানে এ ধরনের পর্বতে ওঠা-নামার মতো পথ তৈরি করা হয়েছে, অনেক স্থানে তা এঁকেবেঁকে প্রসারিত হয়েছে।

'সাইবিলি' এলাকাটি তৈরি করা হয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। এর প্রবেশ পথ থেকে শুরু হয়েছে ম্যাগনোলিয়া গাছের সারি। ডানদিকে আছে ঘাসপূর্ণ সমচতুর্ভূজ আকারের একটি স্থান - এর এক স্থানে জমিদারের দেহ দাহ করা হয়। বাঁদিকে আছে গাছের সারি। মাঝখানে আছে একটা সুইমিং পুল, যে কোনো দিক থেকেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামা যায়। এর বিপরীতদিকে আছে মিউজিয়াম ও উদ্যান প্রতিষ্ঠাতার দ্বিতল বাড়ি; এর নাম 'আনন্দ'। এই বিল্ডিং-এর কাছে আছে ভিন্ন জাতের 'মিমোসা' (Mimosa) গাছ; আরো একটু দূরে আছে 'সেঞ্চুরি প্লান্ট', যে গাছে বাংলায় ষোল বছর পর পর ফুল ফোটে। জলাধারের পর সর্বশেষ সমচতুর্ভূজ এলাকায় রয়েছে জমিদারের খুন হওয়া পুত্রের স্মৃতিস্তম্ভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫০. আহসান মনজিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে, ওয়াইজ ঘাটের কাছে, অবস্থিত আহসান মনজিল। এ স্থানেই আগে ছিল ফরাসীদের ফ্যাক্টরি। খাজা আলিমুল্লাহ ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে এই ফ্যাক্টরি ক্রয় করেন – তিনি ছিলেন ঢাকার নবাবের প্রপিতামহ। এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন নবাব স্যার আবদুল গনি, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি তাঁর পুত্র নবাব স্যার আহসান উল্লাহ বাহাদুরের নামে ওই প্রাসাদের নাম রাখেন আহসান মনজিল। বর্তমানে যে বিল্ডিংটি আছে তা সংস্কার করা; ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবল ঘূর্ণীঝড়ে প্রাসাদটি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং পরে তা সংস্কার করা হয়। পুরাতন ও নতুন আহসান মনজিলের রূপার কারুকাজপূর্ণ মডেল প্রাসাদের অভ্যন্তরে রক্ষিত আছে।

এই প্রাসাদেই নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুরের অতিথি হিসেবে লর্ড কার্জন অবস্থান করেন; বঙ্গভঙ্গের পর রাজধানী হিসেবে ঢাকার উত্থান তিনি এই প্রাসাদে বসেই প্রত্যক্ষ করেন। প্রথম বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এখানে বসেই নেওয়া হয়। এই প্রাসাদে যে আদর্শের সূত্রপাত ঘটে তা পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

আহসান মনজিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো বৃহৎ প্রাসাদ। চতুর্দিকে বাড়ি দিয়ে ঘেরা প্রাঙ্গনে উঁচু ভিত-এর ওপর দোতলা বিল্ডিং এবং এর ওপর শোভিত আছে একটা গম্বুজ – এই গম্বুজই শহরে সবচেয়ে উঁচু স্থানে আছে। বিল্ডিংটির সামনের দিক প্রশস্ত ও নদীর দিকে দেখতে যেমন জাঁকালো, তেমনি সুদৃশ্য। নদীর দিক থেকে আশপাশের ছোট ছোট বাড়ির মধ্যে বিল্ডিংটিকে আরো স্পষ্টভাবে দেখা যায়। নদীর দিক থেকে সিঁড়ি দিয়ে সরাসরি দোতলায় যাওয়া যায় – দোতলায় প্রবেশ করার পর দেখা যায় তিনটি ধুনকাকৃতির খিলানবিশিষ্ট বিরাট প্রবেশপথ, মূল দেয়াল থেকে তা সামনের দিকে কিছুটা প্রলম্বিত। দেয়ালের সাথে লাগানো বাঁশির মতো ছিদ্র আয়তকার স্তম্ভ ও কার্নিসে মোল্ডিং দ্বারা সুশোভিত, আর ওপরে আছে সামিয়ানা। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে আছে একই রকমের উদ্ভাসিত জাঁকজমকপূর্ণ নির্মাণ। মূল দেয়ালের পাশ থেকে গম্বুজ ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে; গম্বুজ স্থাপিত আছে অষ্টকোণী ড্রামের ওপর। নিচে আছে সমচতুর্ভূজ আকারের একটি কামরা – দর্শনার্থীদের বসার স্থান হিসেবে এটা ব্যবহৃত হয়। এটা হলো বিল্ডিং-এর মূল অংশ – পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বিল্ডিং-এর অংশ সমান সমান। পূর্ব অংশে আছে একটা ড্রয়িংরুম, একটা লাইব্রেরি ও তিনটি অতিথি কামরা; পশ্চিম অংশে আছে একটা বলরুম ও অন্যান্য আবাসিক কামরা। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আছে প্রসারিত ঝুলন্ত বারান্দাসহ সমতল ছাদ যা মাঝখানে প্রলম্বিত। পেছনের দিককার বারান্দার মূল অংশ রূপান্তরিত করা হয়েছে একটি কামরায় – এই কামরা থেকে নিচতলায় যাওয়ার জন্য সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে, নিচতলায় ঠিক একই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম একটি কামরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানেই পশ্চিমদিকে আছে চমৎকার দরবার হল এবং পূর্বদিকে আছে ডাইনিং হল। উপরতলার সমতল ছাদ এখানে বারান্দা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বারান্দার সামনে প্রসারিত আছে বাগান। বিল্ডিং-এর সম্মুখভাগে অর্থাৎ নদীর দিকে ফোয়ারা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়।

নবাব অব ঢাকা এস্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর ম্যানেজারের অনুমতিক্রমে দর্শনার্থীরা আহসান মনজিলে সংগ্রহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রাচীন সামগ্রী দেখতে পারেন। (বর্তমানে আহসান মনজিল ঢাকা মিউজিয়ামের আওতাধীন)। এসব সামগ্রীর মধ্যে আছে পেইন্টিং, আলোকচিত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্ম, সুন্দর কাঠের কাজের ড্রেসিং টেবিল, ইটালিয়ান রাউন্ড টেবিল, হোসেনী দালান ও আহসান মনজিলের রূপার কারুকাজ করা মডেল, সিলেটে তৈরি হাতির দাঁতের সুন্দর মাদুর, পশুর মাথা ও কঙ্কাল। বিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশের মুসলমানদের পুনর্জাগরণের সাথে আহসান মনজিলের সংশ্লিষ্টতা ছিল গভীর। মুসলমানদের স্বার্থে এই প্রাসাদের ভূমিকা ছিল এবং জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে তা সংরক্ষণের যোগ্য।

৫১. নর্থব্রুক হল : বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বাংলাবাজারে নর্থব্রুক হল অবস্থিত – ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ যাওয়ার পুরানো রাস্তা নর্থব্রুক হল রোডের পাশে অবস্থিত নর্থব্রুক হল। ভারতের গভর্নর জেনারেল (১৮৭২-১৮৭৬) লর্ড নর্থব্রুকের নামানুসারে হলটির নাম রাখা হয় নর্থব্রুক হল। তিনি ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় আসেন। প্রথমে এটা ছিল টাউন হল, পরে এটাকে পাবলিক লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করা হয়। পরে হলের দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটা ক্লাব হাউজ সংযুক্ত করা হয় এবং তার নাম রাখা হয় জনসন হল। বর্তমান (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে একথা বলা হয়) নর্থব্রুক হলে টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপিত আছে এবং লাইব্রেরির সব বই ছোট জনসন হলে স্থানান্তরিত করা হয়। জনসন হলে একটা সুন্দর বিলিয়ার্ড টেবিল আছে। (পরে টেলিগ্রাফ অফিস সরিয়ে নেওয়া হয়)।

মোগল স্থাপত্য শিল্পের স্টাইল পুনর্জীবিত করার স্থানীয় রাজমিস্ত্রীদের একটা অনুপম প্রয়াস ছিল এই নর্থব্রুক হল – কিন্তু এর ফল হয় সম্পূর্ণ আলাদা। একে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের একটা বিল্ডিং। তবে মুসলিম স্থাপত্যের কিছু উপাদান এতে আছে। অর্ধ-বৃত্তাকার ঘোড়ার পায়ের নালের মতো খিলান, উত্তরদিকে প্রসারিত ফাঁকা স্থান দিয়ে প্রবেশ পথ, উত্তরদিকে বাঁকা অংশে চারটি অষ্টকোণী মিনার, শোভামণ্ডিত সম্মুখভাগ এবং তার ওপর উচ্চ চূঁড়া মুসলিম বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে দেয়। প্রবেশপথের ফাঁকা স্থানে খিলানের বহিরাংশে ত্রিপত্রাকৃতির নকশা ও দুই প্যানেলের মাঝে ফুলের নকশা এবং পেঁচানো বাঁশির মতো ছিদ্রযুক্ত দেয়ালের সাথে লাগানো আয়তাকার স্তম্ভ – সবকিছুই অলঙ্কৃত করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দরভাবে। প্রবেশপথটি প্রায় সমচতুর্ভূজ আকারের হলঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে – এ হলঘরের উত্তরদিকে বিচ্ছিন্ন করা আছে উত্তরদিকের সীমানা সংকুচিত করার জন্য। এ স্থানেই দেখা যায় চারটি মিনার। হলের দক্ষিণদিকে আছে সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরা – ওইসব কামরার সামনে আছে ঝুলন্ত বারান্দা এবং বারান্দার সামনের আছে একটা প্রবেশপথের বারান্দা। হলের ছাদের চেয়ে অতিরিক্ত এসব ঘরের ছাদ নিচু। নদীর দিক থেকে স্তরবিশিষ্ট ছাদ, উঁচু চূঁড়া এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত সম্মুখভাগের দৃশ্য খুবই সুন্দর। শহরের দিক থেকে বিল্ডিংটি দেখতে জাঁকজমকপূর্ণ ও অত্যুৎকৃষ্ট। লাল রঙের ইটের দেয়াল থাকায় আশপাশের এলাকার মধ্যে বিল্ডিংটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

৫২. কার্জন হল : প্রথম বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) ফলে যে সব বিল্ডিং নির্মিত হয়, তার মধ্যে কার্জন হল একটি। সব বিল্ডিং-এর মধ্যে একটা একক বৈশিষ্ট্য ছিল, ইট ও প্লাস্টারের মধ্যদিয়ে একটা বৈশিষ্ট্যগত জাঁকজমক প্রকাশের প্রয়াস ছিল। এসব বিল্ডিং নির্মিত হয় ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশক্রমে এবং সে কারণে এতে এ্যাংগলো ইন্ডিয়ান শিল্পকলার প্রভাব ছিল প্রধান। তবে এরমধ্যে মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের সংমিশ্রণ ছিল – আর মুসলিম স্থাপত্যশিল্প জনপ্রিয় করে তোলে মোগলরা। কিন্তু এসব বিল্ডিং-এর সৌন্দর্য ও কাঠামোর লঘুতা সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। প্রতিটি বিল্ডিং-এর বৈশিষ্ট্য হলো তা বিরাট আকারের এবং এর সাথে সুসমঞ্জসভাবে বিভিন্ন অংশ ও কাঠামো সংযুক্ত করা হয়েছে আকর্ষণীয় ও আবেদন সৃষ্টি করার জন্য।

এসব বিল্ডিং-এর মধ্যে কার্জন হল সবচেয়ে পুরানো। লর্ড কার্জন নিজেই এর ভিত্তি স্থাপন করেন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি। এ সময় তিনি তাঁর রাজনৈতিক মিশনে ঢাকা সফর করেন। একটা ঘেরা এলাকার মধ্যে, গভর্নমেন্ট হাউজ রোডে ঢাকা হাইকোর্টের কাছেই এটা অবস্থিত। ওই একই এলাকার মধ্যে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখার অনেক বিল্ডিং গড়ে উঠেছে। কার্জন হল একটা দ্বিতল বিল্ডিং, এটা নির্মিত হয় লাল রঙ-এর ইট দিয়ে। এতে একটা প্রধান হল সহ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অনেক কামরা আছে। এর চতুর্দিকে একটা বারান্দা আছে। বিল্ডিংটির সম্মুখভাগ উত্তরদিকে এবং এর সম্মুখভাগের দৃশ্য যেমন চমৎকার তেমনি আড়ম্বরপূর্ণ। এর প্রধান অংশ সামনের দিকে অর্ধ-অষ্টকোণী আকারে স্পষ্টভাবে প্রলম্বিত এবং এর উঁচু অংশের নিচে এবং জানালার ওপরে আছে ঘোড়ার পায়ের নালের মতো আকারবিশিষ্ট খিলানের প্রশস্ত প্রবেশপথ। চূঁড়ার উপাদানে আছে আকর্ষণীয় ইটের কাজ যা প্যানেলের সারি দ্বারা সুসজ্জিত, ওই প্যানেল দেয়াল থেকে উদগত অবলম্বনের সমতল এবং শীর্ষে আছে সামিয়ানা। কোনাগুলোতে আছে মিনার, আর মিনারের ওপর আছে ছত্রী। বারান্দায় আছে খোলা ধনুকাকৃতি খিলানের সারির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবরণী। নিচতলায় এই ধনুকাকৃতির খিলান ঘোড়ার পায়ের নালের মতো এবং দ্বিতীয় তলায় তা চূঁড়াযুক্ত। দু'পাশের কামরাগুলোর প্রান্ত বিভিন্ন আকারের – প্রত্যেক প্রান্তে আছে দু'টো করে কামরা এবং তা উত্তর ও দক্ষিণে সাজানো এবং প্রতিটি কোনায় আছে মিনার। কার্জন হলের অভ্যন্তরভাগে আছে একটা সমচতুর্ভূজ আকারের প্রশস্ত হল – হলের উভয়পার্শে আছে তিনতলা বিশিষ্ট গ্যালারী। এই গ্যালারীগুলোতে বড় বড় খিলানের অবলম্বন আছে এবং আরো আছে সুন্দর আবরণী। বিল্ডিংটি যথার্থভাবে সৌষ্ঠবপূর্ণ।

প্রথমে কার্জন হলকে তৈরি করা হয় টাউন হল হিসেবে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর থেকে এর বিভিন্ন কামরায় ঢাকা কলেজের স্থান সংকুলান করা হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে কার্জন হলকে ব্যবহার করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখা হিসেবে, প্রধান হল ব্যবহৃত হয় পরীক্ষার হল ও সমাবর্তন হল হিসেবে।

৫৩. হাউকোর্ট বিল্ডিং : কার্জন হল নির্মাণের পর নির্মাণ করা হয় হাইকোর্ট বিল্ডিং। রমনা রেস কোর্সের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এবং একটা প্রশস্ত এলাকার মধ্যখানে এই বিল্ডিং অবস্থিত – এই বিল্ডিং-এ প্রবেশের জন্য রয়েছে একটা উঁচু ধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। প্রথমে এটাকে গভর্নমেন্ট হাউজ হিসেবে তৈরি করা হয় এবং এ কারণে এই বিল্ডিং-এর সামনের রাস্তা গভর্নমেন্ট হাউজ রোড নামে পরিচিত হয়। কিন্তু বিল্ডিং-এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ভারত সরকারের কনসাল্টিং আর্কিটেক্ট এটাকে গভর্নরের বাসস্থানের জন্য যথোপযুক্ত মনে করেন না। দীর্ঘদিন যাবত এই বিল্ডিংটি একটা অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পরে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে দিয়ে দেয়া হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর বিল্ডিংটি হাইকোর্টকে দিয়ে দেয়া হয়।

প্রশস্ত কম হলেও বিল্ডিংটির স্টাইল রেঁনেসা যুগের বিল্ডিং-এর মতো। যাহোক, এর সম্মুখভাগ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এর নিচে আছে সুপরিসর বারান্দা এবং ওপরে আছে করিনথিয়ান (গ্রীসের অন্তর্গত করিনথ নামক নগর সম্বন্ধীয়) কলামের ওপর ত্রিকোণাকার কারুকাজ করা অংশ। বিল্ডিংটির ওপরে আছে একটা উঁচু চূঁড়া যা গোলাকার স্তম্ভ ও কলামের ওপর স্থাপিত। এর তিনটি অংশ অর্থাৎ বারান্দা, ত্রিকোণাকার কারুকাজ অংশ ও চূঁড়া সমান স্তরে এবং যথার্থ সমতা ও উভয় অংশে সমানভাবে নির্মিত। এ তিন অংশের নির্মাণ কৌশল সুগম্ভীর ভাবপূর্ণ - এর নির্মাণ বৈশিষ্ট্যে আছে ভিন্নতা ও পার্থক্য। এ বিল্ডিং নির্মাণে স্থাপত্য শিল্পের উপাদানের ঘাটতি নেই – এসব উপাদান নেওয়া হয়েছে প্রাচীন বিল্ডিং থেকে যা সাধারণত রেঁনেসা যুগের বিল্ডিং-এ পাওয়া যায়। এসব উপাদান ও কৌশল সুন্দরভাবে উপস্থাপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হয়েছে এই বিল্ডিং-এর নির্মাণ কৌশলে। কিন্তু অভ্যন্তরভাগের প্রশস্ত কম। বিল্ডিংটি ইউরোপীয় রুচি ও প্রবণতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

৫৪. ফজলুল হক মুসলিম হল : এ হলটি অবস্থিত কার্জন হলের কাছে কলেজ রোডে এবং এটা নির্মাণ করা হয় প্রথম বঙ্গভঙ্গের সময়। আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল যখন কার্জন হল এলাকায় ছিল তখন প্রথমে এটা ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে হলটি দিয়ে দেয়া হয় ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে। ১৯৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দে হলটি মিলিটারী ক্যাম্পের জন্য রিকুইজিশন করা হয়। ১৯৪২ সালের জুলাই মাস থেকে হলটির নামকরণ করা হয় ফজলুল হক মুসলিম হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো হলের মধ্যে এটা একটি।

হলটি প্রথমে ছিল দ্বিতল বিশিষ্ট; এতে ছিল আবাসিক কামরার চারটি সারি। এই কামরাগুলো ছিল চতুর্ভূজ আকারের আঙ্গিনার চারপাশে – ওই আঙ্গিনায় ছিল একটা উদ্যান। সম্প্রতি (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে একথা বলা হয়) হলটিতে তৃতীয় তলা নির্মাণ করা হয়। প্রথমে হলটিতে ছিল একশ' পঞ্চাশ কামরা, পরে আরো পঁচাত্তরটি কামরা সংযুক্ত করা হয়। দক্ষিণদিকে গোলাকার কর্নারের মধ্যদিয়ে এর প্রধান ধনুকাকৃতির প্রবেশপথ ছিল। প্রবেশপথটি খুবই সাধারণ। তবে প্রবেশপথের সাথে অফিস ও হাউজ টিউটরের বাসার কামরাগুলোর ওপর আছে সুদৃশ্য গম্বুজ। বিভিন্ন কোনায় এ ধরনের ছ'টি গম্বুজ আছে – দক্ষিণদিকের কর্নারগুলোতে দুটো করে এবং উত্তরদিকের কর্নারগুলোতে একটা করে। দক্ষিণদিকের গম্বুজগুলোতে ধনুকাকৃতির খিলান হলো ঘোড়ার পায়ের নালের মতো। কিন্তু বারান্দা ও আঙ্গিনার মধ্যেকার আবরণের জন্য নির্মিত অভ্যন্তরভাগের ধনুকাকৃতি খিলানের সারি চতুষ্কোণবিশিষ্ট সরু টাইপের। স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে বিল্ডিংটিতে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

৫৫. ঢাকা হল মাঝখানের একটা পুকুর ঢাকা হল ও ফজলুল হক মুসলিম হলকে পৃথক করে দিয়েছে। ঢাকা হল নির্মাণ করা হয় ফজলুল হক মুসলিম হল নির্মাণের সময়ে। প্রথমে এটা ছিল ঢাকা কলেজের ছাত্রদের হোস্টেল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রদের জন্য গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা কম হওয়ায় এর একটা অংশ মুসলমান ছাত্রদের থাকার জন্য দিয়ে দেয়া হয়। এর স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন ফজলুল হক মুসলিম হলের মতোই।

৫৬. ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং : প্রথমে এই বিল্ডিং-এ ছিল পূর্ব বাংলা ও আসাম সরকারের সচিবালয়। কিন্তু প্রথম বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পর ওই বিল্ডিংটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই বিল্ডিং-এর পশ্চিম অংশে প্রথমে সলিমুল্লাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম হল ও জগন্নাথ হলের ছাত্রদের এবং পরে ফজলুল হক মুসলিম হলের ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বিল্ডিং-এর পশ্চিম অংশ সামরিক বাহিনী দখল করে আহত ব্যক্তিদের থাকা ও চিকিৎসার জন্য। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ওই অংশটি স্থায়ীভাবে দখল করে নেয় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন থাকে শুধুমাত্র পূর্বদিকের অংশটি। শোনা যায় যে, অন্যকোনো স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর করা হবে। (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে একথা বলা হয়। ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে বর্তমান কলাভবনে তা স্থানান্তর হয়)।

বিল্ডিংটি অবস্থিত সেক্রেটারিয়েট রোডে। প্রথমে এই বিল্ডিং-এ সচিবালয় ছিল এবং সে কারণেই ওই রোডটি সেক্রেটারিয়েট রোড নামে পরিচিত হয়। দু'টো বিরাট প্রবেশপথ দিয়ে বিল্ডিং এলাকায় যাওয়া যায় – পূর্ব দিকের প্রবেশপথ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পশ্চিমদিকের প্রবেশপথ দিয়ে মেডিকেল কলেজে। মূল বিল্ডিংটি দ্বিতল বিশিষ্ট – পূর্ব-পশ্চিম বরাবর লম্বা; দু'প্রান্ত থেকে আরো অতিরিক্ত শাখা বিল্ডিং সংযুক্ত আছে। দক্ষিণদিকে তৃতীয় ব্লক সংযুক্ত করা হয় – এই তৃতীয় ব্লকটি হলো প্রধান হলের পেছন দিকে। সম্মুখভাগের প্রসারিত বারান্দা থেকে প্রধান হলে প্রবেশের পথ আছে। হলের দু'পাশে করিডোর আছে এবং করিডোরের দু'পাশে আছে কামরা – কামরার বাইরে আছে বারান্দা। পূর্ব ও পশ্চিমদিকের অংশের প্রান্তে দু'সারি কামরার মাঝে একই ধরনের করিডোর আছে, এছাড়াও পাশে আছে অতিরিক্ত বারান্দা। প্রধান হলের ওপরে আছে চূঁড়াবিশিষ্ট একটা গম্বুজ; গম্বুজটি স্থাপিত আছে একটা বৃত্তাকার ড্রামের ওপর। ড্রামের সাথে আছে দুই জানালার মধ্যবর্তী স্থানে স্তম্ভ। হলের সামনে দেয়ালের সাথে আছে সমতল ছাদসহ চতুষ্কোণী টাওয়ার। এ ধরনের গম্বুজ পূর্ব ও পশ্চিম অংশে আছে। করিডোরে অধিক আলোর ব্যবস্থার জন্য উপযোগী অতিরিক্ত চতুষ্কোণী টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে প্রধান হলের উভয় পার্শে। বারান্দার সাথে লম্বা সমতল খিলান দ্বারা উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা বাইরের দিক থেকে সুন্দর দেখায়। দেয়াল সংলগ্ন প্রলম্বিত সমান্তরাল আলম্ব কার্নিস থেকে পৃথক দেখায়। গম্বুজ প্রায় সমান্তরাল, এর ড্রামের সাথে বাইরের দিকে অতিরিক্তভাবে সংযুক্ত আছে প্রলম্বিত আলম্ব। বিল্ডিংটি আরো উঁচু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এর বৈচিত্র্যহীনতা ও সমতল বৈশিষ্ট্য কিছুটা দৃষ্টিকটু। স্থানীয় স্থাপত্যের পুরনো অবিমিশ্র বৈশিষ্ট্যকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু তার ফলে সমতা ও অনুপাত বিধান করা ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

৫৭. সলিমুল্লাহ মুসলিম হল : এই বিল্ডিং-এর ভিত্তি স্থাপন করেন তৎকালীন বাংলার গভর্নর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ আগস্ট তারিখে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন থেকে এই মুসলিম হল বাস্তবে বিদ্যমান ছিলো। প্রথমে এ হল ছিল ইউনিভার্সিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিল্ডিং-এর পশ্চিম অংশে। বর্তমান বিল্ডিং-এর নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর তা বর্তমান বিল্ডিং-এ স্থানান্তরিত হয়।

পূর্বে যে সব বিল্ডিং-এর কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেসব থেকে এই বিল্ডিং-এর স্থাপত্যের স্টাইল ভিন্ন ধরনের। সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী এর নির্মাণ পদ্ধতি অন্যান্য হলের মতোই – চতুষ্কোণী আঙ্গিনা, সুন্দরভাবে সাজানো উদ্যান-এর চতুর্দিকে চার সারি বিশিষ্ট দ্বিতল বিল্ডিং-এ আবাসিক কামরা। এসব কামরার সামনে আছে লম্বা বারান্দা এবং তা প্রাঙ্গণের দিকে প্রসারিত। এ বারান্দার মাঝামাঝি স্থানে আছে ঢাকা পথ যা উত্তর ও দক্ষিণ অংশকে সংযুক্ত করেছে। প্রধান প্রবেশপথ দক্ষিণদিকে, মাঝখানে – দু'টো চতুষ্কোণ টাওয়ারের মধ্যদিয়ে এই প্রবেশপথ, টাওয়ারের ওপরে আছে হলুদ রঙ-এর গম্বুজ। এই প্রবেশপথ দিয়ে ঢোকার পর বারান্দা পাওয়া যায়, বারান্দার পেছনে আছে এ্যাসেম্বলি হল। দক্ষিণদিকের এই ব্যবস্থাপনার সাথে সঙ্গতি রেখে উত্তরদিকে নিচতলায় করা হয়েছে কমন রুম ও ডাইনিং হল এবং উপরতলায় নামাজের হলঘর। দক্ষিণদিকের সম্মুখভাগে আছে লম্বা বারান্দা এবং আরো আছে অতিরিক্ত গাড়ি বারান্দা। চারটি কর্নারকে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর করার জন্য চতুষ্কোণ নির্মাণ কাঠামো করা হয়েছে, এসব কাঠামোর ওপরে আছে মুকুটের মতো করে সাজানো তিনটি গম্বুজ। ধনুকাকৃতির খিলান সরু; কিন্তু জানালায় আছে সমান্তরাল চৌকাঠ। এই নির্মাণ কৌশল অন্যান্য হল বিল্ডিং-এর চেয়ে বেশ পদ্ধতিগতভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে; বিল্ডিং-এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে আছে সুন্দর মিল। দক্ষিণদিকের সম্মুখভাগ সত্যিই আকর্ষণীয়। স্থাপত্যশিল্পের উপাদানে কোনো ঘাটতি নেই, তবে পুরনো অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

৫৮. ঢাকায় ব্যাপ্টিস্ট মিশন ঢাকায় ব্যাপ্টিস্ট মিশনের ইতিহাস সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পথিকৃত মিশনারী লিওনার্ড ও তাঁর উত্তরসূরীদের হেডকোয়ার্টার ছিল ছোট কাটরায়, প্রায় ৬০ বছর ধরে। পরে একটা ভাড়া বাড়িতে এই মিশনারীর কাজ চলে অনেক বছর – বাড়িটা ছিল ওয়াইজহাউজ ও সাবেক টেলিগ্রাফ অফিসের মাঝখানে নদীর ধারে। বাড়িটা এখন আছে তবে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত। কাটরা হাউজ ত্যাগ করে মি. বিওন (Mr. Bion) এই বাড়িতে বসবাস করতেন; সম্ভবত কাটরা হাউজের দায়িত্ব তিনি মি. রবার্ট রবিনসনের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে আসেন। পরে ওয়াইজ ঘাট রোডের একটা বাড়ি (এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত) ভাড়া করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর আশি ও নব্বই-এর দশকে সদরঘাট রোডের কর্নারে (রিজেন্টস পার্ক হলের বিপরীতে) একটা বাড়িতে (এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত) এই মিশনের কার্যালয় ছিল। মি.টি.এইচ বার্নেট (T.H. Barnett) বাংলাবাজারে বর্তমান বিল্ডিং-এর নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান করেন। এই বিল্ডিং-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেপ্টেম্বর এবং এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। মি. রাইট হে (Mr. Wright Hay) ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাঁর নিজের দেশের বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং একটা গসপেল হল (Gospel Hall) নির্মাণ করেন – এর মেঝে মাটির, দেয়াল মাদুরের এবং ছাদ খড়-তালপাতা দিয়ে তৈরি। বাংলাবাজারে ওই বিল্ডিং এলাকার পশ্চিমদিকে চৌমাথার দিকে মুখ করে এই গসপেল হল তৈরি করা হয়। মি. উইলিয়াম কেরি (Mr. William Carey) ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের রিজেন্ট'স পার্ক চ্যাপেলের সদস্যদের বদান্যতা গ্রহণ করেন এবং একটা নতুন ও সুপ্রশস্ত বিল্ডিং নির্মাণের ব্যয় তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। তাদের থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে মি. সাটন পেজ (Mr. Sutton Page) বর্তমান রিজেন্টস পার্ক হল নির্মাণ করতে সমর্থ হন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এই হল উন্মুক্ত করা হয় এবং তখন থেকে এই হলে ছাত্র, খ্রিস্টের বাণী প্রচারক ও রোববার স্কুলের কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই মিশন এলাকার পূর্ব অংশে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে একটা বিল্ডিং নির্মাণের উদ্দেশ্যে মাটির মধ্যে ভিত্তিদণ্ড প্রোথিত করা হয় – ওই বিল্ডিং এখন ছাত্রদের হোস্টেল ও মিশন তত্ত্বাবধায়কের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ঢাকায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দেই পাঁচটি স্কুল খোলা হয়; অতিরিক্ত একটা স্কুল খোলা হয় শুধুমাত্র ফার্সি ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা পনের-তে উন্নীত হয়; শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল তেরশ'। সরকারি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এসব স্কুলেই শিক্ষা দেয়া হতো।[৫৮]

৫৯. আর্মেনিয়ান চার্চ আর্মেনিটোলা ও মিটফোর্ড হাসপাতালের মধ্যে চার্চ রোডে আর্মেনিয়ান চার্চ অবস্থিত। আর্মেনিয়ানদের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব পালনের বিবরণ দেয়া হলো – ওই উৎসব ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন লে. কর্নেল সি জে সি ডেভিডসন (C.J.C. Davidson)। তিনি লেখেন 'আমি প্রায় চৌদ্দ ফুট চওড়া একটা বারান্দা দিয়ে চার্চের মধ্যে প্রবেশ করি। বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরভাগের মেঝে তিনভাগে বিভক্ত – একটা অংশ রেলিং বা গরাদ দিয়ে ঘেরা, একটা অংশে বেদী এবং মূল অংশে ভাঁজ করা দু'টো খোলা দরজা; একটা দরজার পাশে গরাদ দেয়া অংশ, যা মহিলা ও শিশুদের জন্য সংরক্ষিত। এই অংশের ওপরে আছে গ্যালারী। দেয়াল থেকে প্রায় চার ফুট দূরত্বে আছে অর্ধ-বৃত্তাকার বেদী। এটা কাঠ দিয়ে তৈরি বলে মনে হয়; এর উচ্চতা প্রায় দশ ফুট, ওপরে ওঠার জন্য সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ির বিভিন্ন স্তরে তিনফুট লম্বাবিশিষ্ট চব্বিশটি মোমবাতি রাখা যায়; এছাড়া ওই সিঁড়িতে আছে উজ্জ্বল ধাতুর বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ক্রস বা ক্রস। দিনটি ছিল উজ্জ্বল রৌদ্রভরা সকাল, তবুও মোমবাতিগুলো জ্বলছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বেদীর সামনে কিছুটা বাঁদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত যাজক; তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর, তাঁর চোখে ছিল চশমা। তাঁর মাথার চুল মোটামুটি সোয়া দুই ইঞ্চি ব্যাসার্ধে কামানো ছিল। তাঁর পরিধেয় পোশাক ছিল পুরোপুরি অলঙ্কারপূর্ণ, রূপার পাত দ্বারা এমব্রয়ডারি করা; পোশাকের নিচের অংশে ছিল একই রকম অলঙ্কারপূর্ণ কারুকাজ। তাঁর পরিধানের বহিরাবরণ ছিল একটা 'খিন-খাব' (Khin-khwab) (বা সূক্ষ্মভাবে বোনা সোনালী পোশাক) আলখিল্লা বা ঢিলা পোশাক – এর নিচের অংশে চার ইঞ্চি চওড়া এমব্রয়ডারি করা। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা ছোট পড়ার টেবিলের ওপর; স্থানটি ছিল চার্চের মূল অংশের কাছাকাছি। তাঁর সম্মুখে রাখা ছিল পবিত্র পানির পাত্র।

'যাজক যে বাণী পড়লেন তা অত্যন্ত দ্রুত পড়লেন বলে মনে হলো। বাণী পড়ার সময় তিনি বাম হাতে পাতলা রূপা বা টিনের ফলক ধরে ছিলেন। আমার মনে হয়, ওই ফলকের মাঝখানে একটা ছবি ছিল। মাঝে মাঝে ওই ফলকটি উঁচু করা হচ্ছিল। বাণী পড়ার সময় চার/পাঁচ জন যুবক তাঁর সাথে যোগ দিচ্ছিলো মাঝে মাঝে; তাদের পরনে ছিল দারুচিনির মতো রঙ-এর সিল্কের লম্বা কোট। তাদের ঘাড়ের কাছে ছিল টকটকে লাল রঙ-এর সিল্কের অলঙ্কারপূর্ণ কাপড় – তাদের পিঠের মাঝখানে ছিল একই রকম টকটকে লাল রঙ-এর সিল্কের ক্রস বা ক্রস। তারা মাঝেমাঝে নাকিসুরে 'আমিন', 'আমিন' কথার প্রতিধ্বনি করছিল – যে স্বরে বাণী পাঠ করা হচ্ছিলো তা ওই নাকিসুর থেকে আলাদা। প্রতিটি টেবিলের পাশে একটি করে ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল – তাদের হাতে ছিল একটা করে রড এবং রডের এক প্রান্তে ছিল একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। একটা টেবিলকে ঘিরে কমপক্ষে বারোটি করে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল...।

'বাণী পাঠ শেষ হওয়ার পর যাজক টেবিল থেকে নেমে বেদীর দিকে হেঁটে যান এবং তাঁর হাতে যে রূপার বা টিনের ফলকটি ছিল তা বেদীর ওপর রাখেন। অতঃপর বেদী থেকে নেমে এসে তিনি গ্রন্থখানি পুনরায় ফিরিয়ে আনেন এবং তা এমন একটি চৌকির ওপর রাখেন যা বিভিন্ন স্থানে সরানো যায় – ওই চৌকি ঢাকা ছিল গাঢ় টকটকে লাল রঙ-এর কাপড় দিয়ে। ওই চৌকির ওপর তিনি আরো একটা ফলক রাখেন। গীর্জার মূল স্থান ও বেদীর মধ্যে যে গরাদটি ছিল, সেই স্থানে তিনি ওই চৌকিটা রাখেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে জমায়েত হওয়া পুরুষ লোকদের একাংশ গরাদের দিকে এগিয়ে যায় এবং একে একে গ্রন্থের ওপর রক্ষিত রূপার ক্রস বা ক্রস এবং একইভাবে ফলকটি চুম্বন করে। এরপর সেখানে শিশুদের নিয়ে আসা হয়। ওই অনুষ্ঠানের সময় শিশি, সাধারণ বীয়ারের বোতল, রূপার কাপ ইত্যাদি টেবিলের কাছে কর্তব্যরত একজন সহকারীর কাছে দেয়া হয়। তিনি ওইসব পাত্রে পবিত্র পানি ভরে দিয়ে পাত্রের মালিকদের কাছে তা ফেরৎ দেন।

'ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আমি চার্চ থেকে বেরিয়ে আসি। বাইরে এসে দেখি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের একটা দরজা দিয়ে যাজক বারান্দায় এসেছেন। তিনি একাধিক সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে একটা গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করছেন গভীর মনোনিবেশ সহকারে। ওই সব সমাধির ওপর ঢাকনি দেয়া আছে আর্মেনীয় রীতি অনুযায়ী। তৎপর আমি লক্ষ্য করি যে, প্রতিটি সমাধির মেঝের এবং সমাধির ওপরকার পাথরের ওপরে চায়ের চামচের চেয়ে ছোট একটা ফাঁকা স্থানে কাঠের ছাই বা ভস্ম ও অঙ্গার দিয়ে ভর্তি করা আছে।'[৫৯]

৬০. এ্যাংগলিক্যান চার্চ : ভিক্টোরিয়া পার্ক (বাহাদুর শাহ পার্ক) থেকে উত্তর দিকে জনসন রোডে এই চার্চ অবস্থিত। এই বিল্ডিং-এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে[৬০] এবং ঢাকা সফর করার সময় বিশপ হেবার ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই রোববার তা 'ঈশ্বরের সেবায়' উৎসর্গ করেন।[৬১] এই বিল্ডিংকে উৎসর্গ করার অন্য একটা তারিখ অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বলে উল্লেখ করা হয়; এটা স্পষ্টত ভুল।[৬২] এই চার্চের সাথে ইংল্যান্ডের চার্চের সংযোগ আছে। এ চার্চের বর্তমান (১৯৫৬) দায়িত্বে আছেন বিশপ রাইট রেভারেন্ড জে এস ব্লেয়ার (Right Reverend J.S. Blair)।

উপমহাদেশে গীর্জার যে স্টাইল দেখা যায়, এই বিল্ডিংটি সেইভাবে নির্মিত। এতে আছে আয়তাকার একটা হল; হলটিতে আছে প্রধান অংশ যেখানে লোকজন বসে এবং দু'টো ইটের কলামের সারি দ্বারা গীর্জার বিচ্ছিন্ন পার্শ্ববর্তী অংশ। এছাড়া আছে বাণী পাঠ করার প্রধান প্লাটফরম; পূর্বদিকে, কিছুটা উঁচু অবস্থায়। বাইরের দিকে আছে দু'টো বারান্দা; উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সংযুক্ত করা আছে ঝলন্ত বারান্দা। পশ্চিমদিকে আছে গাড়ি বারান্দা। গীর্জার চূঁড়া চতুষ্কোণ বিশিষ্ট – চূঁড়াটি দুই স্তরবিশিষ্ট এবং তা ছাদ থেকে উঁচু। চূঁড়ার দু'টি স্তরে জানালা আছে এবং ওপরে আছে একটা ঘড়ি। প্রধান হলের ছাদ সমান্তরাল; কাঠের বর্গার ওপর তা স্থাপিত। চারটি কর্নারে দেখা যায় ছোট ছোট চূঁড়া। কার্নিস মোল্ডিং-এর ওপরকার সম্মুখভাগে সামান্য ব্যবধানে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পিলার দিয়ে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রবেশপথ ও জানালার ধনুকাকৃতির খিলান গথিক (গথ জাতির) স্থাপত্য রীতির; কিন্তু প্রধান টাওয়ারে আছে চতুষ্কোণবিশিষ্ট এবং সরু খিলানের অবলম্বন বা পিলপাগুলোতে আছে আয়তাকার প্যানেল, প্লাস্টার করা।

৬১. ভিক্টোরিয়া পার্ক : ভিক্টোরিয়া পার্ক রানী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আন্টাঘর নামে একটা প্রাচীন বিল্ডিং-এর ধ্বংসাবশেষের ওপর ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই পার্ক অস্তিত্বে আসে। ওই প্রাচীন বিল্ডিংটা ছিল আর্মেনিয়ানদের ক্লাব ঘর; তারা তখন এই এলাকার আশেপাশেই বসবাস করতো। পরে আর্মেনিয়ানদের বাড়িঘর ইংরেজরা কিনে নেয় এবং ক্লাবটিও তারা দখল করে। কিন্তু ক্লাব ঘরের বিল্ডিং পড়ে যায় এবং তা ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের এই স্থানে ফাঁসি দেয়া হয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনা করা হয়েছে। প্রধানত ঢাকার নবাবদের পূর্বপরুষ নবাব স্যার আবদুল গনির প্রচেষ্টায় এই পার্কের উন্নয়ন সাধিত হয়। পার্কের অভ্যন্তরে একটি দীর্ঘ চতুষ্কোণ সূক্ষ্মাগ্র স্তম্ভ দেখা যায়, তাতে খোদিত আছে :

'নবাব আবদুল গনি ও নবাব আহসান উল্লার প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন হিসেবে তাদের ইউরোপীয় বন্ধুরা এই স্তম্ভটি নির্মাণ করেন খাজা হাফিজ উল্লাহর প্রীতিপূর্ণ স্মৃতি হিসেবে। ৮ জুলাই ১৮৮৪।' ওই স্মৃতিস্তম্ভের অপর পাশে খোদাই করা আছে : 'খাজা হাফিজ উল্লাহর স্মরণে – নবাব আহসান উল্লাহ খান বাহাদুরের পুত্র এবং নবাব আবদুল গনি, সিএসআই-এর পৌত্র। জন্ম ২৮ জানুয়ারি ১৮৬৮, মৃত্যু ৮ জুলাই ১৮৮৪।'

পার্কটি ডিম্বাকৃতির মতো এবং চারপাশে লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা। টেলরের সময় আশপাশের এলাকার চিত্র ছিল ভিন্ন রকম। তিনি লেখেন 'এসব রাস্তার সংযোগ স্থলে একটা ক্ষুদ্র উন্মুক্ত স্থান ছিল – ওই স্থানটি ছিল সমকোণী ধরনের এবং এর মাঝখানে ছিল গোলাকার উদ্যান। এই উন্মুক্ত স্থানের আশপাশে এবং নদী তীরবর্তী অর্ধমাইল এলাকা জুড়ে ছিল ইংরেজদের ফ্যাক্টরি, সেন্ট টমাস-এর গীর্জা, সরকারি স্কুল, নেটিভ হসপিটাল এবং অধিকাংশ ইউরোপীয়দের বাসস্থান।'[৬৩]

(ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পার্কটির নামকরণ করা হয় সম্রাট বাহাদুর শাহ পার্ক এবং এখানে একটি সুউচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের নির্যাতিত সিপাহীদের স্মরণে)।

নদীর তীরে করোনেশন পার্ক নামে অপর একটি পার্ক আছে; সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যভিষেক অনুষ্ঠানের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই পার্ক তৈরি করা হয়।

৬২. সদরঘাটে রক্ষিত কামান বিরাট এই কামানটি মোগল যুগের এক মূল্যবান পুরানিদর্শন। এর নাম দেয়া হয় 'বিবি মরিয়ম'। জনাব এস এম তাইফুর অনুমান করেন যে, আসাম অভিযানকালে মীর জুমলা যে সব কামান দখল করেন, এটা তারমধ্যে একটি। প্রথমে এই কামানটি রাখা হয় বড় কাটরার সামনে, যে স্থানকে এখন সোয়ারীঘাট বলা হয়। মি. ওয়াল্টার্স ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কামানটি চক-এ (চক বাজার) স্থানান্তরিত করেন এবং একটা বড় প্লাটফরমের ওপর তা স্থাপন করা হয়। প্রায় ত্রিশ বছর আগে (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে একথা বলা হয়) কামানটি সদরঘাটের বর্তমান স্থানে নিয়ে আসা হয়। হিন্দু মহিলারা এই কামানকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে এবং এর নিম্ন অংশে সিঁদুর ও তৈলাদি লাগায়। 'কালাখান জমজম' নামে অপর কামানটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে বলে জানা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকার আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থান

৬৩. বিক্রমপুর : ঢাকার কাছে বিক্রমপুর হলো ঐতিহাসিক দলিলে লিপিবদ্ধ প্রাচীন রাজধানী শহর। বাংলায় পাল রাজাদের শাসনামলে এই স্থানটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ঐতিহাসিকের মতে বিক্রমপুর শব্দটি এসেছে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি থেকে – এই উপাধি গ্রহণ করেন পাল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ও মহান শাসক ধর্মপাল দেব। তিনি এখানে একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করেন। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের অপর শাসকবর্গ অর্থাৎ চন্দ্র শাসকবর্গের রাজধানীও ছিল এই স্থানে। সর্বশেষ হিন্দু রাজা অর্থাৎ সেন রাজাদের প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টার ছিল ওই একই স্থানে। তাঁদের কাছ থেকে উত্তর-পশ্চিম বাংলা মুসলমানরা দখল করে নেওয়ার পর তাঁরা এখানে তাদের স্থায়ী বসবাসের স্থান করে নেন। প্রায় এক শতাব্দী ধরে এই শহরটি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেকার সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করে।

বর্তমানে এই শহরের ধ্বংসাবশেষ ধলেশ্বরী নদীর পলি মাটিতে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ঢাকা থেকে প্রায় পনের মাইল দূরে অবস্থিত এই স্থানটি। নারায়ণগঞ্জ থেকেও স্টীমারে করে কদমতলী ঘাট পর্যন্ত যাওয়া যায়। এই ঘাট থেকে প্রায় এক মাইল পথ পায়ে হেঁটে যাওয়ার পর প্রথম প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভটি দেখতে পাওয়া যায়। এটা বাবা আদম শহীদের মসজিদ, স্থানটির নাম রামপাল। এখান থেকে আরো প্রায় দেড় মাইল পথ অতিক্রম করার পর দেখা যায় বল্লাল বাড়ির ধ্বংসাবশেষ – এখন সবকিছু মাটির সাথে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বল্লাল বাড়ি থেকে আধমাইল পশ্চিমদিকে একটা ক্ষুদ্র জলাধার আছে, একে বলা হয় পুষ্করিণী। এখানেই আছে অগ্নিকুন্ড। বল্লাল বাড়ি থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে আছে রামপাল দিঘি। এই দিঘির উত্তর পাড়ে একটা প্রাচীন শুষ্ক গাছ আছে – ওই গাছ সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনীর কথা জানা যায়। এরপরে আছে হরিশচন্দ্রের পুকুর; কয়েক বছর পূর্বে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই পুকুরটি পুনঃখনন করে। আশপাশের অনেক প্রাচীন গ্রামে অনেক প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়; ওইসব নিদর্শন এখন অনেক আধুনিক মন্দিরে রাখা হয়েছে।

কানিংহাম লেখেন : 'বল্লাল বাড়ি ছিল মাটির এক বিরাট দুর্গ, প্রায় সাতশ' পঞ্চাশ ফুট আয়তাকার বিশিষ্ট। এখন তা ধ্বংসপ্রাপ্ত। ওই দুর্গের চারপাশে প্রায় দুশ' ফুট লম্বা গভীর খাদ ছিল। এর প্রবেশপথ ছিল পূর্বদিক থেকে; একটা উঁচু রাস্তা দিয়ে প্রায় তিনশ' ফুট চওড়া একটা আয়তাকার এলাকায় যাওয়া যায়, এটা দুর্গের বাইরের এলাকা। এটা সম্ভবত ভৃত্যদের থাকার জায়গা ছিল। অভ্যন্তরভাগের সব প্রদক্ষিণ পথ, খাদ ও দুর্গের বহির্ভাগের নির্মিত অংশ এক মাইল লম্বা। এখন এখানে কোনো ইট দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ড. টেলর বলেন যে, ওই দুর্গের অভ্যন্তরে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশপাশে কয়েক মাইলব্যাপী, 'মন মন ওজনের ইট দেয়ালের ভিত' দেখতে পাওয়া যায়।'[৬৪]

বাবা আদম শহীদের মসজিদ : মসজিদটি স্থানীয়ভাবে সুপরিচিত সুফী বাবা আদমের নামে। বাবা আদমের কবর মসজিদের কাছেই, একেবারে সাধারণভাবে। ড. ওয়াইজ এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেন

'বাবা আদম ছিলেন একজন শক্তিশালী দরবেশ; বল্লাল সেনের রাজত্বকালে তিনি একদল সৈন্যসহ এই এলাকায় আসেন। এখান থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্বে আবদুল্লাহপুর গ্রামের কাছে তিনি শিবির স্থাপন করেন। তিনি গরুর গোশত টুকরা টুকরা করে তা হিন্দু রাজার দুর্গের মধ্যে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করেন। বল্লাল সেন এই ঘটনায় বিরক্ত হন এবং কে গরু জবাই করেছে অনুসন্ধান করার জন্য সারা দেশে তাঁর লোক পাঠান। একজন লোক অনতিবিলম্বে ফিরে এসে জানায় যে, একদল বিদেশী সৈন্য রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি এলাকায় শিবির স্থাপন করেছে এবং তাদের নেতাকে সে নামাজ পড়া অবস্থায় দেখতে পেয়েছে। এলাকাটি প্রায় তিন মাইল দূরে। একথা শোনার পর বল্লাল সেন ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত ওই স্থানে যান এবং দেখেন যে বাবা আদম তখনও নামাজ পড়ছেন। তিনি এক আঘাতে তাঁর (বাবা আদমের) মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।'[৬৫]

কাহিনীটি আকর্ষণীয় ও মুগ্ধকর, তবে তা রূপকথার চেয়ে কিছুটা উন্নত। এ কাহিনীতে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। সৌভাগ্যবশত মসজিদে একটা শিলালিপি সংযুক্ত আছে। ওই শিলালিপিতে খোদাই করা আছে ' ওই জামে মসজিদ সম্রাটের রাজত্বকালে নির্মাণ করেন মহান মালিক, মালিক কাফুর – তিনি সম্রাট জালাল-উদ-দুনিয়া ওয়াল-দীন ফতেহ শাহ-এর পুত্র এবং তিনি সম্রাট মাহমুদ শাহ্-এর পুত্র; হিজরি ৮৮৮ সালের রজব মাসের মাঝামাঝি সময়ে (১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে) তিনি এই মসজিদ নির্মাণ করেন।'[৬৬] ফতেহ শাহ ছিলেন বাংলায় সর্বশেষ ইলিয়াস শাহী শাসনকর্তা। মসজিদটির পরিকল্পনা এমন যে তা আয়তাকার ধরনের; এটা ৪৩ ফুট লম্বা এবং ৩৬ ফুট চওড়া। এর চারকোণায় আছে অষ্টকোণী টাওয়ার। মসজিদের সম্মুখভাগ সংস্কার করা হয়েছে, ফলে এর প্রাচীন নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তবে মোল্ডিং-এর বন্ধনী এখনও দেখতে পাওয়া যায়। প্রবেশপথের মধ্যখানে ধনুকাকৃতির খিলানযুক্ত কুলঙ্গি দেখা যায়; এর সাথে আছে ঝুলন্ত শিকল। উপরকার ছিদ্রযুক্ত দেয়াল ও কার্নিস খোদাই করা; সাম্প্রতিক কালে পুনঃনির্মাণ করা হয়। অভ্যন্তরভাগের হল ঘরটি দুটো স্তম্ভ এবং পাথরের পিলার দ্বারা বিভক্ত। পশ্চিম দিকে আছে তিনটি জাঁকজমকপূর্ণ মেহরাব। মোগল-পূর্ব যুগের স্থাপত্যের নির্দশন এই মসজিদে পাওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৪. সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রায় তিন মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত সোনারগাঁও। সোনারগাঁও বা সঠিকভাবে সুবর্ণগ্রাম, যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'সোনার গ্রাম বা শহর'। এর উৎপত্তি হয় স্পষ্টত হিন্দু আমলে, তবে এর প্রাচীন ইতিহাস নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে তা অভ্যন্তরীণ বন্দরনগরী হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পায় এবং ওই সময় তা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক রাজধানী হিসেবে উন্নীত হয়। এই শহরের স্পষ্ট উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় জিয়াউদ্দিন বারনীর 'তারীখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে। তিনি সোনারগাঁও-এর রায় দনুজ-এর সাথে দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বলবান-এর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন; গিয়াসউদ্দিন বলবান ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বাংলা সফর করেন। ইবন বতুতা ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে সোনারগাঁও আসেন এবং এখান থেকে একটা নৌযানে চড়ে সরাসরি জাভা যান। এই স্থানে বাংলার সুলতানদের দরবারে চীনের রাষ্ট্রদূতগণ আসেন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন যে, সোনারগাঁও 'একটি দেয়াল ঘেরা স্থান – এখানে আছে পুকুর, রাস্তা, বাজার এবং এখানে সব ধরনের মালপত্র কেনাবেচা হয়'। তাঁরা আরো লেখেন 'এখানে সব ধরনের জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হয় এবং তা বিতরণ করা হয়।' রালফ ফিচ (Ralph Fitch) ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে সোনারগাঁও আসেন। তিনি লেখেন 'শ্রীপুর থেকে ছ'লীগ (এক লীগ প্রায় দেড় ক্রোশের সমান) দূরে অবস্থিত সোনারগাঁও একটি শহর – এখানে সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর সুতির কাপড় তৈরি করা হয় যা সারা ভারতে পরিচিত। এসব দেশের সম্রাট হলেন ঈশা খান।' জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা) মোগলদের রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর সোনারগাঁও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সুতি কাপড় তৈরির এলাকা হিসেবে-এর গুরুত্ব অব্যাহত থাকে। পরবর্তীকালে বিদেশী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় এই ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেলে গোটা শহরটা একটা অপরিচিত গ্রামে পরিণত হয়।

বর্তমানে মোগরাপাড়া নামে পরিচিত এই গ্রামের আশপাশে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। নারায়ণগঞ্জ থেকে মোগরাপাড়া যাওয়ার উঁচু রাস্তা থেকে প্রায় আধমাইল উত্তরে আছে পাঁচ পীরের দরগাহ। প্রায় চার ফুট উঁচু প্লাটফরমের ওপর পাশাপাশি ইটের তৈরি পাঁচটি সমাধি আছে। এসব কবরে শায়িত ব্যক্তিদের পরিচিতি সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তাঁদেরকে সাধারণভাবে পাঁচ পীর নামে অভিহিত করা হয়; এরমধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হলেন বোরো অর্থাৎ বদর আলম।

পাঁচ পীর সমাধি থেকে প্রায় এক হাজার ফুট পূর্বে আছে বৃহৎ প্রস্তরনির্মিত একটা সুন্দর সমাধি। সমাধিটি বাংলার সিকান্দার শাহ-এর পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ-এর । এই সম্রাট মৃত্যুবরণ করেন ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে। এই সমাধিটি অবস্থিত একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুকিয়ে যাওয়া পুকুরের উঁচু পাড়ে। সমাধির ওপর আছে ভারী পাথরের ফলক – প্রথমে সমাধির চতুষ্পার্শে ছিল পিলারের পরিবেষ্টনা। পূর্বপাশে এখনও তিনটি খোদাই করা প্যানেল আছে – প্রত্যেক প্যানেলে আছে একটি করে কুলঙ্গি, যার ওপর থেকে ঝুলানো আছে একটা প্রদীপ। ছোট ছোট দানার ক্ষুদ্রলিপির লাইনের পাশে কার্নিস সজ্জিত আছে।

এই স্থান থেকে প্রায় আধমাইল দক্ষিণ পূর্বদিকে,মোগরাপাড়া গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা স্থানকে 'দমদম' বলা হয়; সম্ভবত এই এলাকায় ছিল শহরের মূল দুর্গের একটি অংশ। গ্রামের মাঝখানে একটা খোলা কবর দেখা যায় – কবরটি মান্না শাহ দরবেশের। এখান থেকে সামান্য উত্তরে আছে শেখ মোহাম্মদ ইউসুফের খানকাহ এবং হজরত ইউসুফ ও তাঁর পুত্র শেখ মাহমুদের সমাধির ধ্বংসাবশেষ। সমাধিগুলো আয়তাকার ধরনের, এর দেয়াল প্লাস্টার করা এবং বাঙালি গম্বুজের মতো পিরামিড আকারের ছাদ। তাই নির্মাণ কৌশল পুরোপুরি স্থানীয় ধরনের।

এর কাছেই আছে এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ – এটা নির্মাণ করেন জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ, ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু মসজিদটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পুনঃনির্মাণ করা হয়। পাথরের মূল পিলার ও মেহরাব মসজিদের অভ্যন্তরে দেখতে পাওয়া যায়। মসজিদের নামফলক এখন মসজিদের সামনের দেয়ালের সাথে সংযুক্ত করা আছে। ওই পাথর ফলকটি চুন দিয়ে লেপন করা আছে। মসজিদের প্রাঙ্গণে কয়েকটি কবর আছে; বাংলার স্বাধীন সুলতানদের কবর বলে স্থানীয় লোকেরা বলে। কিন্তু এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মসজিদের উত্তরদিকে একটা খোলা জায়গা আছে; লোকেরা এ স্থানকে এক সময়কার 'খাজাঞ্চিখানা' বলে আখ্যায়িত করে। খোলা জায়গার পশ্চিমদিকে মোগল যুগের আবাসিক বিল্ডিং-এর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

দরগাহ থেকে সামান্য দূরে একটা খোলা চ্যাপ্টা খণ্ড দেখা যায় – এটা নসরত শাহ-এর সময়কার; এতে খোদাই করা আছে – ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ। আশপাশের এলাকায় অনেক কবর আছে, যেমন পোনকাই দিওয়ান, পাগলা সাহেব; কিন্তু তাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে কিছু জানা যায় না। তবে পাইনাম ব্রিজ একটা উল্লেখযোগ্য স্মৃতিস্তম্ভ। এটা শহর থেকে বেশ দূরে, 'কোম্পানি কা কোঠি'তে যাওয়ার পথে অবস্থিত। গোয়ালদিতে দু'টো মসজিদ আছে – একটা হোসেন শাহ-এর মসজিদ, তারিখ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ এবং অপরটি আওরঙ্গজেবের সময়কার মসজিদ, তারিখ ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ। এলাকাটি এখন ঝোঁপ-জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে আছে। মসজিদের অলঙ্কারপূর্ণ পিলার ও মেহরাব মাটির ঢিবির মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৫. নবীগঞ্জে কদম রসূল : নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে নবীগঞ্জ একটা ছোট বাজার শহর। নবীগঞ্জ এর সাম্প্রতিক নাম। মীর্জা নাথান[৬৭] বলেন, এর প্রাচীন নাম ছিল রসূলপুর; এই স্থানকে কদম রসূল হিসেবেও আখ্যায়িত করা হতো। মীর্জা নাথান আরো উল্লেখ করেন যে, কদম রসূল (অর্থাৎ নবীর পদচিহ্ন, যা এখানে সংগৃহীত আছে) থেকে এই নামের উৎপত্তি হয়েছে। তিনি বলেন যে, এই পদচিহ্ন 'সংগ্রহ করেন মাসূদ খান কাবুলী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যাঁরা তা বিপুল অর্থের বিনিময়ে আরব থেকে নিয়ে আসেন'। সৈয়দ আউলাদ হাসান বলেন যে, এই পদচিহ্ন আবিষ্কার করেন দেওয়ান মুনাওয়ার খান এবং তিনিই এখানে ওই বিল্ডিং নির্মাণ করেন।[৬৮] ঐতিহাসিক বিবরণের সাথে এ তথ্যের মিল নেই।

পবিত্র এই স্থানটির চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা; এর প্রবেশপথে আছে একটা দ্বিতল ভবন। প্রবেশপথটি নির্মাণ করেন গোলাম নবীর পুত্র গোলাম মোহাম্মদ, ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। নদীর দিক থেকে এই দ্বিতল ভবনের দৃশ্য খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয়। গোলাম নবী ওই পবিত্র স্থানটিও নির্মাণ করেন ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে। এসব বিল্ডিং নির্মাণের সময়কার শিলালিপি ঢাকা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। প্রধান পবিত্র স্থানটি ছাড়াও এর দক্ষিণে লঙ্গরখানার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এ স্থানে উত্তরদিকে দেখতে পাওয়া যায় নবাব নসরত জঙ্গ ও নবাব গাজীউদ্দিন হায়দার কর্তৃক নির্মিত একাধিক গৃহের ধ্বংসাবশেষ। পূর্বদিকে দেখতে পাওয়া যায় হুজরাখানার ধ্বংসাবশেষ – এই হুজরাখানায় ধার্মিক ব্যক্তিরা ইবাদত ও ধর্মীয় একাগ্রতায় সময় অতিবাহিত করতেন।

৬৬. মুন্সিগঞ্জে ইদ্রাকপুর দুর্গ মুন্সিগঞ্জ শহরে মোগলদের একটা দুর্গ আছে, যা ইদ্রাকপুর দুর্গ নামে পরিচিত। সম্ভবত মীর জুমলা এই দুর্গটি নির্মাণ করেন মগ ও পর্তুগীজদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। মগ ও পর্তুগীজ দস্যুরা সে সময় চট্টগ্রাম থেকে মেঘনা নদীর উজানে এবং ঢাকার বিভিন্ন জেলায় লুণ্ঠন করতো (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন)। পূর্বে এই দুর্গটির অবস্থান ছিল ইছামতী নদীর তীরে। কিন্তু ওই স্থানে এখন চর পড়েছে এবং দুর্গের দক্ষিণদিকের দেয়ালের ছাদের কিনারা পর্যন্ত চরে বিলীন হয়ে গিয়েছে। দুর্গটি অবরোধ করার জন্য তৈরি করা হয়নি, ফলে এর প্রতিরক্ষা দেয়াল খুবই দুর্বল; এর বিভিন্ন কর্নারে আছে গোলাকার বুরুজ। দুর্গে সৈন্যদের আশ্রয় নেয়ার স্থান আছে; বর্ষাকালে তারা এখানে আশ্রয় নিতো, কারণ বর্ষাকালেই দস্যুরা আক্রমণ চালাতো। এই দুর্গের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এর দক্ষিণদিকে বিরাট এক গোলাকার ড্রাম ছিল এবং ওই ড্রামের নিরাপত্তার জন্য তা দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। এই বড় ড্রাম নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত এর ওপর বড় কামান রাখা। ফলে নদীর মাঝপথেই দস্যুদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানে ওই ড্রামের ওপর সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কোয়ার্টার নির্মিত হয়েছে; দুর্গটি এখন ব্যবহার করা হয় জেলখানা হিসেবে। এ অঞ্চলে মোগলরা নদীতীরে যে দুর্গ নির্মাণ করতো তার সাথে এই বড় ড্রামের মিল আছে এবং এর বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

৬৭. বন্দর-এ সোনাকান্দা দুর্গ : নারায়ণগঞ্জের অপর পাশে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে বন্দর নামক স্থানে নদীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য অপর একটা দুর্গ দেখতে পাওয়া যায়; এ দুর্গটির নাম সোনাকান্দা দুর্গ। এ দুর্গের ইতিহাস সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন নদী কিছুটা পশ্চিমদিক সরে গিয়ে প্রবাহিত হয় এবং দুর্গটি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি বিল্ডিং-এর আড়ালে পড়ে গিয়েছে। প্রতিরক্ষা দেয়াল এবং বড় ড্রামটি এখনও দেখতে পাওয়া যায়। প্রচলিত কাহিনী হলো এই যে, সোনাকান্দা নামটি এসেছে সোনা নাম থেকে। বারোভূঁঞা প্রধান কেদার রায়ের বিধবা কন্যার নাম সোনা; ঈশা খাঁ যখন তাকে অপহরণ করে নিয়ে যান তখন তিনি এই স্থানে ক্রন্দন করেন।

৬৮. বন্দর-এ হাজী বাবা সালিহ-এর সমাধি ও মসজিদ : বন্দর শহরে পাথর দিয়ে নির্মিত একটা সমাধি আছে। ওই সমাধিটি হাজী বাবা সালিহ নামের একজন ধার্মিক ব্যক্তির; তিনি ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ)-এর সময়কার লোক। এই সমাধির আবরণী হিসেবে যে বিল্ডিংটি নির্মাণ করা হয়েছিল তা অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে সমাধির চতুর্দিকে একটা নতুন দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। সমাধির পাশে একটা মসজিদ আছে যা হাজী বাবা নিজেই নির্মাণ করেন। মসজিদটির আমূল সংস্কার করা হয়েছে। হাজী বাবা ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে আরো একটা মসজিদ নির্মাণ করেন যা বন্দর শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে ওই স্থানটির নাম খন্দকার টোলা। মসজিদটি নতুন আঙ্গিকে পুনঃনির্মাণ করা হয়।

৬৯. নারায়ণগঞ্জ : নারায়ণের (অর্থাৎ বিষ্ণু) মূর্তি থেকে নারায়ণগঞ্জ নামের উৎপত্তি; ওই মূর্তিটি স্থাপন করেন ভিখন লাল পান্ডে। পলাশী যুদ্ধের সময় তিনি ইংরেজদের সেবা করেন বিশ্বস্ততার সাথে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে তিনি এই সম্পত্তি পান লাখেরাজ সম্পত্তি হিসেবে 'ঠাকুরের (অর্থাৎ দেবতা) খরচ মিটানোর জন্য, গরীবদের খাওয়ানোর জন্য এবং নিজের খরচ মিটানোর জন্য'। এ এলাকার পূর্বাংশের প্রাচীন নাম খিজিরপুর, যা এখনও হাজীগঞ্জ নামে পরিচিত। এই স্থানে ফায়ার ব্রিগেডের পেছনদিকে প্রাচীন একটি মোগল দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এটা মীর জুমলা তৈরি করেন বলে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। এই দুর্গটি তৈরি করা হয়েছিল বুড়িগঙ্গার নদীপথ পাহারা দেয়ার জন্য। বুড়িগঙ্গা এই স্থানে শীতলক্ষ্যা নদীতে এসে মিশে যায়। এই দুর্গ থেকে সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বেশ কয়েকটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোগল স্মৃতিচিহ্ন এখন প্রাচীরবেষ্টিত অবস্থায় আছে। এরমধ্যে একটি হলো তিনগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, যা শায়েস্তাখানি স্থাপত্যের স্টাইলে তৈরি। অপর একটি স্মৃতিচিহ্ন হলো এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি আয়তাকার সমাধি, যা শায়েস্তা খানের তথাকথিত কন্যা বিবি মরিয়মের সমাধি বলে গণ্য করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ থেকে নারায়ণগঞ্জের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

৭০. মুয়াজ্জমপুর : ঢাকা থেকে প্রায় দশ মাইল উত্তরে মুয়াজ্জমপুর নামে ছোট একটি গ্রাম আছে। মধ্যযুগে এর নাম ছিল মুয়াজ্জমাবাদ এবং একসময় তা জেলার হেডকোয়ার্টার ছিল। ধারণা করা হয় যে, সিকান্দার শাহ এখানে একটি টাকশাল স্থাপন করেন এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহ-এর সময়ে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর গভর্নর খাওয়াজ খান এখানে তাঁর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন; মেঘনা নদীর উভয় পার্শ্বের জেলাগুলোর শাসনকার্য তিনি এখান থেকেই পরিচালনা করেন। মুয়াজ্জমাবাদ নামটির উৎপত্তি হয় সম্ভবত সিকান্দার শাহ-এর পুত্র (গিয়াসউদ্দিন) আজম শাহ-এর সময় থেকে।

এই গ্রামে শাহ লঙ্গর-এর সমাধি আছে; শাহ লঙ্গর সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না। প্রচলিত কাহিনী হলো এই যে, তিনি ছিলেন বাগদাদের এক যুবরাজ। তিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং শেষে এই স্থানে এসে মৃত্যুবরণ করেন। এই সমাধির উত্তর পার্শে ছ'গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ আছে; এর আয়তন ৪২ ফুট দীর্ঘ ও ৩০ ফুট প্রশস্ত। এতে একটা শিলালিপি ছিলো যা পরে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। টুকরা টুকরা এই নামফলক সৈয়দ আওলাদ হাসান পড়েন এবং এই মসজিদের নির্মাণকারী ফিরোজ খান বলে বর্ণনা করেন। এই মসজিদটি তিনি সম্ভবত জালালউদ্দিন মোহাম্মদ-এর পুত্র শামসউদ্দিন আহমদ শাহ-এর সময় নির্মাণ করেন।

৭১. মিরপুর-এ হজরত শাহ আলী সাহেবের দরগাহ : ঢাকা শহর থেকে প্রায় আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে মিরপুর নামে একটি গ্রামে শাহ আলী বাগদাদীর সমাধি আছে। পবিত্র এই স্থানে প্রতিদিন বহু লোক জিয়ারতের জন্য আসে। মূল সমাধিটি এক গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার বিল্ডিং – বাইরের দিক থেকে প্রতিটি অংশ ছত্রিশ ফুট করে লম্বা। মাজারের সাথে একটা মসজিদ আছে যা নির্মিত হয় ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে; মগবাজারের শাহ মোহাম্মদ সাহেব ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে তা নতুন করে নির্মাণ করেন। প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরে যে সব দালান আছে তা নির্মাণ করেন নবাব স্যার আহসানউল্লাহ বাহাদুর।

পরবর্তীকালে, ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে, মসজিদে স্থাপিত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হজরত শাহ আলী বাগদাদ থেকে আসেন চল্লিশ জন দরবেশকে সাথে নিয়ে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার করা। তিনি মিরপুরে অবস্থানে করেন এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে ইবাদতে নিমগ্ন হন। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং এখানেই তাঁকে কবর দেয়া হয়। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে রহস্যময় কাহিনী প্রচলিত আছে।

৭২. সাভার ঢাকা থেকে পনের মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধলেশ্বরী ও ভামসি নদীর সঙ্গমস্থলে সাভারে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। আসলে সাভার-এর সঠিক নাম সম্ভার; সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে সম্ভোগ দেশের রাজধানী ছিল এই সম্ভার, বর্তমানে সাভার। ঢাকা থেকে সাভার যাওয়ার পথে রাস্তার পশ্চিম পার্শে একাধিক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রাচীন ঢিবি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। এলাকাটি যে কত প্রাচীন তা গুপ্ত যুগের সোনার মুদ্রার অনুকরণে এখানে হালকা সোনার মুদ্রা আবিষ্কার থেকে অনুমান করা যায়। সপ্তম শতাব্দীতে এসব মুদ্রা এখানে প্রচলিত ছিল। সাভার থেকে কোনো পাথর বা ধাতুর মূর্তি এখনও আবিস্কৃত হয়নি। তবে বুদ্ধ ও অন্যান্য দেবতার মূর্তির ছাপসহ যে সব টেরোকোটা পাওয়া গিয়েছে তা বিস্ময়করভাবে অত্যন্ত বিরাট আকারের। এসব টেরোকোটা পাওয়া গিয়েছে রাজা হরিশচন্দ্র নামের সাথে জড়িত এলাকা থেকে। বাংলার ধর্মমঙ্গলা কবিতায় রাজা হরিশচন্দ্রের নাম অত্যন্ত সুবিদিত। হরিশচন্দ্র যে সময় খ্যাতিলাভ করেন তা নবম শতাব্দীর সূচনাকাল বলে মনে করা হয়।[৬৯]

AMARBOI.COM

সূত্র :

১. আর. ডি ব্যানার্জির মন্তব্য, এশিয়াটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, ১৯২৪-২৫, পৃ. ৯২।

২. আউলাদ হাসান, টীকা, ২৯-৩২।

৩. হাবীবুর রহমান, আসূদগান-ই ঢাকা, পৃ. ২১-২৩।

৪. ঐ, পৃ. ৪৮-৪৯।

৫. গ্লিম্পসেস অব ওল্ড ঢাকা, পৃ. ৪০ এবং পরিশিষ্ট।

৬. বাহারিস্তান-ই গায়ব, খন্ড ১, পৃ. ২৫৭।

৭. মসির-উল-উমারা, পৃ. ৬৯৩।

৮. তাওয়ারিখ-ই নসরতজঙ্গ, পৃ. ১৫২।

৯. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ. ৪।

১০. ঢাকা রিভিউ, খন্ড ৮, ১৯১৮, পৃ. ১১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১. কানিংহাম, এএসআর, খন্ড ১৫, পৃ. ১২৮।

১২. কানিংহাম, এএসআর, খন্ড ১৫, পৃ. ১৩০। হাবীবুর রহমান, আসূদগান-ই ঢাকা, পৃ. ৯৫। এসএম তাইফুর (গ্লিম্পসেস অব ওল্ড ঢাকা, পৃ. ৯৬, পাদটীকা-১) এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, বিবি পরী শায়েস্তা খানের মেয়ে কিনা। তিনি মনে করেন যে, এই সমাধি হয়তো মোহাম্মদ আজমের অন্য কোনো স্ত্রীর।

১৩. হাবীবুর রহমান, আসূদগান-ই ঢাকা, পৃ. ৯৫।

১৪. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ. ১১।

১৫. ঐ, পৃ. ২৫।

১৬. ডি'ওলি. এ্যান্টিকুইটিজ, পৃ. ১৩।

১৭. টেলর'স্ টপোগ্রাফি, পৃ. ৮৭।

১৮. হাবীবুর রহমান, আসূদগান-ই ঢাকা, পৃ. ৬১; এখানে তিনি ভুল করে উল্লেখ করেন যে, চক নির্মাণ করেন দ্বিতীয় মুর্শীদ কুলী।

১৯. রহমান আলী, তাওয়ারিখ, পৃ. ২৬৬।

২০. বার্ষিক রিপোর্ট, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ১৯২৪-২৫, পৃ. ৯৩।

২১. হাবীবুর রহমান, আসূদগান-ই ঢাকা, পৃ. ১৪২-১৪৫।

২২. ডি'ওলি, এ্যান্টিকুইটিজ, পৃ. ১৩।

২৩. টেলর'স্ টপোগ্রাফি, পৃ.৯০-৯১।

২৪. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ. ১৫।

২৫. হাবীবুর রহমান, আসূদগান-ই ঢাকা, পৃ. ৬৩; রহমান আলী, তাওয়ারিখ, পৃ. ২৬৯।

২৬. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ. ১৬।

২৭. হাবীবুর রহমান, আসূদগান-ই ঢাকা, পৃ. ৫৬-৫৭।

২৯. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ. ২২।

৩০. রহমান আলী, তাওয়ারিখ, পৃ. ২৫৩।

৩১. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ. ৩৪।

৩২. রহমান আলী, তাওয়ারিখ, পৃ. ২৫৪।

৩৩. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ. ৬২।

৩৪. রহমান আলী, তাওয়ারিখ, পৃ-১৯৩-১৯৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৫. ঢাকা রিভিউ, খণ্ড-৫, ১৯১৫, পৃ. ২২৮-২২৯।

৩৬. রহমান আলী, তাওয়ারিখ, পৃ. ১৯০-১৯৩; যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, খণ্ড-১, পৃ. ৩৭৯-৩৮০।

৩৭. যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, খণ্ড-১, পৃ. ৮০-৮১।

৩৮. টেভির্নিয়ার'স ট্রাভেলস, পৃ. ১০২।

৩৯. হেবার-এর ন্যারেটিভ, খণ্ড-১, পৃ. ১৫৩।

৪০. ডি'ওলি, এ্যান্টিকুইটিজ, ৬ এবং ৭ নম্বর প্লেটের মধ্যে।

৪১. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ. ২৯।

৪২. হাবীবুর রহমান, আসূদগান-ই ঢাকা, পৃ. ৫০-৫১।

৪৩. অন্য বিবরণের জন্য যতীন্দ্র মোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাস, খণ্ড-১, পৃ. ৩৬৯-৩৭২ দেখুন।

৪৪. ঢাকা রিভিউ, খণ্ড-৫, ১৯১৫, পৃ. ২২৮। (বিক্রমাদিত্য সন ১৮৯০)।

৪৫. পূর্বে উল্লেখিত বিবি পরীর সমাধি দেখুন।

৪৬. যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, খণ্ড-১, পৃ. ৩৬৮।

৪৭. ঐ, পৃ. ৩৬৮।

৪৮. রোমান্স অব এ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটাল, পৃ. ২৬৫।

৪৯. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ.২০-২১; রহমান আলী, তাওয়ারিখ, পৃ. ২৭৩।

৫০. ঢাকা রিভিউ, খণ্ড-৫, ১৯১৫, পৃ. ২২৬-২২৭।

৫১. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ. ৩২-৩৩।

৫২. ঐ, পৃ. ৪০।

৫৩. ঐ, পৃ. ৪১।

৫৪. ঐ, পৃ. ৪২।

৫৫. ঐ. পৃ. ৪২।

৫৬. টেলর'স টপোগ্রাফি, পৃ. ২৫১।

৫৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন জার্নাল অব দি মিউজিয়ামস এসোসিয়েশন অব পাকিস্তান, খণ্ড-৪, নং-১, এপ্রিল, ১৯৫২, পৃ. ৫৩-৬২।

৫৮. হ্যারল্ড ব্রিজেস (Harold Bridges), দি ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী ইন ঢাকা, পাণ্ডুলিপি। মিশনের ড. ডেভিস দয়া করে ওই পাণ্ডুলিপি আমাকে পড়ার জন্য দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৯. বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, খণ্ড-৪২, ১৯৩১, পৃ. ৩৯-৪১।

৬০. ক্যালকাটা ডাইওসেসান (Calcutta Diocesan) ম্যাগাজিন, সেপ্টেম্বর, ১৯৫২।

৬১. হেবার'স ন্যারেটিভ, খণ্ড-১, পৃ. ১৫০।

৬২. ক্যালকাটা ডাইওসেসান (Calcutta Diocesan) ম্যাগাজিন, সেপ্টেম্বর ১৯৫২।

৬৩. টেলর'স টপোগ্রাফি, পৃ. ৮৭।

৬৪. কানিংহাম, এএসআর, খণ্ড-১৫, পৃ. ১৩২-১৩৩।

৬৫. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, খণ্ড-৪২, ১৮৭৩, পৃ. ২৮৫।

৬৬. ঐ, পৃ. ২৮৪।

৬৮. বাহারিস্তান-ই-গায়েব, খণ্ড-২, পৃ. ৭১০।

৬৮. আউলাদ হাসান, টীকা, পৃ. ৫৯-৬১।

৬৯. এন কে ভট্টশালী, ইকনোগ্রাফি (Icnography) পৃ. ৩-৪।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থ তালিকা
(BIBLIOGRAPHY)

Periodicals (with abbreviations used in the text) :

1. Annual Report of the Archaeological Survey of India. (An. Rep. A.S.I).
2. Bengal Past and Present, Calcutta.
3. Bharatvarsha, Calcutta. (A Bengali Journal).
4. Bharatiya Vidya. (A journal issued by Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay).
5. Calcutta Diocesan Magazine, September, 1952.
6. Dacca Review, Dacca. (now defunct).
7. Indian Historical Quarterly, Calcutta. (I.H.Q.)
8. Islamic Culture, Hyderabad (Deccan).
9. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta. (J.A.S.B.)
10. Journal of the Museums Association to Pakistan, Peshawar. (J.M.A.P.)
11. Vishwabharati Annals, Santiniketan.

Books (With their editions) utilised in the text.

1. Abdul Latif: Travels. Eng Tr, by J.N. Sarkar in different journals.
2. Abul Fazl Ain-i-Akbari, Vol II, Eng Tr. by Jarrett. Calcutta.
3. Abul Fazl Akbarnama. Eng. Tr. by H. Beveridge. Calcutta 1902.
4. Aga Khan India in Transition, London, 1918.
5. Barni, Ziauddin : Tarikh i Firozshahi, Calcutta, 1862
6. Bernier : Travels in Hindustan, Indian edition, Calcutta, 1904.
7. Bishop Heber, R : Narrative of a Journey Through The Upper Provinces of India, London, 1828.
8. Bhattasali, N.K. Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, Dacca, 1929.
9. Bowrey, Thomas : The Countries round the Bay of Bengal, Cambridge, 1905.
10. Bradley-Birt : Romance of an Eastern Capital, London.
11. Bridges, Harold : The Baptist Missionary in Dacca, (Mss. in the possession of the Dacca Mission), 1924.
12. Calcutta University Commission Report, 1917-1919.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

13. Cambridge History of India. Vol. V.

14. Campos, J.J.A : History of the Portuguese in Bengal. Calcutta & London, 1919.

15. Cunningham Archaeologial Survey Report, Vol XV. (A.S.R.)

16. D'Oyly, Charles : Antiquities of Dacca, London, 1824-30.

17. Fleet, J.F : Corpus Inscriptionum Indicarum,Vol. III, Calcutta, 1888.

18. Ghosh, J.M. : Sanyasi and Fakir Raiders in Bengal, Calcutta, 1930.

19. Ghulam Husain Salim Riyaz us Salatin, Eng. Tr. by Abdus Salam, Calcutta, 1902.

20. Gibb, H.A.R : Ibn Battutah, (Broadway), 1929.

21. Gladwin, F : A Narrative of the Transactions in Bengal, Calcutta, 1782.

22. Gupta, Nirmal Kumar : Dacca (Old & New), Dacca, 1940.

23. Gupta Yogendra Nath : Vikrampurer Itihasa (Bengali), Calcutta, B-S-1316

24. Hakim Habibur Rahman : Asudgani Dhaka (Urdu), Dacca; Dhaka; aj se pachas baras pahle (Urdu), Dacca.

26. Hill, S.C. : Three Frenchmen in Bengal, (Longman & Green Co.), 1903.

27. Les Voyages du Sieur Albert de Mandelslo, Fr. Tr. by Sr. A. De Wicquefort, (Amsterdam, 1719).

28. Majumdar , Hriday Nath : The Reminiscences of Dacca, Calcutta, 1926.

29. Manucci, N : Storia do Mogor, Eng Tr. by Irvine, London, 1907.

30. Mirza Nathan : Baharistan i Ghaibi, Eng. Tr. by Dr. M.I. Borah, Gauhati, 1936.

31. O' Malley, L.S.S Dacca District Gazetteer.

32. Rahman Ali Taish : Tawarikh i Dhaka (Urdu), 1910.

33. Rennell, J : Memoirs of Rennell in Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. II, Calcutta.

34. Atlas of Maps, London.

35. Report of the Sedition Committee, published by Government of Bengal, Calcutta, 1918.

36. Roy, Yatindra Mohan : Dhakar Itihas (Bengali), Calcutta, 1319-22 B.S.

37. Sarkar J. N History of Bengal, Vol. II, ed by, (Dacca University pubtication) 1948.

38. Studies in Mughal India, Calcutta, 1919.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

39. Sayid Aulad Hasan Notes on the Antiquities of Dacca, Dacca, 1912.

40. Sebastian Manrique : Travels, Tr. by Luard & Hosten, 1926-27.

41. Seth, Mesrovb, J History of the Armenians in India. Calcutta, 1895.

42. Shah, Nawaj Khan Matherul Umra, Bibliotheca Indica Text.

43. Shihabuddin Talish Fath i Ibriya, Eng. Tr. by J. N. Sarkar & H. Blochmann in J.A.S.B.

44. Stein Aurel Kalhana's Rajatarangini, Eng, Tr.

45. Stewart, Charles History of Bengal, Calcutta, 1910.

46. Taifoor, S.M : Glimpses of Old Dhaka, Dacca, 1952.

47. Tawarikh i Khwajgan i Dhaka (Persian Mss. in the Dacca University Library).

48. Tawarikh i Nusratjangi, ed, by H. Dey in the Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

49. Tavernier : Travels in India, Eng. Tr. Calcutta, 1905.

50. Taylor, James : Topography & Statistics of Dacca, Calcutta, 1840.

51. The Tuzuk i Jahangiri, Eng. Tr. by Rogers & Beveridge, London, 1914.

52. Wheeler, R. E. M. : Five Thousand Years of Pakistan, London, 1950.

53. Yule, Henry The Diary of William Hedges, London, 1887-89.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~